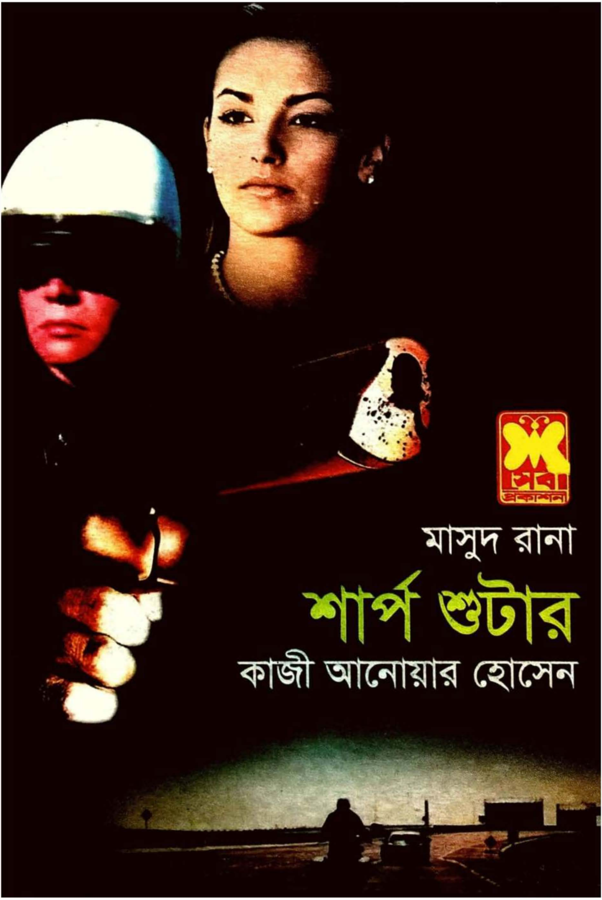


সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
শার্প শুটার
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

শার্প শুটার

কাজী আনোয়ার হোসেন

সিরিয়াল কিলিং শুরু হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসে।
টার্গেটদের কেউ ড্রাগডিলার, কেউ গ্যাংস্টার,
কেউ আবার বেশ্যার দালাল, কেউ গডফাদার।
মারা পড়ল রানা এজেন্সির এক এজেন্ট, জনিও।
লাশটা দেখতে গিয়েছিল রানা, ওকে খেদিয়ে দিল পুলিশ।
কিন্তু ঘটনাক্রমে তদন্তের দায়িত্ব পড়ল ওরই ওপর।
কিছু পুলিশ অফিসার ভাবছে, খারাপ লোকরাই তো মরছে,
কাজেই অসুবিধা কী? জানা গেল, কোনও কোনও অফিসারের
খুঁটির জোরের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছেন পুলিশ ক্যাপ্টেন।
সুযোগটা পুরোপুরি নিচ্ছে খুনি, বিস্তার করছে ওর জাল।
সে-জাল যে রানাকেই জড়িয়ে ধরবে অকস্মাৎ, ভাবেনি ও।
ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে হাইওয়েতে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে—
মেরে ফেলে উধাও করে দেয়া হবে লাশ।
খতম হয়ে যাবে রানার সমস্ত জারিজুরি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এক

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া।

আদালত চত্বরে জড়ো হয়েছে একদল সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যান। কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে তারা, এবং অপেক্ষা করতে করতে ব্যাপারটা বিরক্তিকর ঠেকছে তাদের কাছে এখন। কেউ হালকা রসিকতায়, কেউ আবার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মাধ্যমে নিজের তির্যক বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে অপরকে।

হঠাৎ করে খুলে গেল আদালতকক্ষের দরজা। সাগরের ঢেউ যেভাবে আচমকা উথলে উঠে ধেয়ে যায় তীরের দিকে, সেভাবে সচকিত হয়ে সামনের দিকে ছুট লাগাল সাংবাদিকেরা। তাদেরকে সামলাতে বালির বস্তার বাঁধের ভূমিকা পালন করছে উর্দিপরা পুলিশ আর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা।

খুলে যাওয়া দরজা দিয়ে প্রথমে ব্যাটন হাতে বের হলো আধ ডজন পুলিশ, তারপর মার্টিন বেকার, সঙ্গে লোকটার উকিল নিকোলাস নিউম্যান। দরজায় বেকারের চেহারাটা দেখা যাওয়ামাত্র একযোগে জ্বলে উঠল অনেকগুলো ক্যামেরা ও স্মার্ট ফোনের ফ্ল্যাশ--জীবন্ত হয়ে উঠেছে ফটোসাংবাদিকদের হাতে দামি এসএলআর ও মুভি ক্যামেরা। হলওয়ের আলো এখন দিনের আলোর চেয়েও বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। চোখের পলকে হাজির হয়ে গেছে ডজনখানেক মাইক্রোফোন, ওগুলো কে

কার আগে বেকারের মুখের সামনে ধরবে সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন। নিজেকে হঠাৎ করেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে বেকারের, একান-ওকান হয়ে গেছে তার নিঃশব্দ হাসি; সেটা এতই চওড়া যে, শেষ প্রান্তে সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতদুটো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মানুষটার চেন-খোলা জ্যাকেটের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে গোল, ছোটখাট একটা ভুঁড়ি। সেটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে তাকে তাগড়া আর শক্তপোক্তই বলা যায়। কালো চুলের রোদেপোড়া চেহারাটা কিছুটা যে ভারিক্কি নয়, তা-ও কিন্তু না। হাঙরের চামড়ার মত ধূসর স্যুট আর দমকলের গাড়ির মত লাল টাই-এ বেশ পরিপাটি লাগছে তাকে। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে ছ'ফুট ছাড়িয়ে যায় তার উচ্চতা, তাই তার পাশে ছোটখাট গড়ন আর সাদামাটা চেহারার নিউম্যানকে একটু বেশিই বেমানান লাগছে। মুহুর্মুহু জ্বলে-ওঠা ফ্ল্যাশের আলো সামলে নিতে কুঁতকুঁতে চোখ বার বার পিটপিট করতে হচ্ছে উকিল সাহেবকে।

করিডোরে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল বেকার, সামনের হুলস্থূল কাণ্ডকারখানা দেখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার সমস্ত মনোযোগ বুঝি সাংবাদিকদের ওপর, কিন্তু আসলে তা না। অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে অচেনা এক সাংবাদিকের দিকে, পুলিশের সঙ্গে মৃদু ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে যে-লোকের মাইক্রোফোনটা আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো বেকারের, আকর্ণবিস্তৃত মেকি হাসিটা আরেকটু চওড়া করতে গিয়ে বুঝল ওটা আর চওড়া করা সম্ভব না, তাই কিছুটা বিরক্ত হয়েই তাকাল সেই সাংবাদিককে বাধা-দেয়া পুলিশের দিকে। মনে পড়ে গেল তার এক স্যাঙাতের উদ্দেশে কিছুদিন আগে বলা নিজেরই একটা কথা, 'আমাদের পুলিশদের যা অবস্থা, ওদের উচিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব

পালন না-করে, কোলে কুকুর নিয়ে রাস্তা পার হয় যেসব বুড়ি তাদেরকে সাহায্য করা।'

'মিস্টার বেকার!' গলা ফাটাল এক সাংবাদিক, 'বেকসুর খালাস পেয়ে আপনার অনুভূতি কী?'

লোকটার দিকে সময় নিয়ে ঘুরল বেকার, মেকি হাসিটা এখনও লেপ্টে আছে চেহারায়, চোখে আগের মতই অলস দৃষ্টি। জবাব দিল না প্রশ্নটার। দেহরক্ষীরা আরেকটু সেঁটে এল তার গায়ের সঙ্গে, একসঙ্গে জড়াজড়ি করে হাঁটা পেঙ্গুইনের ছোট একটা দলের মত ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে ওরা এখন।

অস্থিরতা আর কৌতূহল আরও বাড়ল সাংবাদিকদের। কে কার আগে নিজের মাইক্রোফোন নিয়ে যাবে বেকারের মুখের কাছে সে-প্রতিযোগিতায় কয়েক দফা মৃদু হাতাহাতিও হয়ে গেল।

'মিস্টার বেকার! মিস্টার বেকার! আদালতের রায়ের ব্যাপারে কিছু বলবেন?' এবার সবার গলা ছাপিয়ে শোনা গেল আরেক সাংবাদিকের ভরাট কণ্ঠ।

'আপনার কেমন লাগছে, মিস্টার বেকার?'

'আপনাকে যে এভাবে অপদস্থ করা হলো, সেজন্যে কি পাল্টা মামলা করবেন আপনি?'

'মিস্টার বেকার, আপনার কি মনে হয় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অযথা হয়রানি করেছেন আপনাকে?'

'জেরার সময় পুলিশ কি আপনার গায়ে হাত তুলেছে?'

প্রশ্ন তো নয়, চারপাশ থেকে যেন অটোমেটিক পিস্তল থেকে বর্ষণ হচ্ছে গুলি--যার উদ্দেশে এটা করা হচ্ছে তার পর্যুদস্ত না হয়ে উপায় নেই, হোক না সেটা মানসিক। তাই বেকারের মত একজন কুখ্যাত গ্যাংস্টারও কিছুটা বিপর্যস্ত বোধ করল। কমে গেল তার মেকি হাসির বিস্তার, ঠোঁটের নীচে ঢাকা পড়ে গেল সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতদুটো, চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে

খুবই বিব্রত বোধ করছে সে। তারপরও, হয়তো আগে থেকে শিখিয়ে রাখা হয়েছে বলেই, মৌনতা ধরে রাখল সে কাঠপুতুলের মত, যেন এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে জরুরি ওর জন্য।

তার যে কিছু বলা উচিত না সেটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যই এবার মুখ খুলল নিউম্যান, 'এই দেশে করদাতাদের কোনও দাম নেই সরকারের কাছে, দাম নেই সরকারি লোকদের কাছেও। তাই এভাবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট করতে গায়ে লাগে না কারও।'

যাক, মার্টিন বেকার কিছু না বলুক, তার উকিল তো মুখ খুলেছে! আরেক দফা জ্বলতে শুরু করল ফটোসাংবাদিকদের ফ্ল্যাশ, মাইক্রোফোনগুলো আবারও প্রাণ পেয়ে হুড়োহুড়িতে লিপ্ত হলো--সবার মনোযোগ এখন নিউম্যানের দিকে।

'হ্যাঁ, যা বলছি ঠিকই বলছি আমি,' কথার গুরুত্ব বাড়াতে কণ্ঠ ভারী করেছে নিউম্যান, 'এবং আপনাদের মাধ্যমে দেশের সচেতন নাগরিকদের কাছে জানতে চাই, এসবের মানে কী? কেন অযৌক্তিক মামলামোকদ্দমার শিকার হতে হলো আমার মক্কেলের মত একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ীকে? জানতে চাই, সচেতন নাগরিকরা আর কতদিন মুখ বুজে সহ্য করে যাবেন এইসব অন্যায় অত্যাচার?'

মাথা ঝাঁকাচ্ছে বেকার, সন্তুষ্টির হাসি দেখা দিয়েছে ঠোঁটের কোনায়, তারমানে নিউম্যানের কথা মনে ধরেছে তার। ঠিক তখনই গুঙিয়ে উঠল এক ফটোসাংবাদিক, হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার হলো লোকটার ক্যামেরা, দেখা গেল কুঁচকির কাছের অতি সংবেদনশীল একটা জায়গা চেপে ধরে নুয়ে পড়েছে সে, ওখানে আঘাত পেল কী করে তা বোঝা গেল না এত হুলস্থুলের মধ্যে।

'স্যর,' বেকারের দেহরক্ষীরা যে-বেষ্টনী তৈরি করেছে, তার ভিতরে মাইক্রোফোনসহ মাথা গলিয়ে দিয়েছে এক সাংবাদিক ভোজবাজির মত, 'এনি কমেন্ট?'

‘কী?’ প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল বেকারের মুখ দিয়ে।

‘আদালতের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে?’

‘জানতে চায়, কিছু বলার আছে কি না?’ ভাবল বেকার, কিন্তু আদৌ তার কিছু বলার ছিল কি না জানা গেল না, কারণ তার এক দেহরক্ষীর কনুইয়ের গুঁতোয় ভোজবাজির মতই উধাও হলো সাংবাদিকের মাথা, শুধু মেঝেতে খটাস করে আছড়ে পড়ল মাইক্রোফোনটা। পরমুহূর্তে আরেক দেহরক্ষীর ভারী বুটের নীচে চাপা পড়ে কার্যকারিতা হারাল সেটা চিরতরে।

আরও একবার সন্তুষ্টির হাসি খেলে গেল বেকারের চেহারায়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরল নিউম্যানের কাঁধ।

জবাবে ওর দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসল নিউম্যান। তারপর সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার মনে হয় আমার মক্কেল আদালতের রায়ে খুশি।’

আদালতকক্ষের খোলা দরজা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল একটা লোক, একাকী হেঁটে এগিয়ে আসছে বেকারের দিকে। লোকটাকে দেখে খুব একটা খুশি বলে মনে হচ্ছে না। তারপরও সন্তুষ্টির ছাপ আছে সে-চেহারায়, দেখলে মনে হয় মোহমুক্তি ঘটেছে যেন ওর। ওর নাম পিটার স্পেচার, মার্টিন বেকারের মামলার চিফ প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি। তাকে দেখামাত্র বেকারের ওপর থেকে সরে গেল সবগুলো ক্যামেরা, স্থির হলো অ্যাটর্নির ওপর। উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা ক্লান্ত এবং একইসঙ্গে যে-কোনও কারণেই হোক হতাশ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের ছাঁকনিতে যথারীতি ধরা পড়তে হলো তাকে। ‘কোনও মন্তব্য, মিস্টার স্পেচার?’

‘কী মনে করেন, স্যর, মাননীয় আদালতের রায় কি যথাযথ?’

আরও কয়েকটি প্রশ্নবাণ বিদ্ধ করল তাকে।

লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সাংবাদিকদের প্রশ্নগুলো

মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে না সে, অদ্ভুত এক ধ্যানমগ্নতা ফুটে আছে তার চেহারায়। একইসঙ্গে রহস্যময় একটুখানি হাসি খেলা করছে ঠোঁটের কোনায়। নিজেকে সামলে নিল সে চট করে, আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাচ্ছে এখন, একে একে তাকাচ্ছে অথবা তাকানোর চেষ্টা করছে সবগুলো ক্যামেরার দিকে। কিছু একটা বলার সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে, শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নো কমেন্টস।' হাত দিয়ে ঠেলে-ধাক্কিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে নিজের জন্য; যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই মিশে গেল ভিড়ে।

কোর্টহাউসের বাইরে, লস অ্যাঞ্জেলেসের রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলে, ফুটপাতে জড়ো হয়েছে দুই শ'র মত বিক্ষোভকারী; ব্যারিকেড দিয়ে লোকগুলোকে আদালত চত্বর থেকে আলাদা করে রেখেছে পুলিশ। ওই ব্যারিকেড আর উর্দিপরা লাঠিয়ালবাহিনীর কারণে বিক্ষোভকারীদের মুহুর্মুহু স্লোগান, বিক্ষোভ অর্থহীন চিৎকারে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আদালতের রায় কী হতে পারে আন্দাজ করে নিয়ে জড়ো হয়েছে লোকগুলো, এবং ওদের সব স্লোগানই মার্টিন বেকারের বিরুদ্ধে। কারও কারও হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড; কোনওটাতে লেখা আছেঃ "স্বাধীন দেশে ন্যায়বিচার পরাধীন", কোনওটাতে "বিচার শুধু গরিবদের জন্য, ধনীদের সাত খুন মাফ", কোনওটাতে আবার "যে বলে অসির চেয়ে মসি বড়, তার চোখ আদালতকক্ষের নারীমূর্তিটার মতই কালো কাপড়ে বাঁধা।"

আবার কোনওটাতে সাদার উপরে লাল কালিতে বড় বড় করে শুধু লেখাঃ "খুনি"।

তাই দন্তবিকশিত মার্টিন বেকার আর নিকোলাস নিউম্যানকে যখন আদালত চত্বরের সিঁড়িতে দেখা গেল, তখন স্বাভাবিকভাবেই ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটল বিক্ষোভকারীদের মধ্যে। যারা

ব্যারিকেডের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে তাদের মধ্যে; পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে ওরা আদালত চত্বরে। কিন্তু বেকার জানে, ওই প্ল্যাকার্ডগুলো যেমন বিষহীন, ঠিক তেমনই লাফালাফির বেশি কিচ্ছু করতে পারবে না বিক্ষোভকারীরা--পুলিশ করতে দেবে না আসলে। ওদের নিষ্ফল আস্ফালন যাতে আরও বাড়ে সেজন্য হাসিটা আরেকটু চওড়া করল সে, ডান হাত যতদূর সম্ভব উপরে তুলে বিজয়সূচক "ভি" চিহ্ন দেখিয়ে দিল। তারপর, ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আর তাকে পাহারা দেয়ার কাজে ব্যস্ত পুলিশদের নিরাপত্তাবলয়ে যেন ভেসে গিয়ে হাজির হলো অপেক্ষমান একটা লিমাযিনের কাছে। সুবেশী শোফার দক্ষ হাতে দরজা খুলে দিল, বেকার আর ওর খাস লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভিতরে ঢুকে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হলো, ততক্ষণ মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অপরাধীর মত, তারপর একছুটে হাজির হলো ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজায়, ঝটকা মেরে সেটা খুলে নিজেও ঢুকে গেল গাড়ির ভেতর।

কিন্তু না, মেকি হাসি দেখানোর ইচ্ছা এখনও রয়েছে বেকারের, তাই লিমাযিনের একদিকের জানালায় উদয় হয়েছে ওর "নূরানী" চেহারা, বিজয়সূচক ভি চিহ্নটা যেন ক্রুশচিহ্নের মত লটকে আছে সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতটার পাশে। চলছে লিমাযিন, হাসছে বেকার, চুনোপুঁটি বিক্ষোভকারীদের উপহাস করছে ওর ভিক্টরি চিহ্ন। রাগে ফেটে পড়ল লোকগুলো, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে কেউ কেউ, কিন্তু যারা করছে কাজটা তারাও জানে তাদের উত্তেজনা হাপরের আগুনের মত--গনগনে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। প্রচলিত আইন সবসময়ই ব্যারিকেড দিয়ে ওদের নাগালের বাইরে রাখবে মার্টিন বেকারের মত গ্যাংস্টারদেরকে, যাদের কারণে ট্রেড ইউনিয়নের ন্যায্য

আন্দোলন ভেস্তে যায় প্রায় সবসময়, যাদের কারণে গুম হয়ে যায় ইউনিয়নের জনদরদী, আত্মত্যাগী নেতারা--কারও লাশ পাওয়া যায়, কারও যায় না।

'কুত্তার বাচ্চারা!' কোর্টহাউস থেকে নিরাপদ দূরত্বে আসার পর বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে গাল দিল বেকার, মুছে গেছে তার মেকি হাসি; যে দুই আঙুল দিয়ে ভি চিহ্ন দেখিয়েছে এতক্ষণ সে-দুটো চুলকাচ্ছে কামানো থুতনির সঙ্গে ঘষে ঘষে, 'খুনি, না? খুন কাকে বলে তা তো এখনও দেখিসইনি তোরা!'

রুটিরুজির জন্য কতকিছুই না করে লোকে। কেউ মাস্টারি করে, কেউ ট্যাক্সি চালায়। কেউ খেতে-খামারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কেউ আবার চেনে না জানে না এমন সব কামপাষণ্ডের সঙ্গে অবলীলায় বিছানায় যায়। কেউ ভাড়াটে খুনি হিসেবে মোটা টাকা কামিয়ে পকেট ভারী করে, পরে সে-টাকা খরচ করে জুয়ার আড্ডায় কিংবা মদের বোতলের পেছনে, শেষে নিজেই খুন হয়ে পড়ে থাকে কোনও কানাগলির প্রান্তে।

আর হ্যারিংটন?

নাইট শিফটে বদলি হওয়ার পর থেকে ওর সবচেয়ে বড় যে-অসুবিধাটা হচ্ছে সেটা হলো, ঘুমের অভ্যাস বদলে গেছে। ডিউটি সেরে বাসায় ফেরার পথে কেমন ভারী হয়ে আসে মাথা, কোনওরকমে নাস্তা খাওয়ার পর ইন্দ্রিয়গুলো যেন নিভে যায় একে একে, অনুভূতিশূন্যতা ঠিক কখন গ্রাস করে তাকে তা বুঝবার আগেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় সে। উঠতে উঠতে বিকেল গড়িয়ে যায় কোনও কোনওদিন। তারপর ধড়াচূড়া গায়ে চড়িয়ে নাকেমুখে কিছু গুঁজে আবার ছুট লাগাতে হয়।

এ-রকম একঘেয়ে জীবন যার, টিভি ছেড়ে খবর দেখা তার জন্য বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপরও আজ টিভি

ছেড়েছে হ্যারিংটন, ঠিক করেছে বিকেল ছ'টার খবর যতটুকু পারে দেখে তারপর কাজে যাবে।

এ-শহরে মে মাসে সন্ধ্যা ঘনাতে একটু যেন দেরিই হয়। ঘড়ির কাঁটা ছ'টা ছুঁই ছুঁই করছে, হ্যারিংটনের অ্যাপার্টমেন্টের জানালায় তেরছা রোদের আভা কমেনি মনে হচ্ছে। ছায়া ফেলতে আরও ঢের বাকি কমলা সূর্যটার।

টিভি দেখার সময় কেন যেন ভলিউম কমিয়ে রাখতে পারে না হ্যারিংটন। অভ্যাস, হয়তো। ছোটবেলায় বাবাকে দেখত কাজটা করতে, দেখতে দেখতে রীতিটা ওর অজান্তেই নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে।

হায়, বাবা! হায়, আদর্শ! রাজনীতি করতেন, দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন তিনি, নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে জান বাঁচাতে হয় যুক্তরাষ্ট্রে এসে। আয়ারল্যাণ্ডে যে-মানুষটা পরিচিত ছিলেন আদর্শবাদী আইরিশ হিসেবে, বাস্তববাদী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে, তিনি পরিণত হন এক রেস্তোরাঁর বাবুর্চির সহকারী, এবং আরেক রেস্তোরাঁর পার্টটাইম ক্লিনারে।

আমেরিকার মাটিতে জন্ম নেয়া পুত্রকে তিনি সৎ পুলিশ অফিসার বানাতে চেয়েছিলেন। সে-লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছিল হ্যারিংটন। কিন্তু না ওর বাবা, না সে নিজে জানত, এ-দেশেও নোংরা রাজনীতি আছে, এ-দেশেও যখন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে তখন কখনও কখনও আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ে শক্তিশালী মহল, আর সে-অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে তছনছ হয়ে যায় হ্যারিংটনের মত সাধারণ মানুষদের জীবন। তাই পুলিশের চাকরি থেকে যখন হাইওয়ে ট্রাফিকে পানিশমেন্ট ট্রান্সফার অর্ডার এল ওর, ততদিনে ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর বাবার; হ্যারিংটনের

মনেও দেশপ্রেমের অপমৃত্যুর পর তুষের আগুনের মত জ্বলতে-থাকা প্রতিশোধস্পৃহা ছাড়া আর কিছু বাকি নেই।

কিন্তু প্রতিশোধটা কার বিরুদ্ধে, সে-জবাব পায়নি সে আজও।

আগুনগরম কফির কাপে চুমুক দিল হ্যারিংটন। অন্য কেউ এত গরম কফি খেলে জিভ পুড়িয়ে ফেলত হয়তো। কিন্তু হ্যারিংটনের অভ্যাস হয়ে গেছে। এটা একধরনের জিঘাংসা--ঠিক কাকে পোড়ানো উচিত জানে না বলে নিজেকেই সে ছ্যাকা দিয়ে যাচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে।

'শুভ সন্ধ্যা,' রঙ মেখে সঙ সেজে যে-মহিলা খবর পড়তে এসেছে টিভির পর্দায়, তাকে দেখে মনে হচ্ছে ঢং করছে যেন, 'ছ'টার স্থানীয় খবরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ বিকেল তিনটার কিছু পরে, লস অ্যাঞ্জেলেসের মাননীয় চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কারবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত জনপ্রিয় রেমণ্ড ওয়েস্টকে সপরিবারে হত্যার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন জনৈক মার্টিন বেকারকে। অবশ্য মিস্টার বেকার ও তাঁর আইনজীবী মামলার শুরু থেকেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করে আসছিলেন, বলছিলেন তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্বার্থান্বেষী মহল তাঁদের সুনামহানি করার চেষ্টা করছে। বাদী-বিবাদীপক্ষের আবেদন-নিবেদন ও যুক্তিতর্ক শোনার পর রায় জানাতে বেশি সময় নেননি মাননীয় আদালত। মিস্টার বেকারের উকিল মিস্টার নিউম্যান দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেলের মত একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ীকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। সাংবাদিকদের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর কাছে জানতে চেয়েছেন, আর কতদিন এসব অত্যাচার সহ্য করতে হবে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের। তিনি যখন এসব মন্তব্য করছিলেন তখন আদালত চত্বরের বাইরে জড়ো হয়েছিল বেশ

কিছু বিক্ষোভকারী, যারা মাননীয় আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল। এমনকী তাদের কেউ কেউ মিস্টার বেকারকে দেখামাত্র পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু উপস্থিত দাঙ্গা পুলিশের দক্ষতার কারণে পারেনি। চিফ প্রসিকিউটার মিস্টার পিটার স্প্রেচার অবশ্য...'

রিমোট চেপে টিভি বন্ধ করে দিল হ্যারিংটন, কফি শেষ না-করেই নামিয়ে রাখল মগ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না টিভির পর্দায়, তারপরও সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। ডাল বেয়ে যেভাবে উঠে আসে শুঁয়োপোকা, দগদগে প্রতিশোধস্পৃহাটা যেন সেভাবে উঠে আসছে ওর বুক থেকে গলার দিকে।

প্রভুত্ববাদী শক্তির কাছে আবারও আদর্শবাদী শক্তির পরাজয়।

আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে আসছে হ্যারিংটনের দৃষ্টি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে আরেকদিকে। এখানে দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে আছে একটা দেয়াল, আর সে-দেয়ালে দুঃসহ অতীতের জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে ঝুলছে একটা ছবি। ওটা হ্যারিংটনেরই। পুলিশ অফিসারের চকচকে উর্দি ওর গায়ে, তারচেয়েও চকচকে ক্যাপ মাথায়, গলায় সরু নটের কালো টাই। ঠোঁটের কোনায় আত্মবিশ্বাসের হাসি, চেহারায় সততা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

কত বছর আগের ছবি ওটা? ছ'বছর...সাতও হতে পারে। আসলে হিসেবটা ভুলে গেছে হ্যারিংটন। এবং ঠিকমত মনে করার চেষ্টাও করে না কখনও। লাভ কী? ছবির মানুষ আর আজকের মানুষটার মধ্যে যে-বিস্তর ফারাক, তা কি ওই মার্টিন বেকারের মত গ্যাংস্টারদের পেছনে যারা আছে তাদের কারণেই নয়?

ছ'-সাত বছর আগেও যে-মানুষটা ছিল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল যুবক, আজ তাকে দেখলে মাঝবয়েসী মনে হয়। ছ'-সাত বছর আগেও যার কালো চোখের তারায় ঝিকমিক করত সম্ভাবনাময় আগামীর স্বপ্ন, আজ সেখানে একগাদা হতাশা; দিনের পর দিন

নাইট শিফটে কাজ করার ফলে সার্বক্ষণিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা। ছবির মানুষটা যেখানে নিঃশব্দে বলছে, আমাকে সমস্যা দাও, আমি সমাধান দিচ্ছি, সেখানে বাস্তবের মানুষটা বলে, সমস্যা সরাও, নইলে কিন্তু...

ছবিটার নীচে শু র‍্যাকের মত দেখতে বেঁটে আর অপ্রশস্ত একটা আলমারি। শু র‍্যাক? ওই জিনিসটা আর দশজনের বাসায় যতটা অনাদর-অবহেলায় থাকে, হ্যারিংটনেরটা তারচেয়ে অনেক বেশি নিগৃহীত। হবে না কেন? ওখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একগাদা মেডেল আর ট্রফি--পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর চমৎকার মার্কসম্যানশিপের কারণে পুরস্কারগুলো পেয়েছিল সে একের পর এক। শেষপর্যন্ত ভয়াবহ অবিচারের নিশানায় পরিণত হতে হলো সেই তাকেই, যার পুরস্কারঃ তার প্রিয় কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে ট্রাফিক পুলিশের চাকরি করতে বাধ্য করা।

রাইফেল, বন্দুক, শটগান, পয়েন্ট ফোর ফাইভ, নাইন মিলিমিটার পিস্তল--কোন্‌টাতে ওকে হারাতে পেরেছে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীরা? এমনকী আরও ভারী হ্যাণ্ডগানেও ওর জুড়ি ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কী লাভ হলো? ওর ইচ্ছা ছিল, গুলি করে ক্রিমিনালদের ঘায়েল করবে সে--যদি দরকার হয়। স্বপ্নটা ভেঙে দেয়া হয়েছে, ওটা বাস্তবে পরিণত হওয়ার আগেই বদলির হুকুম হল। গতিসীমা ছাড়িয়ে যায় যেসব ড্রাইভার তাদেরকে তাড়া করতে হয়, ধরে টিকেট দিতে হয়, ঘায়েল করতে হয় না। তাই হ্যারিংটনের মেডেল আর ট্রফিভর্তি আলমারিটা ওর কাছে শু র‍্যাকের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ধড়াচূড়া পরতে আরম্ভ করল সে, চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খেতে মড়ক লাগলে কী করে লোকে? যেসব পোকার কারণে মড়ক লেগেছে, বিনাবিচারে তাদেরকে হত্যা করে। যেসব মানুষের কারণে সমাজে মড়ক লেগেই আছে, তাদেরকে কী করা উচিত?

হ্যারিংটন জানে পরিস্থিতি আর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মাথা নোয়াতে হয়েছে ওকে পেশিশক্তির কাছে। ন্যায়বিচারের কল্পনা করাও যেখানে বাতুলতা, সেখানে ন্যায়বিচার...! নিজের অজান্তেই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল হ্যারিংটন। অবদমিত প্রতিশোধস্পৃহা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে, যে-মুহূর্তে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলবে তখন...

সবচেয়ে বড় কথা, একটা হ্যাণ্ডগান সবসময় থাকে ওর সঙ্গে। এবং সেটা যখন হাতে নেয় সে, অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করার ইচ্ছাটা অদম্য হয়ে ওঠে।

গতিসীমা যারা অমান্য করে তারা আইন ভাঙে, একজন ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে হ্যারিংটনের দায়িত্ব তাদেরকে জরিমানা করা; কিন্তু যারা গতিসীমা লঙ্ঘনের চেয়ে বহু গুণে খারাপ কাজ করে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব কার? আইনেরই।

কিন্তু আইন কি তা করছে?

একটু আগে টিভিতে দেখাল মার্টিন বেকারকে, দেখাল পুলিশের ব্যারিকেড ডিঙাতে চাওয়া মানুষগুলোকে; ওই ব্যারিকেড কোনওদিনও টপকাতে পারবে না ওরা, কারণ ওরা প্রকৃতপক্ষে পেশিশক্তিহীন। যারা অপরাধী তাদেরকে বাঁচানোর জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে ওসব ব্যারিকেড--সব দেশে, সব সমাজে। প্রচলিত আইন বোধহয় চায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাক, আর যারা নির্দোষ তারা ধুঁকে ধুঁকে মরুক।

উর্দি পরা শেষ। ধীর পায়ে টিভি সেটের দিকে এগিয়ে গেল হ্যারিংটন। টিভির পাশে, একটা তেপায়া টেবিলের ওপর রাখা ওর কোল্ট সেমি-অটোমেটিক। অস্ত্রটা অর্ধেক বেরিয়ে আছে হোলস্টার থেকে। ওটার পাশে হ্যারিংটনের এল.এ.পি.ডি. মোটরসাইকেল হেলমেট। পিস্তল আর হেলমেটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল হ্যারিংটন একদৃষ্টিতে, তারপর ছোঁ মেরে তুলে নিল ওদুটো। উল্টো ঘুরে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে বাইরে যাওয়ার

দরজার দিকে।

দাঁতে দাঁত পিষে বিড়বিড় করে বলল নিজেকে, 'আজকের রাতটা যেন আর দশটা রাতের মত একঘেয়ে না হয়!'

দুই

রানা এজেন্সি, লস অ্যাঞ্জেলেস।

সুসজ্জিত অফিস-কামরায়, নিজের বড়সড় ডেস্কের পেছনে, সুইভেল চেয়ারে বসে আছে মাসুদ রানা। ওর সামনে, ডেস্কের ওপর বেশ কয়েকটা ফাইল। অবশ্য এ-মুহূর্তে রানা মনোযোগ দিয়ে দেখছে কতগুলো প্রিন্টেড ডকুমেন্ট--এই শাখায় শেষ যে-বার এসেছিল, তারপর থেকে গত মাস পর্যন্ত কাজ-কর্ম, আয়-ব্যয়ের হিসেব। ওর হাতের দামি কলমটা সচল হচ্ছে থেকে থেকে, যে-হিসেব মিলে যাচ্ছে সেটাতে ছোট করে টিক চিহ্ন দিচ্ছে ও, যেটাতে খটকা লাগছে সেটার পাশে হয় কোনও মন্তব্য লিখছে, নইলে টাকার অঙ্কে গোল দাগ দিয়ে রাখছে। পরে আরও কিছু ডকুমেন্ট ঘেঁটে এ-হিসেবগুলো মেলাবে।

অখণ্ড নীরবতা।

রানার মুখোমুখি বসে থাকা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস ব্রাঞ্চের অপারেশন ইনচার্জ, সুন্দরী শায়লা মারিয়া উসখুস করছে--বলি বলি করেও কথাটা বলতে পারছে না রানাকে। সিদ্ধান্ত নিল, হিসেব দেখা শেষ করুক মাসুদ ভাই, বরাবরের মত আরাম করে

হেলান দিক চেয়ারে, তখন আস্তে-ধীরে বলবে।

একসময় কাজ শেষ হলো রানার, কলমটা হাত থেকে রেখে দিয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেলান দিল চেয়ারে। টান-টান করে মেলে দিল পা দুটো, ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল একটানা কয়েক সেকেণ্ড। দৃষ্টি না ফিরিয়ে বলল, 'বলো কী বলবে, শায়লা। সেই তখন থেকে খেয়াল করছি কী যেন বলবে বলে উসখুস করছ।'

আশ্চর্য হলো শায়লা। মানুষটা এতকিছু খেয়াল করে কখন! বলল, 'একটা খারাপ খবর আছে, মাসুদ ভাই।'

'খবরটা যে খারাপ, সে তো তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।'

'বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের প্রায় প্রতিটা কাজে যতভাবে সম্ভব বাধা দিচ্ছে এখানকার পুলিশ বিভাগ।'

ছাদ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শায়লার দিকে তাকাল রানা, পিঠ সোজা করল। 'কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শায়লা। 'জানি না। কিন্তু...করছে ওরা কাজটা। এতদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছি আমরা, কখনও কোনও সমস্যা হয়নি, হঠাৎ করেই...'

'ওদের অসুবিধা কী? আমাদের সুনাম? নাকি অন্যকিছু?'

'তা-ও বলতে পারব না,' মাথা নাড়ল শায়লা। 'আমার মনে হয় এলএপিডি'র হেডঅফিসে একবার যাওয়া উচিত আপনার। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বললে হয়তো বোঝা যাবে কেন এ-রকম করছে ওরা, নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তাঁর কাছ থেকে।'

'যাব,' আবার হেলান দিল রানা, কোটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। প্রথম কথা, শায়লা বসে আছে সামনে--ধূমপানের

সময় ধূমপায়ীর চেয়ে অধূমপায়ীর ক্ষতি হয় বেশি। তা ছাড়া ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেবে আস্তে আস্তে, এক সময় পুরোপুরিই ছেড়ে দেবে। 'আর কী খবর, বলো। কী কী কেস আছে এখন আমাদের হাতে?'

'যে-কেসগুলো আছে সেগুলো খুব একটা জটিল না, এজেন্টরা ভালোই সামাল দিতে পারছে। শুধু...'

'শুধু?'

'মার্টিন বেকারকে কব্জায় আনতে পারছি না আমরা কিছুতেই।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'মার্টিন বেকার? মানে ওই গ্যাংস্টার? একটু আগে টিভিতে যার খালাস পাওয়ার খবর দেখলাম?'

'হ্যাঁ। লোকটার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। মামলাটা হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নের এক নেতাকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে।'

'এখানে আমাদের এজেন্সির ভূমিকা কী?'

'ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই সাহায্য চাওয়া হয়েছে আমাদের কাছে। জনি নামের এক এজেন্ট আছে আমাদের, ওর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার, কেসটা দিয়েছি ওকে। বডিগার্ডের চাকরির অছিলায় বেকারের সঙ্গে ভিড়ে গেছে সে। আসলে কাছ থেকে নজর রাখছে লোকটার ওপর। তলে তলে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিরেট প্রমাণ জোগাড়ের। সে-রকম কিছু হাতে এলে, আশা করি পরেরবার খালাস পাওয়া এত সহজ হবে না বেকারের পক্ষে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে, চলো তা হলে। এলএপিডি'র ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে আসি। পথে কোথাও ডিনার সেরে নেয়া যাবে।'

ওরা দু'জনে যখন হাজির হলো এলএপিডি'র হেডঅফিসে তখন আরেকটা নতুন শিফট শুরু হয়েছে। ওরা কারা, কোত্থেকে এসেছে, কার সঙ্গে কথা বলতে চায় জেনে নিল রিসিপশনিস্ট, তারপর তথ্যগুলো জানিয়ে দিল অফিসার ইনচার্জকে। শেষে, ভিযিটরদের জন্য এককোনায় রাখা কাউচটা দেখিয়ে দিল আঙুলের ইশারায়। মুখে বলল, 'একটু বসুন আপনারা, ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে এখন দায়িত্বে আছেন ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রিচার্ড হেইডন, হাতের কাজ সেরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

জায়গামত গিয়ে বসল রানা-শায়লা।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা। ওদের দিকে কয়েকবার তাকাতে দেখে চিনে নিতে কষ্ট হলো না, রিচার্ড হেইডন কে।

অফিসের ভিতরে অনিয়মিত বিরতিতে বাজছে কোনও না কোনও টেলিফোন, রিসিভ করছে কোনও না কোনও অফিসার। কোথায় কী সমস্যা জেনে নিয়ে ইন্টারকমে জানাচ্ছে অফিসার ইনচার্জ হেইডনকে। কখনও বাঁ হাতে রিসিভার ধরে রেখে ডেস্কের উপরে রাখা খোলা নোটবুকে দ্রুত হাতে জরুরি পয়েন্ট টুকে নিচ্ছে লোকটা। কখনও আবার রিসিভারটা চোয়াল আর কাঁধ দিয়ে বাঁ কানে চেপে ধরে দু'হাতে টাইপ করছে সাইড-ডেস্কে রাখা কম্পিউটারের কী বোর্ডে, চেক করছে প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশন, তারপর সে-অনুযায়ী নির্দেশনা দিচ্ছে একে তাকে। ওর হাতের বাঁ পাশে আছে আরেকটা টেলিফোন সেট, মাঝেমধ্যে সেটাতে কথা বলছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত চাইছে।

মোট কথা, লোকটা মহাব্যস্ত, তাই রানা-শায়লাকে দেয়ার মত সময় নেই ওর কাছে।

তবুও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে রানা-শায়লা।

হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংটা পনেরো তলা, বাইরের দিকের সবগুলো দেয়াল কাঁচ দিয়ে বানানো। পনেরো তলায়, ভিযিটর'স কাউচে বসে থাকা রানা তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শহরের সাবওয়ে স্টেশনটা। সারি বেঁধে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে যাত্রীরা--সারাদিন অফিস করার পর বাড়ি ফিরবে এখন। কার্ট ভেণ্ডারদের কাছ থেকে কফি আর ডোনাট কিনে খেয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ--ডিনারের আগে হালকা নাস্তা। আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে বিকেলটা--দেখে সাপের বিষে কাবু হওয়া ইঁদুরের কথা মনে পড়ল রানার--কিছুক্ষণ পরই যেন গোধূলির পেটে ঠাঁই হবে সেটার। যেসব দোকানমালিকের জরুরি কাজ আছে তারা ইতোমধ্যে যার যার দোকান বন্ধ করে দিয়ে ব্যস্ত পায়ে হাঁটা ধরেছে ফুটপাত ধরে। ক্যামেরা আর গাইডবুকওয়ালা পর্যটকদের আলাদা করে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত দেহে যার যার হোটেলে ফিরছে তারা।

'পেপার?' পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কাউচের সামনে, টেবিলের ওপর রাখা দৈনিক পত্রিকার প্রতি রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জনৈক ডিটেকটিভ অফিসার, ঠোঁটের কোণের হাসিটা ব্যঙ্গাত্মক কি না বোঝা গেল না ঠিক।

'না, ধন্যবাদ,' মাথা নাড়ল রানা।

'ব্যাপার কী, মাসুদ ভাই?' পাশে বসা শায়লা জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়। 'লেফটেন্যান্ট কি আসলেই ব্যস্ত? নাকি আমাদের পরিচয় পেয়ে ব্যস্ততার ভান করছে?'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু হেইডনকে ওর ডেস্ক ছেড়ে উঠে আসতে দেখে বলল না।

কাছে এসে একটা ছোট সাইড-কাউচে ধপ্ করে বসে পড়ল লোকটা। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা-শায়লার দিকে, কী যেন ভাবছে। কিছু বলার সিদ্ধান্ত নিয়েও মত বদলাল, পকেট

থেকে সময় নিয়ে বের করল হাভানা চুরুট। আরেক পকেট থেকে লাইটার বের করে ধরাল সেটা। দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া দু'-চারবার গেলা ও ছাড়ার পর হঠাৎ রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন, মিস্টার মাসুদ রানা, কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

কিন্তু প্রশ্নের ধরন শুনেই বোঝা গেল, সাহায্য করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ওর।

লোকটার ব্যবহারে প্রথম থেকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব টের পেয়েছে, এবং সেটা ভাল্লাগেনি রানার। চোয়াল শক্ত করল ও। 'এখানে এসেই আমাদের সমস্যার কথা জানিয়েছি আপনাকে, লেফটেন্যান্ট।'

'জানিয়েছিলেন? শিয়োর?'

'কেন, রিসিপশনিস্ট তো আমাদের সামনেই ফোনে কথা বলল আপনার সঙ্গে?'

'কী জানি, হবে হয়তো। আমার অবস্থা তো নিজচোখেই দেখেছেন। একের পর এক ফোন ধরতে হচ্ছে, যারা নতুন তাদেরকে গাইড করতে হচ্ছে। একইসঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে বড়কর্তাদের সঙ্গে--সব সিদ্ধান্ত তো আর একা নিতে পারি না। সেই সঙ্গে টাইম টু টাইম চেক করতে হয় এলএপিডি'র সার্ভার। অপরাধীরা অনেক আধুনিক হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে...'

'অপরাধীদের সঙ্গে কীভাবে তাল মিলিয়ে চলবেন সে-ব্যাপারে আলোচনা করতে আসিনি আমরা, লেফটেন্যান্ট,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'এই শহরে ব্যবসা করতে দেয়া হচ্ছে না কেন আমাদেরকে, সেটা জানতে এসেছি।'

'কে বলল ব্যবসা করতে দেয়া হচ্ছে না আপনাদেরকে? আপনারা যে ব্যবসা ঠিকমতই করছেন, সে-খবর আছে আমার কাছে।'

'মোটেও না,' প্রতিবাদ করল শায়লা। 'ছোটখাট কেসগুলোতে পুলিশ কিছু বলছে না। কিন্তু কেসের ধরন একটু গুরুতর হলেই বার বার নাক গলানো হচ্ছে আপনাদের তরফ থেকে। এ-রকম অন্তত দশটা কেসের কথা বলতে পারব, যেখানে আমাদের এজেন্টদেরকে বলতে গেলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে আপনার অফিসাররা।'

'তা-ই নাকি?' ফুঁ করে আরেকবার কটুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়ল হেইডন। 'তা হলে তো খুবই খারাপ কথা। তা, সেসব অফিসাররা কারা, দেখিয়ে দিতে পারবেন? ওদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করতাম অসুবিধাটা কোথায়।'

'দেখুন,' শায়লার কণ্ঠ অসহিষ্ণু, 'পরিচিত অফিসার যারা ছিল, এখানে তাদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের এজেন্সির এজেন্টরা বলছে, আপনাদের বেশিরভাগ অফিসারই নাকি বদলি হয়ে গেছে মাস ছয়েক হলো, যারা এসেছে তাদের প্রায় সবাই আনকোরা নতুন। কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলব আপনার কাছে?'

সিগারটা, যে-কোনও কারণেই হোক, খেতে হয়তো আর ভালো লাগছে না হেইডনের, তাই বিষদৃষ্টিতে সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত মাথাটা পিষে মারল। সশব্দে নাক টেনে বলল, 'কোনও বুড়ির বিড়াল হারিয়ে যাওয়া, গাড়ির নীচে পড়ে কারও আদরের পোষা কুকুরটার মারা যাওয়া, অথবা আরেকটু চাইলে কোনও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে টাকা চুরি যাওয়ার রহস্য যদি তদন্ত করতে চান, তা হলে সেগুলোর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার বেশি কিছু যদি চান,' সরাসরি তাকাল রানার চোখের দিকে, 'এবং সেক্ষেত্রে আমাদের অফিসাররা যদি মনে করে আপনাদের

কাজে নাক গলানো দরকার, তা হলে কাজটা করবে তারা। বোঝা গেছে?'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে রানার। 'যে-কোনও অপরাধ অথবা রহস্য তদন্ত করার লাইসেন্স আছে আমাদের, লেফটেন্যান্ট।'

'আপনাদের কী আছে আর কী নেই, সে-জ্ঞান আছে আমার। কাজেই দয়া করে জ্ঞানটা নিজের পকেটেই রাখুন। নতুন কিছু যদি বলার না থাকে, তা হলে জানাতে বাধ্য হচ্ছি: যে-পথ ধরে এসেছেন এখানে, বেরোনোর রাস্তাও সেটাই। বসে বসে গল্প করার জন্য বেতন দেয়া হয় না আমাকে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করব আমরা।'

উঠে দাঁড়াল হেইডনও। 'কেন? আপনাদের অভিযোগের মীমাংসা করার জন্য আমি কি যথেষ্ট নই?'

'না,' চটেছে রানা, 'মোটেও না।'

'কী বললেন?'

'মিস্টার রানা?'

ডাক শুনে ঘুরে তাকাল ওরা তিনজনই।

অফিসে এসেছেন এলএপিডি'র ডিটেকটিভ চিফ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্যাণ্ডফোর্ড।

'স্যর...' উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দেখামাত্র হড়বড় করে কিছু বলতে চাইল হেইডন, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

'কী সমস্যা, মিস্টার রানা?'

পূর্বপরিচয় এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার কারণে রানা এজেন্সি, অন্যকথায় রানার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডের।

সমস্যাটা কী, জানাল রানা।

কথাগুলো শুনে ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ক্যাপ্টেন, কী যেন ভাবছেন। তারপর রানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখুন, মিস্টার রানা, আগের মত আর নেই সব।'

'আগের মত নেই মানে?'

'অনেক কিছু বদলে গেছে এলএপিডিতে। নতুন নতুন লোক এসে যোগ দিয়েছে এখানে, তাদের কারও কারও খুঁটির জোর ভয়ানক শক্ত। ...চাকরির আর অল্প কয়েকটা বছর বাকি আছে আমার, ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র কলিগদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে শান্তিপূর্ণ একটা রিটায়ারমেন্টের পথ রুদ্ধ করতে চাই না।'

চুপ করে আছে রানা, ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এ-রকম কিছু শুনতে হবে আশা করেনি।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে শায়লা, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

ওদের দু'জনের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল হেইডন। বাঘের সঙ্গে যদি কখনও শিয়ালের লড়াই বাধে, তা হলে বাঘ যেভাবে নাক সিঁটকাবে সে-ভঙ্গিতে নাক সিঁটকে বলল, 'আপনারা অন্য কোনও শহরে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা করুনগে, যান। এখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমরাই যথেষ্ট, কোনও ভাড়াটে লোকের দরকার নেই। আর...আগেও বলেছি, আবারও বলছি, যে-পথে ঢুকেছেন আমাদের অফিসে, বেরোনোর রাস্তাও সেটাই।'

মুখে কথা নেই ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডের। হেইডনের কথাগুলোর প্রতিবাদ করা দূরে থাক, রানাকে সান্ত্বনা জানানোর জন্যও কিছু বললেন না তিনি।

যা বোঝার বুঝে নিল রানা। নিচু গলায় শায়লাকে বলল, 'চলো।'

শহর ছাড়িয়ে হাইওয়েতে উঠেছে বেকারের লিমাযিন, মসৃণ

গতিতে ছুটছে পশ্চিমদিকে। পিছন থেকে আরও পিছনে পড়ে যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসের দিগন্তরেখা; দূর থেকে বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে ডুবন্ত সূর্যের পটভূমিতে আঁকা কোনও ছবি।

খালাস পাওয়ার পর বেকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে সোজা হাজির হবে এয়ারপোর্টে, সান ফ্র্যান্সিস্কো'র ফ্লাইট ধরবে। ওখানে রেমণ্ড ওয়েস্টের কয়েকজন গোঁড়া সমর্থক আছে--ট্রেড ইউনিয়নের উঠতি নেতা, ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় বেকার। ওদেরকে বোঝাতে হবে, নামমাত্র পারিশ্রমিকে এক-দু'শ' শ্রমিক দিয়ে বিক্ষোভ করিয়ে কোনও লাভ হবে না। তাতে শুধু শুধু সময় নষ্ট, টাকারও খারাবি। তারচেয়ে ভালো--বেকার প্রস্তাব দেবে--আমি মাল দিচ্ছি, দু'হাত ভরে নাও, বিনিময়ে বিক্ষোভ-টিক্ষোভের কথা ভুলে যাও বেমালুম। যে চলে গেছে, আদর্শবাণী লেখা দু'-চারটে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আদালত চত্বরের বাইরে লাফালাফি করলে সে ফিরে আসবে নাকি?

কখনও কোথাও একা যাওয়ার অভ্যাস নেই বেকারের, কে জানে কেন। ঠিক করেছে, এবার নিউম্যানকে সফরসঙ্গী বানাবে। সে মনে করে, একজন উকিলের দায়িত্ব শুধু টাকা খেয়ে ওকালতি করা নয়, বরং মক্কেলের চাহিদামত তাকে সঙ্গ দেয়াও বটে। পেছনের সিটে আরাম করে বসেছে সে, খেয়াল করছে ওরা রওয়ানা দেয়ার পর থেকেই কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগছে নিউম্যান। কারণটা কী, বুঝতে পারছে না বেকার, বুঝতে চায়ও না।

পেছনের সিটের তৃতীয় ব্যক্তিটার নাম জনি, বেকারের নিজস্ব দেহরক্ষীবাহিনীর নেতা। খোঁজখবর করে লোকটাকে নিয়োগ দিয়েছে বেকার। লস অ্যাঞ্জেলেসে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, জনি সে-প্রতিষ্ঠানেরই একজন সদস্য ছিল। লোকটা দক্ষিণ-এশীয়, বাড়তি পয়সার লোভে জুটে গেছে বেকারের সঙ্গে। মুচকি হাসল বেকার। টাকার লোভ নেই

এ-রকম মানুষ পৃথিবীতে নেই।

নিউম্যানের উদ্দেশে মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, রিয়ারভিউমিররে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ড্রাইভার ববি জানিয়ে দিল এমন সময়, 'পুলিশ।'

ফেরাউনের কাছে মুসা নামটা যে-রকম, সব ক্রিমিনালের কাছে পুলিশ শব্দটা ঠিক সে-রকম। তাই ঝট্ করে ঘাড় ঘুরাল বেকার, টের পেল ওর মুখের ভিতরটা তেতো হয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। হ্যাঁ, লিমাযিনের মতই মসৃণ গতিতে এগিয়ে আসছে একটা পুলিশ-মোটরসাইকেল, নির্দিষ্ট বিরতিতে জ্বলতে থাকা লাল-নীল আলো আর একটানা প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ কেমন অলক্ষুণে মনে হচ্ছে।

'কুত্তার বাচ্চা!' বিড়বিড় করে ববিকে গাল দিল বেকার।

ওকে কতবার বলেছে সে, আর যা-ই করিস, স্পিড লিমিট ক্রস করবি না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে উঠলেই নিজেকে দু'পয়সার শোফারের বদলে আরব শেখ বলে মনে করে লোকটা বোধহয়, তাই আগেও কয়েকবার জরিমানা গুনতে হয়েছে বেকারকে। সেই একই ঘটনা ঘটতে চলেছে আজও। আর সত্যিই যদি তা হয়, দাঁতে দাঁত পিষে ভাবল বেকার, লাথি মেরে ব্যাটাকে খেদাবেই সে এবার, কোনও দয়ামায়া দেখাবে না। আগে যে-ক'বার লাথি মারতে গেছে, ততবার ওর পা জড়িয়ে ধরেছে ববি, তাই শেষপর্যন্ত কিছু করা যায়নি। কিন্তু এবার কোনও সুযোগ দেয়া যাবে না।

রেমণ্ড ওয়েস্টের হাতে পরপারের টিকেট ধরিয়ে দিয়ে খুব একটা সুখে নেই সে, ঠেলা সামলাতে গিয়ে জলের মত টাকা খরচ করতে হচ্ছে, তার ওপর যদি...

আর পিছু না তাকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও আবারও ঘাড় ঘুরাল বেকার, আরেক দফা দাঁতে দাঁত পিষে সামনে ঝুঁকে বসল।

তারপর ডান হাতটা লম্বা করে কষে একটা চাঁটি মারল ববির চাঁদিতে।

বাঁ হাতটা স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে স্থানচ্যুত হওয়া হ্যাটটা সামলাতে সামলাতে ববি বলল, 'আমি স্পিড লিমিট ক্রস করিনি, বস্।'

'তা হলে পেছনের পুলিশটার সঙ্গে নিশ্চয়ই খারাপ সম্পর্ক ছিল তোর মা'র,' বলল বেকার, 'যে-কারণে তোকে থামিয়ে তোর মা'র কথা জিজ্ঞেস করবে।'

কথাটা শুনে চেহারা লাল হয়ে গেল ববির, দৃশ্যটা কিছুটা হলেও উপভোগ করল বেকার রিয়ারভিউমিররে।

একই দৃশ্য দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল নিউম্যান, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু এটা পরিষ্কার, ওর অস্বস্তি আরও বেড়েছে।

ওদিকে অনেকগুলো দাঁত বের হয়ে গেছে জনির, ইদানীং যার নুন খাচ্ছে তার কাণ্ডকারখানা দেখে মজা পাচ্ছে।

'গতি কমা, শালা!' শীতল গলায় ববির উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল বেকার। 'নিরালা দেখে কোনও জায়গায় সাইড কর্। আমি চাই না, আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে যারা যাবে তাদের কেউ আমাকে চিনে ফেলুক, যাতে পরে বলতে পারে মার্টিন বেকারকে হাইওয়ে-পুলিশের কাছে জরিমানা খেতে দেখেছে।'

কথামত কাজ করল ববি।

মসৃণ গতিতে এসে লিমাযিনের পেছনে থামল মোটরসাইকেলটা।

ডানদিকের লেন ধরে সাঁ করে বেরিয়ে গেল একটা গাড়ি।

আজ হাইওয়েতে ট্রাফিকের চাপ তেমন একটা নেই।

মোটরসাইকেল থেকে নেমেছে অফিসার, এগিয়ে আসছে লিমাযিনের দিকে, নিরালা রাস্তায় লোকটার বুটের খট্খট্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দূরের সবুজ পাহাড়গুলোর আড়ালে আজকের

দিনের মত মুখ লুকাতে যাচ্ছে সূর্য। রোদ নেই, ছিটেফোঁটা যা আছে তা থাকা না-থাকা সমান, তারপরও হেলমেটপরা অফিসারের চোখদুটো কালো সানগ্লাসে ঢাকা। কপাল দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না চোখ; খাড়া নাক, ফ্যাকাসে গাল, পাতলা ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ চিবুকের কারণে লোকটাকে কেমন পাথর-কুঁদে-বানানো মূর্তির মত লাগছে। ওর চালচলনও রোবটের মত, দেখলে মনে পড়ে যায় রোবকপের কথা।

মুখের ভিতরটা আরও একবার তেতো লাগল বেকারের।

ওদিকে আরও একবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল নিউম্যান, বোঝা গেল না এবারও।

জনির দাঁতগুলো ঠোঁটের আড়ালে উধাও হয়ে গেছে কখন যেন।

শুধু ববিই কিছুটা বীরত্ব দেখাচ্ছে--রাগী রাগী চোখে তাকিয়ে আছে অফিসারের দিকে।

ওর জানালার পাশে যখন এসে দাঁড়াল "মূর্তিমানব", দেখে মনে হলো না ববিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিচ্ছে সে। যন্ত্রচালিতের মত ডান হাতটা তুলল সে সময় নিয়ে, আঙুলের ইশারায় জানিয়ে দিল, ওর ইচ্ছা ববির পাশের জানালার কাঁচ নামানো হোক।

স্টিয়ারিং-এর পাশের একটা সুইচ টিপে দিয়ে অফিসারের ইচ্ছাটা পূরণ করল ববি। মৃদু আওয়াজ করে নেমে যাচ্ছে ইলেকট্রনিকালি কন্ট্রোল্ড গ্লাস। ট্রাফিক পুলিশের প্রতি পৃথিবীর সব দেশের সব ড্রাইভারের যে-চিরাচরিত "সম্মান" থাকে, তা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য খুলে-যাওয়া জানালা দিয়ে থু করে থুতু ফেলল ববি; অফিসারের চকচকে বুট থেকে ইঞ্চিখানেক সামনে পড়ল থুতুর দলা।

আশ্চর্য, কোনও ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না অফিসারের চেহারায়--মুখের একটা পেশিও কোঁচকায়নি ওর, সানগ্লাসের

আড়ালে লুকানো চোখদুটো সম্ভবত আগের মতই একদৃষ্টিতে দেখছে ববিকে। বলল, 'স্যর, আমি কি আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখতে পারি?'

শুদ্ধ উচ্চারণ আর মোলায়েম কণ্ঠ শুনলে মনে হয় লোকটা যেন বিনয়ের অবতার।

স্যর? ভ্রূ কপালে উঠে গেছে ববির। ভুল শুনছে নাকি? একজন পুলিশ অফিসার ওর মত একটা লোককে স্যর বলে সম্বোধন করছে? বার কয়েক চোখ পিটপিট করল সে। এই প্রথম কেউ ওকে স্যর বলে ডাকল। মনের ভিতরে কেউকেটা ভাবটা অঙ্কুরিত হওয়ামাত্র সিদ্ধান্ত নিল, সেটাকে ডালপালা গজাতে দেবে। ওর কণ্ঠ যতটা না গম্ভীর, তারচেয়ে বেশি গম্ভীর বানিয়ে অফিসারকে বলল, 'আপনি কি জানেন পেছনে কে বসে আছেন?'

নিরীহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অফিসার, ভাবখানা এমন: যে-ই বসে থাকুক, আমার কিছু করার নেই। আবারও মোলায়েম গলায় বলল, 'আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখতে হবে আমাকে, স্যর।'

'তা-ই নাকি?' ষাঁড় যে-দৃষ্টিতে ভেড়ার দিকে তাকায়, অফিসারের দিকে সেভাবে তাকাল ববি। 'তা হলে অপেক্ষা করতে হবে। খুঁজে দেখি কোথায় আছে।' সশব্দে নাক টানল, ওর ডান হাতটা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে শার্টের বুকপকেটের দিকে। বুকপকেটে লাইসেন্স নিয়ে ড্রাইভ করে না সাধারণত কেউই, ববিও না, তারপরও পকেট হাতড়াচ্ছে; ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করছে আসলে।

'আপনাকে কেন থামালাম জানতে চাইলেন না?' অফিসারের কণ্ঠ এখনও সুললিত।

'জানতে চায়নি, কারণ জানতে চাওয়ার দরকার নেই,' ঘাড়টা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে নিউম্যান। 'আপনার নামটা স্পষ্ট

পড়তে পারছি আমরা, এবং সেটা মুখস্থও হয়ে গেছে এতক্ষণে। আমাদেরকে হয়রানি করে কত বড় ভুল করেছেন সেটা টের পেতে বেশি সময় লাগবে না আপনার আশা করি।'

সময় নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিউম্যানের দিকে তাকাল অফিসার। ভাব দেখে মনে হচ্ছে উকিলের হুমকিতে মোটেও বিচলিত হয়নি, অথবা হুমকিটা বুঝতে পারেনি আদৌ। 'আপনারা একটা ডাবল লাইন ক্রস করে এসেছেন।'

'তা-ই নাকি?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল নিউম্যান। 'আপনি যা বলেন।' একটু নড়েচড়ে বসল, কেন জানি আবারও ভুগতে শুরু করেছে অস্বস্তিতে।

সরু চোখে অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে জনি। সে জানে, ডাবল লাইন ক্রস করেনি ববি। তারমানে মিথ্যা বলছে অফিসার। একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে কাজটার: ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে যখন আপত্তিকর কিছু পাবে না, তখন ঘুষ চাইবে। তারমানে আমেরিকান ট্রাফিক পুলিশদেরও "উন্নতি" হয়েছে? মুচকি হাসল জনি। বোঝা যাচ্ছে ট্রাফিক অফিসারদের ওপর নজরদারি করার মত যথেষ্ট সময় পাচ্ছে না বড়কর্তারা।

শূকর যেভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, নাক দিয়ে সে-রকম শব্দ করে বিড়বিড় করে কী যেন বলল বেকার, ঠিক বোঝা গেল না।

অফিসার আগের মতই ভাবলেশহীন।

পকেট হাতড়ে কিছু পেল না ববি, পাওয়ার কথাও না, দাঁত কেলিয়ে হাসল সে অফিসারের উদ্দেশে, তারপর হাত বাড়াল ড্যাশবোর্ডের দিকে। ওটা খুলে হাতড়াল কিছুক্ষণ, পেয়ে গেল "কাঙ্ক্ষিত" জিনিসটা, তারপর "এই নে, শালা, কী করবি কর্" ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল অফিসারের দিকে।

লাইসেন্সটা নিয়েই নিজের মোটরসাইকেলের দিকে হাঁটা ধরল অফিসার, একবার দেখলও না হাতেধরা জিনিসটা। নিকটস্থ

পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য রেডিয়ো আছে মোটরসাইকেলে, প্যাঁচানো তারওয়ালা মাউথপিসটা তুলে নিয়ে কথা বলছে। মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে লাইসেন্সের দিকে, স্টেশনের ডিউটি অফিসারকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিচ্ছে মনে হয়।

জানালা দিয়ে আরেকবার থুতু ফেলল ববি। গাড়ির বাকিদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'চেক্ কর্, শালা, তোর বাপের নাম চেক্ করে দেখ্। যদি প্রমাণ করতে পারিস ওই লাইসেন্সে কোনও ঘাপলা আছে, নিজের নামে কুত্তা পুষব নিজেরই বাড়িতে।'

রেডিয়োতে কথা বলা শেষ অফিসারের, মাউথপিসটা নামিয়ে রাখছে ধীরেসুস্থে। এবার, আগের চেয়েও ধীরগতিতে, একটা টিকেট লিখতে শুরু করল। তারমানে, জরিমানা করতে যাচ্ছে ববিকে।

দাঁতে দাঁত পিষল বেকার, অফিসারের ওপর চরম বিরক্তি বোধ করছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে ওর, ওই লোক আরও দেরি করিয়ে দিচ্ছে। ঘাড়টা পোষা উকিলের দিকে ঘুরিয়ে নিচু গলায় বলল, 'নিউম্যান, কাজ সেরে ফেরার সময় মনে করিয়ে দিয়ো। শুয়োরের বাচ্চাটা কত বড় অফিসার দেখে নেব। ওর চাকরি যদি না খেয়েছি, আমার নাম মার্টিন বেকার না।'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল নিউম্যান, কিন্তু পারল না। লেখা শেষ অফিসারের, বুটের খট খট আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে সে গাড়ির দিকে...লোকটার হাঁটার ভঙ্গি এবার একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে না? নাকি রিয়ারভিউমিররে কোনও সমস্যা? এত জলদি তো সমস্যা হওয়ার কথা না!

আরও একবার নড়েচড়ে বসল নিউম্যান। এ-রকম অস্বস্তি লাগার কারণ কী?

ববির পাশে, ঠিক আগের জায়গায় এসে থামল অফিসার,

ঝুঁকল খানিকটা। পেছনের সিটে বসা বেকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটা কি আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন করা?'

আমার নামে না তো কি তোর বাপের নামে রেজিস্ট্রেশন করা--কথাটা চলে এসেছিল বেকারের জিভের ডগায়, কিন্তু সংযত করল নিজেকে। বুঝতে পেরেছে অফিসারের কণ্ঠ আগের মত মোলায়েম না। শুনে মনে হচ্ছে, প্রশ্নটার উত্তর ভালোমতই জানে লোকটা, তারপরও জানতে চাচ্ছে--ওই ব্যাপারে হয়তো স্বীকারোক্তি চায় বেকারের কাছ থেকে।

কিন্তু "সামান্য" একজন হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ অফিসারের, যার চাকরি খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই--প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত গুরুত্বহীন কাজ করে না বেকার। তাই চুপ করে থাকল সে।

'জী, জনাব,' মালিক নিশ্চুপ দেখে মুখ খোলাটা দায়িত্ব বলে মনে করল ববি, 'গাড়িটা তাঁর নামেই রেজিস্ট্রেশন করা।'

'আপনার এই নাটক আর কতক্ষণ চলবে?' বেকারের পাশ থেকে খেঁকিয়ে উঠল জনি। 'দয়া করে কি যেতে দেবেন আমাদেরকে?'

'রেজিস্ট্রেশনটা একটু দেখতে হবে আমার,' জনির দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব দিয়ে দিল অফিসার।

'আগে আমার লাইসেন্স ফেরত দিন,' ববির কণ্ঠে অনুরোধ নয়, আদেশ, 'তারপর আপনার যা খুশি লাগে করুন।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অফিসার, ভাবখানা এমন: আপনারা অসহযোগিতা করলে আমার কী করার আছে? ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলছে সে, জরিমানার টিকেটসহ ববির লাইসেন্সটা সে-হাতেই ছিল। কিন্তু হাতটা যখন তুলল জানালার কাছে, গাড়ির ভিতরে বসে-থাকা চারজনেরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

অফিসারের হাতে দেখা যাচ্ছে লম্বা নলের একটা পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম রিভলভার।

ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে জরিমানার টিকেট, উধাও হয়ে গেছে ববির লাইসেন্সও, ম্যাগ্নামের লম্বা নলটা ক্ষুধার্ত বাঘের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঠিক কার দিকে, বোঝার উপায় নেই।

দ্বিধা-জড়তা কাটিয়ে উঠতে দু'-তিন সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না জনির, চট করে হাতটা ঢুকিয়ে দিল সে কোটের ভিতরে--শোল্ডার হোলস্টারের দিকে।

কিন্তু ওকে পিস্তল বের করার সুযোগ দিল না অফিসার। অত্যন্ত দক্ষ হাতে, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ট্রিগার টানল সে; এবং ম্যাগনামের নলটা স্থির থাকল না একই নিশানায়।

প্রথম দুটো বুলেট ঢুকল জনির দুই চোখ দিয়ে, ওর ডান হাতটা শোল্ডার হোলস্টারের কাছে যাওয়ার আগেই মারা গেল সে। একইসঙ্গে বিস্ময় আর ভয়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল ববির মুখ, সে-শূন্যস্থান দিয়ে ঢুকল তৃতীয় বুলেট, জরিমানার টিকেটের বদলে দুনিয়া ছাড়ার টিকেট নিয়ে ঢলে পড়ল সে পাশের সিটে।

যার যার জায়গায় স্রেফ জমে গেছে বেকার আর নিউম্যান, কী ঘটছে বুঝতে পারছে না কেউই। খুনি ম্যাগনামের নলটা ইঞ্চিখানেক সরল, খানিকটা ঝুঁকে সানগ্লাসে-ঢাকা চোখে ওদেরকে দেখল অফিসার কয়েক সেকেণ্ড, কী যেন বলতে চেয়েও সিদ্ধান্ত বদল করল, তারপর আবারও হঠাৎ ট্রিগার টেনে নিউম্যানের কপালে রক্তের একটা লাল টিপ পরিয়ে দিল।

অবশ হয়ে গেছে বেকার। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে ওর, সারাজীবনের সবচেয়ে বাজে দুঃস্বপ্নটা দেখছে এখন। কিন্তু সমস্যা একটাই: স্বপ্ন দেখার সময় সেটা যতটা বাস্তব বলে মনে হয়, সামনে পড়ে-থাকা ববি কিংবা দু'পাশের লাশদুটো

তারচেয়েও বেশি বাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

'গাড়িটা কি আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন করা, স্যর?' অফিসারের নিরীহ প্রশ্নে এতটাই চমকে উঠল বেকার যে, মনে হলো আরেকবার গর্জন করেছে ভয়াল ম্যাগনাম।

এবার জবাব দিতে খুব ইচ্ছা করছে বেকারের, অফিসারের জিজ্ঞাসার বিপরীতে কিছু বলতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে ওর কাছে, কিন্তু হারামি জিভ কিছুতেই নড়ছে না মুখের ভেতর। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে, আর কয়েক মুহূর্ত পরই জনি, ববি বা নিউম্যানের পরিণতি. বরণ করতে হবে তাকেও। মদখোর যেভাবে তারিয়ে তারিয়ে হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি খায়, ঠিক সেভাবে ওকে খুন করতে চলেছে কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা।

ম্যাগনামের পঞ্চম আর ষষ্ঠ বুলেট খুঁজে পেল নিজেদের ঠিকানা--উধাও হয়ে গেল বেকারের ডান চোখ, প্রায় একইসঙ্গে গর্ত তৈরি হলো ওর খুলির পেছনে গাড়ির ব্যাকউইণ্ডোতে; মাত্র আধ সেকেণ্ডের ব্যবধানে বড় আরেকটা গর্ত দেখা দিল কুখ্যাত গ্যাংস্টার ওরফে স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর বুকের বাঁ দিকে। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে খুব একটা কষ্ট হলো না লোকটার।

বড়জোর দশ কি বারো সেকেণ্ড। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ট্রিগার টানায় যতটা দ্রুততা আর লক্ষ্যভেদে যতটা দক্ষতা দেখিয়েছে অফিসার, তারচেয়েও বেশি দ্রুতগতিতে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে যমকে, কারণ চার চারজন লোকের প্রাণ হরণ করতে হয়েছে তার মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

পরিস্থিতি এখনও আগের মতই স্বাভাবিক--খাঁ খাঁ করছে হাইওয়ে, কান পাতলে মাঝেমধ্যে শোনা যায় মৃদুমন্দ বাতাসের আওয়াজ, অনেক দূরে জটলা পাকিয়ে থাকা কয়েকটা বেঁটে পাহাড়ের পাদদেশে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ধুলোর পাতলা মেঘ। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে গোধূলি, প্রকট হচ্ছে

সন্ধ্যার অন্ধকার।

রাস্তা দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে আসছে একটা গাড়ি, এখনও দূরে আছে অবশ্য। উল্টোদিক থেকে রাস্তা পার হয়ে অনিশ্চিত পায়ে লিমাযিনের দিকে এগিয়ে আসছিল একটা বিড়াল, থমকে দাঁড়াল; হেডলাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল ওটার চোখদুটো। কাছে আসতে সময় লাগল গাড়িটার, কাছাকাছি এসে গতি কমাল ড্রাইভার, কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারের মোটরসাইকেল আর একটা থেমে থাকা লিমাযিন দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল, গতি বাড়িয়ে চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে।

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খোলা জানালা দিয়ে ববির মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল অফিসার, তারপর উল্টো ঘুরে আরও একবার বুটের খট্ খট্ আওয়াজ তুলে এগোতে লাগল মোটরসাইকেলের উদ্দেশে। এমন আয়েশী ভঙ্গিতে সিটে বসল, দেখলে মনে হয় জরিমানার টিকেট লেখার মত একঘেয়ে কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি। মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল--জ্বলে উঠল হেডলাইট, তারপর যেভাবে হঠাৎ করে হাজির হয়েছিল সেভাবেই দ্রুত উধাও হলো রাতের আঁধারে।

তখন মসৃণ গতিতে আকাশ থেকে নীচে নামছে একটা প্লেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাণ্ড করবে এয়ারপোর্টে। এই প্লেনেই ওঠার ইচ্ছে ছিল বেকারের।

তিন

গিল্ডবার্গ স্ট্রিটে, বারবারা'স নামের রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে গেল রানা-শায়লা। এককোনায়, জানালার পাশে বসে পড়ল মুখোমুখি।

জানালার কাঁচ নামানো। থেকে থেকে বাতাস বইছে বাইরে, সে-কারণে রাস্তায় মৃদু ঘূর্ণি উঠছে একটু পর পর, ধুলো, রাস্তার এখানে-সেখানে ফেলে রাখা প্লাস্টিকের ওয়ান টাইম গ্লাস আর পলিথিনের প্যাকেট উড়ে বেড়াচ্ছে তখন। কিছুটা তাড়াহুড়ো দেখা যাচ্ছে পথচারীদের মাঝে, অসময়ে ঝড় এল কি না সে-ব্যাপারে আশঙ্কা তাদের মনে। দূরের বড় রাস্তায় দ্রুত চলে যাচ্ছে গাঁড়িগুলো, হর্নের আওয়াজ এক সেকেণ্ডও স্থায়ী হচ্ছে কি না সন্দেহ।

'এবার?' মৃদু গলায় জানতে চাইল শায়লা।

এলএপিডি'র অফিস থেকে বের হয়ে সোজা গাড়িতে উঠেছে রানা, একটা কথাও বলেনি। এমনকী যখন ড্রাইভ করছিল তখনও মুখ বন্ধ ছিল ওর। মনে মনে স্থির করেছে, প্রয়োজনে অনেক ওপর পর্যন্ত যাবে এই হয়রানির শেষ দেখতে।

শায়লার প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে, টেবিলের ওপর রাখা ল্যামিনেটেড ফুডমেন্যুর দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'কী খাবে, ঠিক করো।'

মেন্যুর ওপর একটুখানি নজর বুলিয়েই রানার দিকে তাকাল

শায়লা। 'আমার খিদে মরে গেছে। ভেবেছিলাম ভারী কিছু খাব, এখন আর ইচ্ছে করছে না। একটা বীফবার্গার আর এক কাপ গরম কফি হলেই চলবে।'

ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্যও একই আইটেম অর্ডার করল রানা। তারপর হেলান দিল চেয়ারে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

লস-অ্যাঞ্জেলেসে যখন শাখা অফিস খোলে ও, তখন থেকেই বারবারা'স-এ যাতায়াত করছে। এতদিনে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেয়েছে বারবারা'স, এবং তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে আস্তে আস্তে কমেছে রেস্টুরেন্টটার আগের জৌলুস। এককালে এখানকার দেয়ালে সাদা সিমেন্টের ওপর চমৎকার সবুজ রঙের কাজ ছিল, এখন চলটা উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়, এখানে-সেখানে ছোপ ছোপ সাদা সিমেন্ট দেখলে কেন যেন ফোকলা দাঁতের বুড়োর কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যা হলেই নিঅন সাইনে "ডিনার" শব্দটা ঝুলত সদর-দরজায়, ঢোকার সময় রানা দেখেছে সে-শব্দের একটা "এন" নেই, এবং "আর"টাও যাই যাই করছে।

বার্গার আর কফি বানানোই থাকে এ-ধরনের রেস্টুরেন্টে, তাই রানা-শায়লার টেবিলে ওদের অর্ডার সার্ভ করতে সময় লাগল না।

ইঙ্গিতে খেয়ে নিতে বলল রানা শায়লাকে, নিজেও কামড় বসাল বার্গারে। মুখের ভিতরের খাবারটুকু দু'-চারবার চিবিয়ে টেনে নিল কফির কাপ। ও যেখানে বসেছে, তার ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে লাগানো আছে বড় স্ক্রীনের একটা ওয়ালমাউন্ট টিভি। বেসবল, রাগবি, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখায় যেসব চ্যানেল, খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য সাধারণত সেসব চ্যানেলই চলতে থাকে সেটাতে। একটু আগেও দেখানো হচ্ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস ডেভিলস আর শিকাগো বুলস-এর বাস্কেটবল ম্যাচ, চ্যানেল পাল্টানো হয়েছে, এখন

একটা খবরের চ্যানেল চলছে। দেখানো হচ্ছে কোনও ব্রেকিং নিউয।

'...অকুস্থলে আছেন আমাদের প্রতিনিধি সাইমন ক্লড,' হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়া হলো ভলিউম, সংবাদপাঠিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ লাগল রানার কানে। 'চলুন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিই ঘটনার বিবরণ। ...ক্লড, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?'

বার্গারে আরেকবার কামড় দিতে গিয়েও কেন যেন দিতে পারল না রানা।

বদলে গেছে টিভি স্ক্রীনের ছবি। মধ্যবয়স্ক, হাসিখুশি, রোদেপোড়া চেহারার এক লোককে দেখা যাচ্ছে এখন। চেঙ্গিস খানের মত পেল্লায় গোঁফ আছে লোকটার, আর সেই কারণেই রিপোর্টার হিসেবে ওর আবেদন কমে গেছে অনেক। তবে সে-ব্যাপারে ওই লোকের কোনও পরোয়া আছে বলে মনে হয় না। কানে ইয়ারফোন চেপে ধরেছে লোকটা, কী যেন শোনার চেষ্টা করছে মনোযোগ দিয়ে। একইসঙ্গে তাকিয়ে আছে ঠিক যেন দর্শকদের দিকে, কারও ইশারার অপেক্ষা করছে বোধহয়। ইঙ্গিতটা পাওয়ামাত্র বদলে গেল তার হাসিখুশি ভাব, গম্ভীর হয়ে উঠল সে, লম্বা করে দম নিয়ে বলতে শুরু করল, 'যেমনটা আপনি বলছিলেন, সুযানা, ঘটনাটা আসলেই হৃদয়বিদারক এবং পিলে চমকে দেয়ার মত। মিস্টার মার্টিন বেকার সবসময়ই নিজেকে একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী হিসেবে দাবি করে আসছিলেন, যদিও কানাঘুষা আছে, আসলে তিনি একজন নির্মম গ্যাংস্টার। কিন্তু, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে-ট্রেড ইউনিয়ন নেতার রহস্যজনক মৃত্যুর সঙ্গে জড়ানো হয়েছিল তাঁর নাম, আজ বিকেলেই সে-অভিযোগ থেকে তাঁকে সসম্মানে খালাস দিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের মাননীয় আদালত। হঠাৎ করেই কে বা কারা এভাবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল, সে-ব্যাপারে পুলিশও

নিশ্চিত নয়। ...সুযানা।'

সংবাদপাঠিকা সুযানাকে আবার দেখা গেল টিভি স্ক্রীনে, ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে স্টুডিয়োর একদিকের দেয়ালে ঝোলানো টিভি স্ক্রীনের দিকে। ওর নামটা ক্লড উচ্চারণ করামাত্র বলল, 'ঘটনার কী বিবরণ জানতে পারলেন আপনি? আর...এ-ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে?'

আবারও দেখা গেল ক্লডকে, একটু আগের মতই কানে চেপে ধরে আছে ইয়ারফোন। কয়েক মুহূর্তের বিরতির পর বলতে শুরু করল, 'না, পুলিশ এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। আসলে মিস্টার মার্টিন বেকারের হত্যাকাণ্ডটা এত অভাবনীয় আর আকস্মিকভাবে ঘটেছে যে, কোত্থেকে কীভাবে তদন্ত শুরু করবে তা-ও বোধহয় ভেবে বের করতে পারছে না পুলিশ। তবে ঘটনাদৃষ্টে যা মনে হয় তা হলো, আদালত থেকে খালাস পাওয়ার পর যে-কোনও কারণেই হোক লস অ্যাঞ্জেলেস ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন মিস্টার বেকার, তাই তাঁর শোফার, ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আর একান্ত উকিলকে নিয়ে রওনা হয়েছিলেন এয়ারপোর্টের দিকে। হাইওয়েতে চলে আসেন তাঁরা। কিন্তু খুনি অথবা খুনিরা অনেক আগে থেকেই তাঁদেরকে অনুসরণ করছিল সম্ভবত। ...সুযানা, হাইওয়ের যে-নিরালা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে সেটার নাম ইন্টারস্টেট টু হাণ্ড্রেড টেন, এখানে একজায়গায় মিস্টার বেকারের গাড়ির গতি রোধ করা হয়, তারপর খুব কাছ থেকে ভারী হ্যাণ্ডগানের মাধ্যমে গুলি করে খুন করা হয় গাড়ির ভেতরের সবাইকে। হত্যাকাণ্ডের ধরন সম্পর্কে এই হচ্ছে আমার কাছে সর্বশেষ আপডেট, এবং এ-ব্যাপারে আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন এলএপিডি'র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অফিসার। ...সুযানা।'

সুযানাকে দেখা গেল আবার। 'ক্লড, কোনও প্রত্যক্ষদর্শী

অথবা সে-রকম কারও কথা কি বলছে পুলিশ?'

'না, ওরা এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ, কিন্তু আপনি জানেন আমাদের চ্যানেল "টোয়েন্টি ফোর সেভেন" অন্য সবার চেয়ে সবসময় এগিয়ে, আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ঘটনাটা যখন ঘটে তখন একজন লোক নিজের গাড়ি চালিয়ে ইন্টারস্টেট টু হাণ্ড্রেড টেন পার হচ্ছিলেন। মিস্টার বেকারের গাড়ির কাছাকাছি যখন আসেন তিনি, তখন নাকি এক ট্রাফিক অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন গাড়ির কাছে। এই নাম না জানা ড্রাইভারকে ঠিক প্রত্যক্ষদর্শী বলা যাবে না, কারণ খুনগুলো হতে দেখেননি তিনি, এমনকী গুলির আওয়াজও পাননি। ওই ট্রাফিক পুলিশ অফিসার ঠিক কী কারণে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস্টার বেকারের গাড়ির কাছে, তা-ও তিনি বলতে পারেননি। তবে আমাদের অনুমান, কাছাকাছিই টহলে ছিলেন অফিসার, এবং নিরালা জায়গায় মিস্টার বেকারের গাড়িটা থেমে থাকতে দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যান। কাছাকাছি গিয়ে বুঝতে পারেন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এবং তখন তিনিই যোগাযোগ করেন এলএপিডি'র হেডঅফিসে। ...সুযানা।'

'ওই অফিসারের নাম জানতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, পেরেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি চাচ্ছেন না, নামটা জানাজানি হোক।'

'গত দু'সপ্তাহ ধরে যে-রহস্যজনক খুনগুলো হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস শহর ও আশপাশের এলাকায়, সবগুলোর ধরন তো দেখা যাচ্ছে একই?'

'হ্যাঁ, সুযানা, ধরতে গেলে প্রায় একইভাবে করা হয়েছে খুনগুলো। এবং প্রতিবারই ভারী হ্যাণ্ডগানের ব্যবহার দেখতে পেয়েছি আমরা।'

'আপাতত শেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে, ক্লড, পরে

আবারও আপনার কাছে ফিরে যাব। ইন্টারস্টেট টু হাণ্ড্রেড টেনে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিচয় কি জানতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিচয় মোটামুটি পাওয়া গেছে। একজন মিস্টার মার্টিন বেকার স্বয়ং। দ্বিতীয়জন, যেমনটা আগেও বলেছি, তাঁর একান্ত উকিল মিস্টার নিকোলাস নিউম্যান। আমরা জানতে পেরেছি, মিস্টার নিউম্যানের আইনব্যবসা ভালো যাচ্ছিল না, আর ওদিকে মিস্টার বেকারকেও ঘন ঘন পোহাতে হচ্ছিল আদালতের ঝামেলা, তাই মিস্টার নিউম্যানকে নিজস্ব আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেন মিস্টার বেকার। ...খুন হওয়া তৃতীয় ব্যক্তি মিস্টার বেকারের শোফার, লোকটার পুরো নাম জানতে পারিনি, তবে ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা পুলিশ অফিসারদের দু'-চারজনকে ববি নামটা উচ্চারণ করতে শুনেছি। চতুর্থ লোকটা, আই মিন মিস্টার বেকারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরও পুরো নাম জানা যায়নি, তবে লোকটার ডাক নাম জনি, এবং এ-ও জানা গেছে, সে জন্মসূত্রে আমেরিকান নয়, বরং দক্ষিণ-এশীয় কোনও দেশের। ...সুযানা।'

আর কিছু শুনল না, কিংবা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, উঠে দাঁড়িয়েছে। হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা শায়লাকে বলল, 'এই জনি নিশ্চয়ই আমাদের সেই এজেন্ট জনি, যাকে বেকারের ওপর চোখ রাখার জন্য পাঠিয়েছিলে?'

কিছু না-বলে শুধু উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল শায়লা।

আর কোনও কথা না-বলে দ্রুত হাতে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল রানা, খাবারের দাম হিসেবে কয়েকটা ডলার বের করে না-খাওয়া কফির কাপ দিয়ে চাপা দিল টেবিলের ওপর। তারপর ওয়ালেটটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে হাঁটা ধরল সদর-দরজার দিকে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শায়লা, পিছু নিল রানার।

ইন্টারস্টেট টু হাণ্ড্রেড টেন।

দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভুল করে হাজির হয়ে গেছেন সেখানে।

যে-জায়গা এমনকী দিনের বেলাতেও মোটামুটি নির্জন থাকে, এখন সন্ধের পরও সেখানে গিজগিজ করছে পুলিশ। কী আনেনি তারা? হাইওয়ে পুলিশের মোটরসাইকেল আছে। আছে আরেকটু উচ্চপদস্থ অফিসারদের ডিউটি কার। তিন-চারটে পুলিশ ট্রাকও দেখা যাচ্ছে। এমনকী ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশনের একটা মোবাইল ল্যাবরেটরি, ওরফে বিশেষভাবে নির্মিত কভার্ড ভ্যানও হাজির হয়ে গেছে। বস্তুর পরমাণুতে যেভাবে নিউক্লিয়াসকে মাঝখানে রেখে ইলেকট্রন আবর্তিত হয়, বেকারের গাড়ির চারদিকে সেইভাবে অবস্থান নিয়েছে ভেহিকেলগুলো। বলা বাহুল্য, রোগী মারা যাওয়ার পর অনেক বেশি ডাক্তার আসায় ইন্টারস্টেট টু হাণ্ড্রেড টেন আপাতত বন্ধ। এখন এখানে সার্চলাইটের তীব্রতার কাছে রাতের অন্ধকার হার মেনেছে আপাতত।

হাইওয়ের মাথায় বুলহর্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ট্রাফিক সার্জেন্ট, রানাদের সেডানটা দেখামাত্র প্রাণ পেল ওর হাতেধরা যন্ত্রটা, 'পুলিস কেস। রোড ব্লক্ড্, টেম্পরারিলি। প্লিয ইউয অ্যানাদার ওয়ে।'

ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে শায়লা, ইঙ্গিতে ওকে থামতে বলল রানা। পকেট থেকে রানা এজেন্সির আইডি কার্ড বের করে ঝোলাল গলায়, ইচ্ছে করে উল্টিয়ে নিল নামধাম লেখা অংশটা, একই কাজ করতে বলল শায়লাকে। তারপর বলল, 'সুবিধাজনক কোনও জায়গায় পার্ক করো। আমি নামি, আমার পেছন পেছন এসো।'

ব্রেক করল শায়লা। প্যাসেঞ্জার সিটের পাশের দরজা খুলে বের হলো রানা, এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাফিক সার্জেন্টের দিকে। নামল শায়লাও।

রানা আশা করছে বেশিরভাগ সময় যা হয় এবারও তা-ই হবে--কার্ডটার দিকে ভালোমত না তাকিয়েই ওকে পথ ছেড়ে দেবে সার্জেন্ট। এবং সে-রকমই হলো। ওর চালচলন দেখে সম্ভবত ওকে এলএপিডি'র হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের হোমরাচোমরা কেউ বলে মনে করল সার্জেন্ট, পথ ছেড়ে দিল। বেকারের গাড়ির আরও কাছে এগিয়ে গেল রানা, টের পেল ভীরু পায়ে ওর পেছন পেছন আসছে শায়লা।

ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশনের সাদা কোট আর সাদা গামবুট পরা টেকনিশিয়ানদেরকেই চোখে পড়ে সবার আগে। দেখে মনে হচ্ছে, একটা মৌচাক ঘিরে গিজগিজ করছে যেন একদল সাদা মৌমাছি। বেকারের গাড়িটা ছেঁকে ধরেছে ওরা, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছে কোনও ক্লু পাওয়া যায় কি না। লিমাযিনের চারটে দরজাই, এমনকী ট্রাঙ্কটাও, খোলা।

সবার চেয়ে কাছে যে-ল্যাব টেকনিশিয়ান আছে, গলায় ঝোলানো আইডি কার্ডে সে-লোকের নাম দেখা যাচ্ছে হেনরি লয়েড। যেন যুগ যুগের পরিচয়, এমন ভঙ্গিতে লোকটাকে বলল রানা, 'কী খবর, লয়েড, কী বুঝলে ক্রাইম সিন দেখে?'

গ্লাভস পরা হাত দিয়ে লিমাযিনের পেছনদিকের একটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল লয়েড, উঁকি দিয়ে একমনে দেখছিল রক্তাক্ত ব্যাকসিট। রানার মুখে নিজের নাম শুনে চমকে উঠল কিছুটা। সোজা হয়ে বলল, 'আপনাকে তো...ঠিক চিনতে পারলাম না, স্যর?' রানার আইডি কার্ডে চোখ বোলাল লয়েড।

'না-চেনারই কথা। হোমিসাইডে এসেছ ক'বছর হলো?'

'এখনও এক বছর হয়নি, স্যর। কিন্তু...'

'আর আমি কত বছর ধরে কাজ করছি, জানো? ...দেখি, একটু সরো। ভেতরটা একনজর দেখতে দাও আমাকে।' প্রায় হতভম্ব লয়েডকে আলতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা, গাড়ির ভিতরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পড়ে থাকা লাশগুলো দেখছে।

রানার আচার-আচরণ আর কথাবার্তায় তাজ্জব হয়ে গেছে লয়েড, বার বার নজর বোলাচ্ছে রানার আইডি কার্ডের ওপর। কিন্তু রানা ইচ্ছা করেই দাঁড়িয়েছে উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে, তাই ঠিকমত পড়তে পারছে না লয়েড। স্মৃতি হাতড়াচ্ছে সে, কিন্তু নিকট অতীতে রানাকে কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।

ওর এই বিভ্রান্তির সুযোগে ভালোমত দেখে নিল রানা চারপাশ।

'মিস্টার মাসুদ রানা!' নামটা ধরে যে ডেকেছে, তার কণ্ঠে একইসঙ্গে বিস্ময় ও ক্রোধ।

কণ্ঠটা রানার পরিচিত, তাই হুট করে তাকাল না। লম্বা করে দম নিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করল নিজেকে। তারপর, পনেরো হাত তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রিচার্ড হেইডনের চোখে চোখে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করল।

হেইডনকে দেখে মনে হচ্ছে পাথর কুঁদে বানানো কোনও মূর্তি যেন, প্রাণের ছোঁয়া দিতে গিয়ে আনাড়িপনার কারণে যেটাকে আরও বেশি প্রাণহীন বানিয়ে ফেলেছে ভাস্কর। অতি উজ্জ্বল আলোর কারণে বয়স বেশি মনে হচ্ছে লোকটার। কোনও এক কারণে--কারণটা কী তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না--স্নায়বিক চাপে ভুগছে সে, তাই তাকে শত্রুভাবাপন্ন মনে হচ্ছে, প্রকৃতি যেন চিপে চিপে বের করে নিয়েছে ওর ভেতরের সব রসকষ।

'মিস্টার রানা,' বিস্ময় বিদায় নিয়েছে হেইডনের কণ্ঠ থেকে, ক্রোধটুকু আছে, 'জানতে পারি কি, আপনি কী করছেন এখানে?'

‘অবশ্যই পারেন,’ তরল গলায় বলল রানা।

‘তা হলে বলছেন না কেন?’

‘আপনি এখনও সরাসরি জানতে চাননি, তাই।’

চোয়াল শক্ত করল হেইডন। ‘এখন জানতে চাচ্ছি। কী করছেন আপনি এখানে?’

‘জনিকে দেখতে এসেছি।’

‘জনি! য়ু মিন, মিস্টার বেকারের পার্সোনাল বডিগার্ড?’

‘আমার কথা বুঝতে আপনার অসুবিধা হয়নি জেনে সুখী হলাম।’

‘সারা দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে হঠাৎ জনিকে দেখার এত শখ হলো কেন, জানতে পারি?’

‘জী, পারেন।’

‘তা হলে বলছেন না কেন?’

‘সরাসরি জিজ্ঞেস করেননি, তাই।’

‘মিস্টার রানা, আপনি কি জানেন, কোথায় এবং কার সামনে দাঁড়িয়ে মস্করা করছেন?’

‘জানি, সম্ভবত। যা-ই হোক, জেনে রাখুনঃ এটা মস্করার সময় নয়। জনি ছিল রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি’র একজন এজেন্ট, যে-সংস্থাকে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আশপাশের এলাকায় ব্যবসা করতে বাধা দিচ্ছে আপনার লোকেরা। কখন কেন কীভাবে কার হাতে মারা পড়ল সে, এজেন্সির চিফ হিসেবে সেসব প্রশ্নের উত্তর জানার অথবা জানতে চাওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার, নাকি? এ-রকম আরও কিছু প্রশ্ন মনের ভেতরে খচখচ করছে বলে ক্রাইম সিনে হাজির না-হয়ে পারিনি। তা ছাড়া কাছাকাছিই ছিলাম...’

‘কাছাকাছি ছিলেন!’ গলা চড়ছে হেইডনের। ‘জবরদস্তি করে ক্রাইম সিনে হাজির হওয়ার শাস্তি কী, জানেন নিশ্চয়ই?’

'জানি। কিন্তু আমি জবরদস্তি করেছি--কে বলল আপনাকে?'

'করেননি বলতে চান?'

'না, করিনি। ইচ্ছা হলে আপনার যে-কোনও অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। স্রেফ ঢুকে পড়েছি ভেতরে, আমাকে আটকানোর প্রয়োজনই বোধ করেনি কেউ হয়তো।'

'খুব ভালো করেছেন!' ভেংচি কাটল হেইডন। 'এবার বের হন এখান থেকে! দূর হন আমার চোখের সামনে থেকে!'

একচুল নড়ল না রানা। 'কী মনে হয় আপনার, লেফটেন্যান্ট, কে বা কারা করেছে কাজটা?'

'দেখুন, মিস্টার রানা, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি রানা এজেন্সির চিফ হতে পারেন, কিন্তু এলএপিডি'র একজন ঝাড়ুদারও না। এবং আপনাকে কেউ ভাড়াও করেনি। কাজেই ফালতু গোয়েন্দাগিরি বাদ দিয়ে বিদায় হোন এখনই।'

গলার স্বর আরও চড়েছে হেইডনের, পুলিশ অফিসারদের অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথাও বলছে কেউ কেউ।

হেইডনকে পাত্তা না দিয়ে লয়েডের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'তোমার হাতে ওটা কী?'

লিমাযিনের ভেতর থেকে প্লাস্টিকের কয়েকটা ট্রে বের করে আনছিল লয়েড, রানার প্রশ্নটা শুনে থমকে গেল। হাবিজাবি কিছু জিনিস আছে ট্রেগুলোতে, পুলিশের ভাষায় পটেনশিয়াল এভিডেন্স। একটা ট্রে-তে দেখা যাচ্ছে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স, রানা অনুমান করল ববির।

'মিস্টার রানা!' চেঁচাল হেইডন, 'শেষবারের মত বলছি, চলে যান এখান থেকে। তা না-হলে কিন্তু...' থেমে গেল কথা শেষ না করে, ঘন ঘন দম নিচ্ছে, লাল হয়ে গেছে চেহারা। 'আপনার এই বাড়াবাড়ির উপযুক্ত জবাব পাবেন আমার কাছ থেকে, বলে

রাখছি। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে তল্পিতল্পা গোটাতে যদি বাধ্য না-করেছি আপনাদেরকে তা হলে...'

উল্টো ঘুরল রানা, নিচু গলায় শায়লাকে বলল, 'চলো।'

দু'জনে ধীর পায়ে ফিরে এল সেডানের কাছে।

পুলিশ অফিসারদের অনেকেই বার বার তাকাচ্ছে ওদের দিকে, কারও কারও মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল রানা আর শায়লা। মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'ওরা এ-রকম করছে কেন, মাসুদ ভাই?'

'জানি না,' ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রাইম সিনের দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করছে আমার মধ্যে।'

'কী?'

'আজ হোক বা কাল, এই কেসে রানা এজেন্সির সাহায্য চাইবে এলএপিডি। চাইতে বাধ্য হবে।'

চট করে রানার দিকে তাকাল শায়লা, কিছু বলতে চেয়েও বলল না রানার গম্ভীর চেহারাটা দেখে। দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল ও, রানা বসল পাশে।

ইগনিশন কী ধরে মোচড় দিল শায়লা, গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে চালিয়ে উঠল হাইওয়েতে, আস্তে আস্তে গতি বাড়াচ্ছে, একেবারে ডান লেনের দিকে সরছে। 'এবার?' জিজ্ঞেস করল মৃদু গলায়।

চট করে জবাব দিল না রানা, কী যেন ভাবছে। ডোমেস্টিক ফ্লাইটের একটা বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন নামছে এয়ারপোর্টের রানওয়েতে, বেশি হলে ছ'-সাত শ' ফুট উপরে আছে ওদের থেকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যাণ্ড করবে।

উপরে তাকিয়ে প্লেনটা দেখে নিয়ে রানা বলল, 'আমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। কী করব সে-বিষয়ে কথা হবে কাল।'

চার

শাওয়ার বন্ধ করে বাথরুম থেকে বের হলো রানা, গোসল শেষ। লম্বা আয়নাওয়ালা একটা কাঠের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, আয়নায় দেখল নিজেকে,তারপর পাল্লা খুলে একটা টাওয়েল বের করে মুছে নিল ভেজা চুল। টাওয়েলটা কাঁধে ফেলে বের করল একটা পাজামা, পরল। গা না মুছেই গিয়ে দাঁড়াল ব্যালকনিতে।

শীত বিদায় নিয়েছে, শুরু হয়ে গেছে বসন্ত, কিন্তু পুরোদমে শুরু হয়নি, এখনও শীত শীত ভাব আছে প্রকৃতিতে। রানার ভেজা গায়ে পানির ফোঁটাগুলো বরফের কুচির অনুভূতি জাগাচ্ছে। চুল্লি থেকে বের হওয়া একটানা ধোঁয়ার মত পুরু লালচে-কাল অনুভূমিক মেঘে ঢেকে আছে পুবের আকাশ, সকালের রোদ তাই মোটেও তেজি না। চুল পনিটেইল করে, চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে, স্যাণ্ডো গেঞ্জি-শর্টস-কেডস পরে নীচের ফুটপাত ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল স্বাস্থ্যসচেতন এক তরুণী। অনেক দূরে, মারিনা দেল রে'র লেকে রোজকার চর্চা সেরে নিচ্ছে সাত-আটজন রোয়ার। বাঁ দিকে, শহরতলীর সীমানা ছাড়িয়ে তাকালে একটা পাহাড়ের ওপর হলিউড শব্দটা দেখা যায়; তবে প্রতিটা অক্ষর একেকটা মটরদানার চেয়ে বেশি বড় বলে মনে হচ্ছে না। কয়েক ব্লক পরই আকাশ ঢেকে দেয়ার সাধ নিয়ে একসারিতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা স্কাইস্ক্র্যাপার, ওগুলোর পাদদেশে এপাশে পাঁচ

লেন আর ওপাশে পাঁচ লেনের যে-বড় রাস্তা আছে সেখানে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, পুঁচকে গাড়ির পাশাপাশি চলছে স্কুলবাস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ ভেহিকেল, এমনকী দানবীয় ট্রাকও। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই, রাশ আওয়ার যখন শুরু হবে, লেগে যাবে যানজট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। নগরজীবনে নাগরিক সুবিধা আছে অনেক, পাশাপাশি নগরযন্ত্রণার সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। ঘরে ঢুকল ও। নীল-কালো-লালের স্ট্রাইপ করা ভি-গলার একটা টি-শার্ট নিল, মনে পড়ে গেল অতীতের কথা--গত বছর জন্মদিনে ওটা ওকে উপহার দিয়েছিল সোহানা। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও চেপে গেল--সময় কত দ্রুত চলে যায়! কাঁধ থেকে টাওয়েলটা সরিয়ে টি-শার্টটা পরে নিল--গা শুকিয়ে গেছে এতক্ষণে। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে আয়নায় আরেকবার দেখল নিজেকে, তারপর ভেজা টাওয়েলটা ব্যালকনিতে মেলে দিয়ে সোজা চলে এল ডাইনিংরুমে। নাস্তা করবে।

কিন্তু ডিম আর মাখন বের করার জন্য ফ্রিজটা মাত্র খুলেছে, এমন সময় বেজে উঠল কলিংবেল। আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্যাণ্ডফোর্ড। সঙ্গে অচেনা আরেক লোক।

চোয়াল শক্ত হলো রানার, কিছু বলল না। লিভিংরুমে বসাল দুই অতিথিকে। নিজেও বসল একটা রকিংচেয়ারে কিন্তু হেলান দিল না।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন ক্যাপ্টেন, 'ইনি মিস্টার টমাস উইলিনস্কি, এলএপিডি'র পুলিশ কমিশনারদের প্রেসিডেন্ট।'

হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন মিস্টার উইলিনস্কি,

রানা একবার ভাবল হাত মেলাবে না, কিন্তু কাজটা ভদ্রতার বরখেলাপ হয় বলে আলতো করে ঝাঁকি দিল হাতটা ধরে। চুপ করে আছে এখনও।

মিস্টার উইলিনস্কি বললেন, 'মার্টিন বেকারের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আমরা।'

'কিছু মনে করবেন না,' ভদ্রতার মুখোশ আর পরে না-থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'ওসব শুনতে চাইছি না আমি।'

আহত দৃষ্টিতে প্রথমে রানার দিকে, তারপর উইলিয়াম স্যাণ্ডফোর্ডের দিকে তাকালেন মিস্টার উইলিনস্কি।

'মিস্টার রানা,' মুখ খুললেন ক্যাপ্টেন, 'মান-অভিমানের সময় এখন নয়। আদালত থেকে নির্দোষ বলে স্বীকৃতি পাওয়া মার্টিন বেকার খুন হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে এক ট্রাফিক সার্জেন্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে বেকারের গাড়ির পেছনে, অথচ ওই সময়ে হাইওয়েতে যেসব সার্জেন্ট ডিউটি করছিল তারা বেমালুম অস্বীকার করছে কথাটা। অনেক ওপর লেভেলে হাত ছিল বেকারের, তাই চাপ আসছে এলএপিডি'র ওপর। মারা পড়েছে আপনার এজেন্সির এক এজেন্টও, কাজেই আপনারও যে গরজ আছে তা অস্বীকার করতে পারবেন না।'

'গরজ দেখাতে গিয়ে আমাদের কী অবস্থা হয়েছে সেটা বলছেন না কেন? আপনার অফিস থেকে আপনারই সামনে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে আর আমার এজেন্সির এলএ ইনচার্জকে। খুনের খবর টিভিতে দেখামাত্র ছুটে গেছি অকুস্থলে, লেফটেন্যান্ট হেইডন যে-ব্যবহারটা করল...। এত বড় অপমানের পর কীভাবে আশা করতে পারেন, আপনাদের কথা আমি শুনতে চাইব?'

'মিস্টার রানা,' নরম সুর ক্যাপ্টেনের গলায়, 'হেইডনের

ব্যবহারের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আর শুধু আমিই না, মিস্টার উইলিনস্কিও লজ্জিত। স্বীকার করছি, অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের।'

একটু যেন নরম হলো রানা, হেলান দিল রকিংচেয়ারে। 'ঠিক আছে। বলুন কী বলবেন।'

খানিকটা সামনে ঝুঁকলেন ক্যাপ্টেন। 'এক সিরিয়াল কিলারের ব্যাপারে রানা এজেন্সি, সরাসরি যদি বলি *আপনার* সাহায্য চাইতে এসেছি আমরা।'

'সিরিয়াল কিলার?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'কিন্তু আমি কেন? পুরো ডিটেকটিভ ফোর্স আছে আপনার অধীনে। তাদের কারও কারও নাক আবার এতই উঁচু যে...'

'মিস্টার রানা, প্লিয,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুললেন ক্যাপ্টেন।

'অস্বীকার করব না এলএপিডি'র ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর পুরো ফোর্স আছে,' মুখ খুললেন মিস্টার উইলিনস্কি, 'কিন্তু একজন মাসুদ রানার সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক।'

কোনও মন্তব্য করল না রানা।

'গত এক সপ্তাহের মধ্যে চারবার খুন করেছে লোকটা,' বলে চললেন মিস্টার উইলিনস্কি, 'এবং চারটাই লস অ্যাঞ্জেলেস অথবা আশপাশে কোথাও। মারা পড়েছে দশজন মানুষ। বেছে বেছে খুন করতে শুরু করেছে এমন সব লোককে, আইন যাদের ব্যাপারে, এককথায় যদি বলি, অসহায়। পয়সার জোরে হোক অথবা পেশিশক্তির বলে, ওই লোকগুলো বার বার ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল আইনের হাতকে, অথচ ওদের বিরুদ্ধে জোর অভিযোগ আছে, ওরা দোষী। মার্টিন বেকারের কথাই ধরুন না। কথায় বলে, ওপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট। বেকারেরও ওই অবস্থা। প্রচার করত সে একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, অথচ আসলে

একজন গ্যাংস্টার। ট্রেড ইউনিয়নের এক নেতাকে দুনিয়াছাড়া করার দায়ে মামলা হয়েছিল ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা টিকলই না আদালতে।'

'বেকারের ঠিক পনেরো ঘণ্টা আগে মারা পড়েছে আরও তিনজন,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'প্রথম টার্গেটের নাম হার্ভি মার্টিনসন--আফ্রিকান-আমেরিকান এক ড্রাগডিলার। নিজের গার্লফ্রেণ্ড বলে দাবি করত এ-রকম তিন কৃষ্ণাঙ্গ যুবতীকে ধর্ষণ ও হত্যা করার অভিযোগ ছিল লোকটার বিরুদ্ধে। কিন্তু ওর নামে মামলা করেনি কেউ, করার সাহসই পায়নি আসলে। ভোররাতে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল সে বার থেকে, নিজের গ্যারেজের কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্র খুব কাছ থেকে গুলি চালানো হয় ওর ওপর। দুই সঙ্গীকে নিয়ে লুটিয়ে পড়ে সে।'

কিছুক্ষণের নীরবতার পর মিস্টার উইলিনস্কি বললেন, 'এর দু'দিন আগে মাইকেল ডগলাস নামের এক অসৎ পুলিশ অফিসারকে খুন করা হয়। ডগলাস ছিল ভীষণ রগচটা, একইসঙ্গে ঘুষখোর। শুধু তা-ই না, বছর দেড়েক আগে এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে সামান্য কারণে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। তখন আমাদের মেয়রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে বড় ধরনের দাঙ্গার কবল থেকে বেঁচে যাই আমরা, যদিও ইণ্টারন্যাশনাল মিডিয়া টানা প্রায় এক সপ্তাহ কভার করেছিল নিউযটা। অথচ দেখুন, ডগলাসকে কোনও শাস্তিই দেয়া যায়নি, কারণ পুলিশের ওপর লেভেলে মামা-চাচা ছিল ওর। যা-হোক, এবারও হত্যাকাণ্ডের ধরন এক: খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে ভারী হ্যাণ্ডগান দিয়ে। শুধু ডগলাসের সঙ্গে থাকার কারণে মাটির ছ'হাত নীচে যেতে হয়েছে সম্ভাবনাময় এক তরুণ অফিসারকেও।'

রানা বলল, 'সবার প্রথমে খুন হয়েছে কে?'

'এক বেশ্যার দালাল,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'লোকটা পর্নোগ্রাফি ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত ছিল।'

'কিন্তু...' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার, 'দালালি করা তো কোনও অপরাধ নয়? তা ছাড়া আঠারো বছরের নীচে কাউকে পর্নোগ্রাফির সাবজেক্ট না করলে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড। 'স্যাম রুস্টার, মানে আমাদের সিরিয়াল কিলারের প্রথম শিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, খদ্দেরের পয়সা নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারায় মনোমালিন্য হওয়াতে ভাড়াটে খুনি দিয়ে শেষ করে দিয়েছে কয়েকজন উঠতি মডেলকে। শুধু তা-ই নয়, নেশাজাতীয় ওষুধ খাইয়ে জোর করে পর্নোগ্রাফিতে বাধ্য করেছে বেশ কয়েকজন কিশোরী মেয়েকে, যাদের বয়স আঠারোর অনেক কম ছিল। এভাবে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে লোকটা। ওকে ওর তথাকথিত অফিসের বাইরে একাই পেয়েছিল আমাদের সিরিয়াল কিলার, এবং এবারও একই অবস্থা: ভারী হ্যাণ্ডগানের উপর্যুপরি দুটো গুলিবর্ষণের মাধ্যমে কফিন নিশ্চিত করেছে ওর জন্য।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারপর?' মিস্টার উইলিনস্কির সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ক্যাপ্টেন। 'তারপর গতকাল ঘটল মার্টিন বেকারের হত্যাকাণ্ড। মিস্টার রানা, আধ পাগল ওই লোকের এগারো বা বারো বা তেরো নম্বর শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছে কে বা কারা সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই আমাদের ডিপার্টমেন্টের কারোরই। অথচ ওপর মহল থেকে বার বার তাগাদা দেয়া হচ্ছে, দ্রুত যেন সমাধান করা হয় সমস্যাটার।'

রানা বলল, 'প্রত্যক্ষদর্শীর কথা কী যেন বললেন?'

'লোকটাকে প্রত্যক্ষদর্শী বলাটা ঠিক হয়নি আসলে,' মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'মার্টিন বেকারকে খুন হতে দেখেনি কেউই।

তবে যে-সময়ে খুন হয়েছে সে, সে-সময়ে ওই জায়গা দিয়ে ড্রাইভ করে যাচ্ছিল এক লোক। সে পরে পুলিশের কাছে বলেছে, বেকারের থেমে-থাকা লিমাযিনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে এক ট্রাফিক পুলিশ অফিসারকে।'

কিছু বলল না রানা।

'আমরা কী বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। খুন হয়েছে আপনার এজেন্সির এক এজেন্ট, এমনিতেও হয়তো তদন্ত করতেন আপনি। এদিকে আমরাও চাই তাড়াতাড়ি ধরা পড়ুক খুনি। ও-রকম দুর্ধর্ষ কোনও খুনিকে পাকড়াও করতে হলে মাসুদ রানার কোনও বিকল্প হয় না।'

'ডিপার্টমেন্টের কিছু কিছু অফিসারের ভাব দেখে মনে হচ্ছে,' মিস্টার উইলিনস্কির চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ, 'তথাকথিত সিরিয়াল কিলারের কাজে খুশিই ওরা। কারণ, আগেও বলা হয়েছে, বেছে বেছে শুধু খারাপ লোকগুলোকেই খুন করছে সে। এসব অফিসার ভাবছে, যা হচ্ছে হোক না, খারাপ কিছু তো হচ্ছে না আসলে, কাজেই আমাদের মাথাব্যথা কীসের? কিন্তু, আপনি জানেন, একজন খুনিকেও যদি বেআইনিভাবে হত্যা করা হয়, তা হলে সেটা খুনের পর্যায়েই পড়ে, এবং সে-অপরাধের সুরাহা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এসব খুনের তদন্ত রানা এজেন্সির চিফ হিসেবে করতে পারি না আমি। আর আপনারাও আপনাদের ডিপার্টমেন্টকে পাশ কাটিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারেন না আমাকে।'

'পারি,' একটুখানি হাসলেন পুলিশ কমিশনারদের প্রেসিডেন্ট।

'কীভাবে?' সত্যিই আশ্চর্য হয়েছে রানা।

'এলএপিডি'র ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিতে চাই আমরা আপনাকে। মূলত সেই প্রস্তাব নিয়েই এসেছি আপনার কাছে।'

'এলএপিডি'র ভেতরে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার উইলিনস্কি। 'বুঝিয়ে বলছি। আজই অন্য কমিশনারদের ডেকে মিটিং-এ বসব আপনার ব্যাপারে। বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে অনারারি লেফটেন্যান্ট পদে নেয়া হবে আপনাকে। বেশি ওপরের পদ হলে সবার সঙ্গে মিশতে পারবেন না, আবার বেশি নিচু হলে পাত্তা দেবে না কেউ। আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছামত একজন সহকারী নিতে পারেন, তাকে সার্জেন্টের পদ দেয়া যেতে পারে। যেহেতু হোমিসাইডে একজন লেফটেন্যান্ট আছে, সেহেতু ট্রাফিকের লেফটেন্যান্ট হিসেবে ঢুকতে হবে আপনাকে প্রথমে। পরে সময়-সুযোগমত হোমিসাইডে শিফট করা হবে।'

'টেম্পোরারি ব্যাজ দেয়া হবে আপনাকে,' যোগ করলেন ক্যাপ্টেন, 'অন্য দশজন ডিটেকটিভ যেসব সুযোগসুবিধা পায় সেগুলোও পাবেন। মেয়রকে সামলানো কোনও ব্যাপার না মিস্টার উইলিনস্কির জন্যে, এবং আশা করছি তাঁকে দিয়ে অন্য বড় কর্তাদেরও ম্যানেজ করিয়ে নিতে পারব। যে-ক'দিন খাটবেন এ-কেসে, পারিশ্রমিক নিতে চাইবেন না জানি, তারপরও বলব, আপনার যদি কিছু চাওয়ার থাকে তা হলে তা পূরণ করতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব। আর হ্যাঁ, আপনার ডিরেক্ট রিপোর্টিং ইনচার্জ থাকব আমি, কাজেই অন্য কারও কাছে কোনও জবাবদিহিতার ধার না ধারলেও চলবে আপনার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'আমি রাজি। ...একজন সহকারীর কথা বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ,' বিষণ্নতা মুছে গেছে মিস্টার উইলিনস্কির চেহারা থেকে, খুশি ঝিলিক দিচ্ছে তাঁর চোখে, 'আছে নাকি কেউ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শায়লা মারিয়া, রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার ইনচার্জ। সহকারী হিসেবে ওকেই চাই আমি।'

‘কিছু মনে না-করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?’ কৌতুক খেলা করছে ক্যাপ্টেনের চোখে। ‘এত লোক থাকতে একটা মেয়েমানুষকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছেন কেন?’

‘প্রথম কথা, কাজে যে দক্ষ সে ছেলেমানুষ নাকি মেয়েমানুষ সেটা দেখি না আমি,’ রানার পক্ষ থেকে আলোচনা আপাতত শেষ হয়েছে বোঝানোর জন্য উঠে দাঁড়াল ও। ‘আর দুই, শায়লাকে বিশ্বাস করি--সে যা-ই করুক, আমার পিঠে ছুরি মারবে না কখনও।’

পাঁচ

পুলিশ বিল্ডিং-এর পেছনে, পার্কিংলটে নিজের গাড়ি পার্ক করল রানা। নামল গাড়ি থেকে। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে হাঁটা ধরল।

ওর পরনে ছাই রঙের পাতলা স্যুট। সঙ্গে গাঢ় নীল শার্ট, আর ম্যাচ করা টাই। পায়ে খাঁটি চামড়ার চকচকে কালো শু। চোখে মুন গ্লাস। মাপা চাহনিতে এদিক-ওদিক দেখছে।

অনারারি লেফটেন্যান্ট হিসেবে এলএপিডি-তে যোগ দেয়ার পর তিনদিন কেটে গেছে।

প্রথম দিন করতে হয়েছে অফিস ওয়ার্ক, সেদিন প্রায় সারাটা সময় শুনতে হয়েছে রিচার্ড হেইডনের খোঁটা। মুখ বুজে কাজ করে গেছে রানা, কোনও জবাব দেয়নি। নিজে কাজ বুঝে নিয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছে “সার্জেন্ট” শায়লাকেও।

দ্বিতীয় দিন চেষ্টা করেছে আদর্শ ট্রাফিক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টটা ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট থেকে আলাদা বলে এ-দিন হেইডনের সঙ্গে মোলাকাত হয়নি ওর, তাই অন্যরকম এক ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে পেরেছে।

আর তৃতীয় দিন যতটা না কাজ করেছে, তার চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে অন্য ট্রাফিক অফিসারদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। কারণ মার্টিন বেকারের খুনিকে দেখা গেছে ট্রাফিক পুলিশের ইউনিফর্মে।

এবং এ-দিন রানা ফোনে জানিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্যাণ্ডফোর্ডকে, তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ও।

আজ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আসার উদ্দেশ্য হলো, অ্যানুয়াল টার্গেট শুটিং কমপিটিশনের জন্য হাতটা একটু ঝালাই করে নেয়া। প্রতিযোগিতাটা প্রতি বছরই স্পন্সর করে পুলিশ বেনেভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। পুলিশের দক্ষ অফিসাররা অংশ নেয় ওই প্রতিযোগিতায়, ট্রফি জিতে নেয় তাদের কেউ না কেউ, গ্রুপ ছবি তোলে, পরে সেসব ছবি পোস্ট করে ফেসবুক কিংবা টুইটারে। সবার সঙ্গে পরিচিত হবার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না রানা।

গাড়ির ট্রাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল রানা, সেটা খুলে একটা ব্যাগ বের করল। ওর পছন্দের কিছু ভারী হ্যাণ্ডগান আছে ব্যাগটাতে। পুলিশ বিল্ডিং-এর পেছন দিকে, রানার ঠিক মুখোমুখি, গজ পঞ্চাশেক তফাতে একজোড়া এস্কেলেটর দেখা যাচ্ছে; ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে ধীর পায়ে সেদিকে এগোচ্ছে ও। চলন্ত সিঁড়ি দুটোর একটা নেমে যাচ্ছে নীচে, শুটিং রেঞ্জের দিকে, আরেকটা উঠে আসছে সেখান থেকে।

রাতটা চমৎকার। আকাশ মেঘমুক্ত, মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে

জড়াজড়ি করে আছে সামান্য ঠাণ্ডা। সে-ঠাণ্ডা কিছুটা হলেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে রানাকে। থামল ও, ব্যাগটা নামিয়ে রাখল মাটিতে, আটকে নিল কোটের বোতামগুলো। স্বভাবসুলভ সতর্ক চোখে আরও একবার তাকাল এদিক-ওদিক। সামনে, একটু ডানে দেখা যাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশের সেই চিরচেনা নীল-সাদা কয়েকটা মোটরসাইকেল, নিতান্ত অবহেলায় জট পাকিয়ে পার্ক করে রাখা হয়েছে যেন। ওগুলোর ঠিক উপরেই স্ট্রিটল্যাম্প, উজ্জ্বল হলদেটে আলো বিলিয়ে যাচ্ছে একটানা। পুরু অ্যালুমিনিয়ামের বিশ ফুটি খাড়া দণ্ডের সঙ্গে ঝালাই করে দেয়া হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির আট ফুটি দণ্ড, আর সেখানে বিশেষ কায়দায় লটকে আছে মানুষের পাঞ্জার সমান বড় এবং ফ্লাইংসসারের মত দেখতে সি.সি. ক্যামেরা। কাছেই কোথাও একঘেয়ে সুরে ডাকছে ঝিঁঝিঁ।

চলার গতি ধীর হলো রানার। ভ্রূ কোঁচকাল ও। আনমনা হয়ে পড়েছে।

বেকার-হত্যাকাণ্ডের ক্রাইম সিনে দেখা ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ভাবিয়ে তুলেছে ওকে। আসলে লাইসেন্সটা দেখার পর থেকেই অদ্ভুত এক অস্বস্তি পেয়ে বসেছে ওকে। বার বার মনে হচ্ছে, কী যেন দেখেছে ও, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না সেটা কী। মনে হচ্ছে, যে-ই খুন করে থাকুক মার্টিন বেকারকে, মোটরসাইকেলওয়ালা ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করেছে আসলে--লোকটা ট্রাফিক পুলিশের কেউ না।

কেন মনে হচ্ছে ও-রকম?

জানে না রানা।

এবং জানে না বলেই, ওর অস্বস্তিবোধটা বাড়ছে।

কোথায় যেন একটা ক্লু আছে, ধরি ধরি করেও ধরা যাচ্ছে না।

পেছনে রাস্তার সঙ্গে টায়ারের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ শব্দ। আওয়াজটা

কাছেই মনে হলো রানার, তাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় পথ ছেড়ে সরে গেল ও দু'কদম, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

পার্ক করে রাখা দুটো গাড়ির মাঝখানে জায়গা করে নেয়ার চেষ্টা করছে পুরনো মডেলের একটা সাদা ফোর্ড, ভেতরে বাজছে হাল সময়ের ধুমধাড়াক্কা মেটাল। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না--সেই হলদেটে আলো পৌঁছাতে পারেনি পার্কিংলট পর্যন্ত।

কেন যেন কৌতূহল বাড়ল রানার, এবার শরীরটা ঘোরাল ও সাদা ফোর্ডের দিকে, দু'কদম এগোল। ড্রাইভারকে চিনতে পারামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্যাভিস হ্যারিংটন।

এলএপিডি'র ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে যে-ক'জন অফিসার আছে, তাদের মধ্যে একমাত্র যে-লোকের সঙ্গে তথাকথিত সিরিয়াল কিলারের, মানে, বেকারের লিমাযিনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক অফিসারের মিল পাওয়া যাচ্ছে, সে হলো এই ক্যাভিস হ্যারিংটন।

কারণ, এক, পানিশমেন্ট ট্রান্সফারের অপমান আর জ্বালা আছে লোকটার বুকে। দুই, আদর্শবাদী হিসেবে পরিচিত সে সহকর্মীদের মাঝে; নীতির ব্যাপারে ওকে কখনও আপোষ করতে দেখেনি কেউ। তাই অন্য ট্রাফিক অফিসাররা বলাবলি করছে, যেসব "খারাপ" লোকদের হত্যাকাণ্ডে এলএপিডি'র কেউ কেউ খুশি হচ্ছে, হ্যারিংটন তাদের একজন। সবচেয়ে বেশি খুশি নাকি সে-ই। তিন, ভারী বা হালকা, ছোট বা বড়--যে-কোনও রকমের ফায়ার আর্মস চালনায় ওর দক্ষতা ঈর্ষণীয়, লক্ষ্যভেদে ওর পারদর্শিতা নাকি এককথায় তুলনাহীন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ-সময়ে কী করছে লোকটা পুলিশ বিল্ডিং-এর পেছনে? অ্যানুয়াল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যে হাত ঝালাই

করতে চায় সে-ও? রানা জানে, এ-প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আগেও অনেকবার পুরস্কার জিতেছে লোকটা।

আপাতত দেখে মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে গেছে হ্যারিংটন, কারণ বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে সে, একবার অ্যাক্সিলারেটর চাপছে তো পরমুহূর্তে দাবাচ্ছে ব্রেকপ্যাডেল। যে-দুটো গাড়ির মাঝখানে জায়গা করে নিতে চাচ্ছে, একাধিকবার ঘষা দিয়েছে সে-দুটোর গায়েই। জায়গায় জায়গায় চলটা তুলে দিয়েছে দুটো গাড়িরই, বিসর্জন দিয়েছে নিজের গাড়ির কিছু রঙও। যা করতে চাচ্ছে তা করতে পারল শেষপর্যন্ত, কিন্তু ততক্ষণে আলগা হয়ে গেছে ওর গাড়ির পেছনের বাম্পার, শব্দ করে ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে সামনের দুটো চাকা থেকে।

তারপর, রানাকে চমকে দিয়ে, হঠাৎ করে প্রাণ পেল ফোর্ডের চারটা চাকাই, ফার্স্ট গিয়ারে এতখানি স্পিড তোলা সম্ভব কি না ভাবার জন্য মাত্র একটা মুহূর্ত পেল রানা। পরমুহূর্তে জায়গা বদল করার জন্য অচিন্তনীয় রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাতে হলো ওকে, কারণ যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেদিকেই মাতাল ভঙ্গিতে ছুটে আসছে হ্যারিংটনের ফোর্ড। ফুট চারেক সরেছে কি সরেনি রানা, সঙ্গে সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল--জোরে ব্রেক করেছে হ্যারিংটন। এবং তা না-করলে...

কী হতো জানে না রানা নিজেও।

দরজা খুলে ঝড়ের গতিতে নামল হ্যারিংটন, ট্রাফিক অফিসারের উর্দি আর বুট পরে আছে এখনও। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে হাঁটা ধরেছে, এমন সময় নরম গলায় ওকে ডাকল রানা, 'হ্যালো, মিস্টার হ্যারিংটন।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। রানার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে, মনে করার চেষ্টা করছে রানার সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে কি না। সে-রকম কিছু মনে না-পড়ায় ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর,

পকেট থেকে চশমা বের করে পরল।

মুনগ্লাসটা খুলে পকেটে ভরল রানা। 'আমি রানা, মাসুদ রানা।'

'মিস্টার রানা?' কেমন খ্যাপাটে হাসি হাসল হ্যারিংটন, মানসিক বিকার পেয়ে বসেছে কি না লোকটাকে ভাবল রানা। 'নামটা কি শুনেছি আগে?'

'সম্ভবত। আমি এলএপিডি'র অনারারি ট্রাফিক লেফটেন্যান্ট।'

'ও...তা হলে আপনিই সেই লোক? আপনিই লেগেছেন আমার পেছনে, না?'

'আপনার পিছনে লাগিনি,' ভুলটা শুধরে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। 'এখন পর্যন্ত দশজন মানুষকে কবরে পাঠিয়েছে যে-লোক, তার পিছনে লেগেছি।'

'আদর্শবাণী শোনাচ্ছেন?' নাক টানল হ্যারিংটন, চেহারা শক্ত হয়ে গেছে। 'দয়া করে আমার সঙ্গে করবেন না কাজটা। আমি কারও বাণী শোনার মত মানুষ নই। অনেক আদর্শবান দেখেছি জীবনে, তারা যে আসলে এককেটা শুয়োরের-বাচ্চা তা-ও জানা আছে আমার।'

হ্যারিংটনের জন্য কেন যেন মায়া লাগছে রানার--টের পেয়ে কিছুটা হলেও আশ্চর্য হলো ও। 'এত রেগে আছেন কেন?'

'রেগে থাকব না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল হ্যারিংটন। 'যে-কাজই করতে যাই, কোত্থেকে যেন একটা না একটা বাধা এসে হাজির হয়ে যায়। সেগুলোর সর্বশেষ উদাহরণ আপনি নিজে।'

'আমি?'

'জী, আপনি।'

'কীভাবে?'

'যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, ফোর্ডটা পার্ক করতে

চেয়েছিলাম ঠিক সেখানে। দিলেন কাজটা করতে?'

'দিয়েছি,' মুচকি হাসল রানা। 'ঠিক যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই পার্ক করেছেন আপনি। ফুট চারেক না-সরলে আপনার গাড়ির নীচে পড়তে হতো আমাকে।'

'আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয় আপনার? মাথাটা একটু গরম হতে পারে, কিন্তু আমি পাগল না। জেনেবুঝে কাউকে গাড়ি চাপা দিইনি কখনও, দেবও না। কাউকে মারতে চাইলে অন্য উপায় জানা আছে আমার।'

'শুটিং প্র্যাকটিসে এসেছেন?' প্রসঙ্গ বদলাতে চাইল রানা।

'না। এখানে খাসা খাসা মেয়েমানুষ পাওয়া যায়। ওদের কোনও একজনকে তুলে নিতে এসেছি।'

আবারও মুচকি হাসল রানা। ওর সন্দেহ হচ্ছে, হ্যারিংটনের পেটে মদ আছে। 'থাকেন কোথায়?'

'জাহান্নামে।'

কথাটা এক অর্থে ভুল না। অন্যায়-অবিচার, খুন-ধর্ষণ-ছিনতাই-ডাকাতি-অপরাজনীতি, আর যুদ্ধবিগ্রহে ভরা পৃথিবীটা নরকের চেয়ে কোনও অংশে ভালো না।

'পরিবার?' সদুত্তর পাওয়া যাবে না জেনেও জিজ্ঞেস করল রানা।

ওর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল হ্যারিংটন। 'মাকে চোখে দেখিনি কখনও। একটা বাবা ছিল--ভালোমানুষ, এবং বেশিরভাগ ভালোমানুষের মতই বোকা। তাই ধুঁকে ধুঁকে মরল আমার চোখের সামনে। ব্যস, আমার পরিবারের কিচ্ছাও শেষ হয়ে গেল।'

'শুনেছি বিয়ে করেছিলেন?'

'বিয়ে?' থু করে একদলা থুতু ফেলল হ্যারিংটন। 'তা করেছিলাম বটে।'

'সেপারেশন হয়ে গেছে, না?'

হ্যারিংটনের ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল কয়েকটা মুহূর্তের জন্য, তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। 'আমি ছাড়তে চাইনি। আমার কাছ থেকে নিজেকে আর আমাদের তিন বাচ্চাকে অপারেশন করে সেপারেশন নিয়ে নিল ও। কী আর করা?'

'ভদ্রমহিলা এখন কোথায়?'

'সে-ও জাহান্নামে।'

'ও আচ্ছা। আপনার দিনকাল তা হলে কাটছে কীভাবে? একাই থাকেন এখন?'

'দিনকালের আবার কাটাকাটি! যে-লোক হাসপাতালে কোমায় থাকে, তারও তো দিন কেটে যায়।'

রানা উপলব্ধি করল, হ্যারিংটন খ্যাপাটে হলেও তিক্ত সত্যতা আছে লোকটার কথায়। 'মার্টিন বেকার হত্যাকাণ্ডে আপনি একজন সাসপেক্ট।'

'যত দোষ নন্দ ঘোষ। এতই যখন সন্দেহ, তখন হোমিসাইডের লোকরা আসছে না কেন আমার কাছে? ধরে রিমাণ্ডে নিচ্ছে না কেন আমাকে? ...মার্টিন বেকার, না? হারামজাদা মারা যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি। ওর মত এক বেশ্যার বাচ্চা বোঝা হয়ে ছিল লস অ্যাঞ্জেলেসের মানুষদের ওপর, সে কবরে যাওয়ায় বোঝাটা অনেক হালকা হয়েছে! ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার শুধু ক্রিমিনালদের আছে, সাধারণ মানুষদের নেই? জেনে রাখুন, মিস্টার...কী যেন নাম বললেন আপনার...ও, মনে পড়েছে...মাসুদ রানা, যারা আইন ভাঙে শুধু তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত না পুলিশদের অস্ত্র, যারা আইন ভেঙে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পার পেয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধেও...'

'কিন্তু সে-অধিকার নিশ্চয়ই দেয়া হয়নি কাউকে?'

জবাবে ভয়াবহ একটা গালি দিয়ে হ্যারিংটন বলল, 'গরিবের

রক্তচোষা বড়লোকের মাল যখন লুটে নেয় রবিন হুড, তখন হায় হায় করে সবাই। কিন্তু ওই বড়লোকই যখন গরিবের রক্ত চুষে চুষে খায় তখন কেউ কিছু বলে না।' থু করে আবারও থুতু ফেলল সে। 'শালা দুনিয়ার...' মারাত্মক গালিটা আবারও দিল।

'আপনার জন্য মনে হয় আর্লি রিটায়ারমেন্টই ভালো।'

'রিটায়ারমেন্ট!' ঝট করে রানার দিকে তাকাল হ্যারিংটন, চোখে কপট বিস্ময়। 'ওটা আবার কী? খায়, না মাথায় দেয়? বুকের জ্বালা না-জুড়োনো পর্যন্ত...। আমার পেছনে লেগেছেন, না? তা হলে আপনাকেই বলি কথাটা, দেখি কী করতে পারেন। লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী আমি। আফসোস, ইদানীং যারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে তাদের সবাই পুরুষমানুষ। ওদের কেউ মেয়েলোক হলে কী করতে বলতাম, জানেন? বলতাম, আগে রেপ কর্ সবগুলোকে, রক্তাক্ত করে দে, তারপর কুকুরের মত গুলি করে মার্। তা না-হলে কীসের বদলা?'

রানা কিছু বলল না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হ্যারিংটনের দিকে। ভাবছে, একটা লোকের মনে কতখানি জিঘাংসা থাকলে ও-রকম কথা বলা সম্ভব।

'ঠিক বলিনি?' জিজ্ঞেস করল হ্যারিংটন।

জবাব না দিয়ে হ্যারিংটনকে একা রেখে পুলিশ বিল্ডিং-এর দিকে এগোল রানা।

ছয়

এস্কেলেটর দিয়ে নামছে রানা, চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একটা দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করছে।

এগিয়ে যাচ্ছে মার্টিন বেকারের লিমাযিন। পেছন পেছন নীল-সাদা মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছে ক্যাভিস হ্যারিংটন। হাইওয়ের একজায়গায় থামতে বাধ্য করল সে বেকারের ড্রাইভারকে। কী যেন নাম লোকটার? ও, মনে পড়েছে--ববি। তারপর? তারপর আর দশজন ট্রাফিক অফিসার যা করবে তা-ই করেছিল হয়তোঃ ববির কাছে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চেয়েছিল।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড পিস্তল রেঞ্জ চলে এসেছে। সামনে একটা অন্ধকার হলওয়ে। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। রাত প্রায় দশটা বাজে। হ্যারিংটনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে আধ ঘণ্টার মত।

চলে যাবে কি না ভাবছে রানা, কারণ এত রাতে কারও থাকার কথা নয়। করিডোরে শুধু রানার জুতোর খটখট আওয়াজ। করিডোরের শেষমাথাটা চওড়া হয়ে গেছে অনেকখানি, এখানে একসারিতে কয়েকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। সাউণ্ডপ্রুফ টেকনোলজি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ভেতরে, একটা দরজার চওড়া হাতল ধরে টান দেয়ামাত্র কিছুটা চমকে উঠল রানা বুলেটের আওয়াজে। খুব দ্রুত গুলি করা হয়েছে পর পর তিনবার,

মেশিনচালিত টানা তারের কারণে এগিয়ে চলেছে মানবদেহের আদলে নির্মিত একটা কাঠের-বোর্ড, হর্ষোৎফুল্ল কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে দূরে কোথাও।

তারমানে, ধরে নেয়া যেতে পারে, যে গুলি চালিয়েছে তার নিশানার প্রশংসা করা হচ্ছে।

এত রাতেও তা হলে শুটিং প্র্যাকটিস চলছে?

ভিতরে পা রাখল রানা।

টানা তার ততক্ষণে খাড়া করে দিয়েছে আরেকটা কাঠের বোর্ডকে, উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে হঠাৎ দেখলে মানবমূর্তি বলে বিভ্রম হয়। ওটার ঠিক মুখোমুখি জটলা পাকিয়েছে চার যুবক, কাঠের মূর্তির "উদয়" ঘটামাত্র পিস্তল তুলল তাদের একজন, কিন্তু রানার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ওর তিন সঙ্গীও দেখছে রানাকে।

চারজনের দৃষ্টিতেই প্রশ্ন।

রানাও দেখছে চার যুবককে। এম্ব্রয়ডারি করা ওয়ার্কশার্ট, রঙচটা জিন্স আর বুট পরে আছে চারজনই। প্রথম দেখায় চারজনকেই কলেজপড়ুয়া বলে মনে হয়। তবে ওদের শোল্ডার হোলস্টার আর গলায়-ঝোলানো আইডি কার্ড বলে দিচ্ছে, সুবর্ণ সে-সময়টা পার হয়ে এসেছে ওরা আগেই।

রানাকে দেখে, চিনতে পেরে হোক অথবা না-চিনে, হাসল চারজনই।

কিন্তু রানা হাসল না, নির্লিপ্ত ভাব বজায় রেখেছে চেহারায়। বোঝাই যাচ্ছে ওই চার ছোকরার এলএপিডি-তে চাকরির বয়স বেশিদিন না। মাথায় ঘুরছে ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডের একটা কথা, 'অনেক নতুন লোক এসেছে ডিপার্টমেন্টে। কারও কারও খুঁটির জোর সাংঘাতিক।'

ওই চারজন কি সাংঘাতিক খুঁটির জোরওয়ালা? নাকি লিখিত-

মৌখিক-শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে ঢুকেছে? এলএপিডি-তে আরেকটা ব্যবস্থা আছেঃ যারা পুলিশে চাকরি করতে চায় তারা কলেজে পড়ার সময় যদি পুলিশ জব ডিপার্টমেন্টে বায়োডাটা জমা দিয়ে রাখে, তা হলে তাদের জন্য অন-ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টের সুযোগ থাকে। এরা কি ওই সুযোগ নিয়েছে?

'রিসেন্টলি জয়েন করেছ মনে হচ্ছে?' কাছে গিয়ে জানতে চাইল রানা, একে একে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে চারজনের আইডি কার্ডে।

চারজনের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা, মাথা ঝাঁকিয়ে জবাবটা দিল সে। নাকের ওপর নেমে আসা চশমা ঠেলে তুলে দিল উপরে। কেমন একটা অমার্জিত ভাব আছে ওর চেহারায়, চুলগুলো দেখলে কুঁড়েঘরের চাল বানানোর কাজে ব্যবহৃত শণের কথা মনে হয়। বেশ লম্বাচওড়া শরীর, আপাতদৃষ্টিতে কঠোর চেহারার সঙ্গে কবিদের মত ভাসা ভাসা চোখ বড্ড বেমানান।

রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি সানি ডানহিল।'

হাতটা ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল রানা। 'জানি। পেট্রলম্যান, ট্রাফিক।'

মুচকি হাসল সানি। 'আইডি কার্ডের এই এক সমস্যা। কাউকে কিছু বলার আগেই মানুষ চোদ্দগুষ্ঠির খবর জেনে যায়। তারপরও পরিচয় করিয়ে দিই আমার বন্ধুদের সঙ্গে। ও ডেল কার্সন, পাশে জনাথন রিডক্স, আর শেষে জর্জ হেল্ডন। ...হ্যাঁ, আমরা চারজনই রিসেন্টলি জয়েন করেছি, প্রায় কাছাকাছি সময়ে।'

রিডক্স বলল, 'আপনি লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনার ব্যাপারে শুনেছি আমরা,' মুখ খুলল হেন্ডন, 'জয়েন করেই আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছেন আপনি।'

'এত রাতে কী করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কী করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন,' সানি মনে হয় একটু ঠোঁটকাটা স্বভাবের, 'প্র্যাকটিস।'

'কেন, শুটিং-এর জন্য তোমাদের কি নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা নেই?'

'আছে। প্রতি সোমবার রাতে।'

চশমা পরে রিডক্সও, সানির মত ওরও নাকের ওপর নেমে এসেছে সেটা, কিন্তু সেটা ঠেলে উপরের দিকে তুলে না দিয়ে খুলল সে। বুঝতে পারছে, রানা যা বোঝাতে চেয়েছে তা বুঝতে পারেনি সানি। তাই ধীরে ধীরে বলল, 'স্যর, আজকাল ট্রাফিক পুলিশের চাকরির ধরন পাল্টে গেছে, আমাদের চেয়ে ভালো জানেন আপনি। অপরাধীরা এখন কোনও বিষয়েই ছাড় দিতে নারাজ। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় নিরীহ ট্রাফিকের ওপরও গুলি চালাতে দ্বিধা করে না তারা। কাজেই সে-রকম কোনও পরিস্থিতির কথা ভেবে আমরা যদি একটু ঝালাই করে নিই নিজেদেরকে, অসুবিধা কী?'

'না, অসুবিধা নেই,' মাথা নাড়ল রানা, রিডক্সের উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশি হতে পারছে না কেন যেন। 'এবার আমি যদি একটু ঝালাই করে নিই নিজেকে, অসুবিধা আছে?'

'না, না, অসুবিধা থাকবে কেন?' সরে জায়গা করে দিল রিডক্স, ওর দেখাদেখি বাকিরাও।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করতে গিয়েও করল না রানা। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে উঁকি দিল ভিতরে। কয়েক রকমের ভারী গান আছে, বেছে বেছে একটা পয়েন্ট ফোর ফোর ম্যাগনাম বের করল। এলএপিডি'র চার রিসেন্ট রিক্রুটের সঙ্গে

কথা বলতে ইচ্ছা করছে না আর, বলার তেমন কিছু নেইও। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে, কাছেই দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে ওরা।

ওদের চারজনের মধ্যে কার্সন সবচেয়ে খাটো। গোলগাল চেহারা ওর, নধরকান্তি। রানাকে ম্যাগনাম বের করতে দেখে গদগদ গলায় বলল, 'স্যর, সামনের সপ্তাহের কমপিটিশনে কি অংশ নেবেন?'

'সেই রকমই ইচ্ছা,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পজিশন নিল রানা। 'কেন?'

দাঁত বের করে হাসল হেন্ডন। সে-ও বেশ লম্বাচওড়া, কিন্তু শরীরের দিকে তাকালে কেন যেন শক্তপোক্ত বলে মনে হয় না। আর চেহারার দিকে তাকালে, বিশেষ করে যখন সে দাঁত বের করে হাসে--যেমন এখন, ভাঁড় বলে মনে হয়। বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এবার কোনও না কোনও পুরস্কার জিতবেন।'

ওর দিকে তাকাল রানা। 'কেন মনে হচ্ছে?'

'যে-ভঙ্গিতে ম্যাগনাম বের করলেন, যে-ভঙ্গিতে পজিশন নিচ্ছেন, সবকিছুই প্রফেশনালদের মত।'

ঝুঁকল রানা, হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বুলেটকেস বের করল, ম্যাগনামের চেম্বার খুলে বুলেট ভরছে। 'আমার সঙ্গে যারা কমপিটিশন করবে তারা সব অ্যামেচার নাকি?'

'না, ওরা অ্যামেচার না,' জবাবটা দিল রিডক্স, 'কিন্তু ওদের কাউকে হাতেপায়ে ধরে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসেননি ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড। ওদের কাউকে অনারারি লেফটেন্যান্ট বানানোর জন্য বাকি পুলিশ কমিশন্যারদের নিয়ে মিটিং-এ বসেননি প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কি।'

'কাজেই আপনি সামওয়ান স্পেশাল, স্যর,' তৈলমর্দন করছে কার্সন। 'আপনি একজন লিভিং লিজেণ্ড।'

তোষামুদি মোটেও পছন্দ করে না রানা; ও নিজে যেমন

কাউকে তেল দেয় না, তেমনি চায়ও না কেউ তেল দিক ওকে। তাই চার যুবকের ওপর ওর বিরক্তি কিছুটা হলেও বাড়ল। আক্ষেপের সুরে বলল, 'রাত দশটার সময় এসেও খালি পেলাম না এই জায়গা।'

'আপনি চাইলে রেঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারি আমরা,' বলল সানি, 'কোনও সমস্যা নেই।'

"যাও" শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা, ভেবে দেখল চার যুবক যদি থাকে এখানে তা হলে তেমন কোনও সমস্যা হবে না ওর। কিন্তু যদি চলে যেতে বলে ওদেরকে, আর ওরা যদি কথাটা লাগায় ডিপার্টমেন্টে, খোঁটা দেয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে হেইডন। তারচেয়ে বরং...

'নাহ্, থাকো তোমরা,' বলল রানা, কোটের বোতামগুলো খুলে দিল যাতে ফায়ার করার সময় কোনও অসুবিধা না হয়। 'ডিউটিটা আমার জন্য নতুন, বুঝতেই পারছ, তাই আমার কোনও রুটিন নেই এখন পর্যন্ত।' দড়ি টানা মেশিনের একটা সুইচ টিপে দিয়ে কাঠের "প্রতিপক্ষকে" পাঠিয়ে দিল আরও দূরে। 'তবে নিজের জন্য রুটিন বানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

সবাই দাঁড়ায় মুখোমুখি, কিন্তু কী ভেবে পজিশন বদল করল রানা, "প্রতিপক্ষের" সঙ্গে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দাঁড়াল। এবার কোনাকুনিভাবে ফায়ার করতে হবে ওকে, অর্থাৎ শুটিং প্র্যাকটিসটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল ওর জন্য। পকেট থেকে বের করে মুনগ্লাসটা পরল ও, আড়চোখে তাকাল চার যুবকের দিকে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। হাসি অথবা ও-রকম কোনও তরল আবেগ নেই কারও চেহারায়। বরং কৌতূহল নিয়ে দেখছে রানাকে।

ওদের আগ্রহ যাতে আরও বাড়ে সেজন্য ম্যাগনামের

সিলিণ্ডারটা খুলে ফেলল রানা, রাখল হাতের কাছেই, হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে আরেকটা সিলিণ্ডার বের করে সেটাতে বুলেট ভরল সময় নিয়ে। দ্বিতীয় সিলিণ্ডারটা ঢুকাল জায়গামত, আঙুল দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে ধাতব ঘূর্ণনের আওয়াজ শুনল, পরে নিখুঁত একটা ক্লিক আওয়াজে আটকে দিল সেটা। শেষে ওর কাছের একটা স্ট্যাণ্ডে রাখল ম্যাগনামটা।

'ঠিক কী ধরনের ম্যাগনাম ব্যবহার করছেন?' জিজ্ঞেস করল কার্সন।

প্রশ্নটা শুনে যেন বিরক্ত হয়েছে এমনভাবে ঘাড় ঘুরাল রানা। 'পয়েন্ট ফোর ফোর স্পেশাল, নো রিকয়েল। পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেনের চেয়ে হালকা এটা, ফলে গ্রিপিং বা কন্ট্রোল দু'দিক দিয়েই সুবিধা পাই। আর কিছু?'

'না, স্যর, সরি,' ক্ষমা প্রার্থনার ঢঙে হাসল কার্সন। একজোড়া নয়েয-সাপ্রেসিং এয়ারফোন টেনে নিল সে নিজের জন্য, ওর দেখাদেখি বাকিরাও।

এয়ারফোন পরল রানাও। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল আরও তিনটে মেশিনের দিকে, নির্দিষ্ট টাইম সেট করে "অটোমেটিকে" ফিক্স করে দিল সবগুলোকে। এরপর প্রথম মেশিনটা চালু করে দিয়েই বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, ডান হাত দিয়ে থাবা মেরে স্ট্যাণ্ড থেকে নিল ম্যাগনামটা, গুলি করল পর পর তিনবার। কিন্তু এত দ্রুত যে, মনে হলো মাত্র একবার গুলি করেছে ও।

ম্যাগনামের আওয়াজ অস্ত্রটার মতই ভয়ঙ্কর; কাঠের যে-বোর্ডটা এগিয়ে আসছিল রানার দিকে, তিনবার ঝাঁকুনি খেল সেটা টানা দড়ির ওপর। কিন্তু সেদিকে তাকানোর মত ফুরসত নেই রানার, কারণ অটোমেটিক টাইমারের কারণে চালু হয়ে গেছে আরেকটা কাঠের বোর্ড, এগিয়ে আসছে।

ছোট্ট একটা গড়ান দিয়ে পজিশন চেঞ্জ করল রানা, তবে তা করার আগে দ্বিতীয় সিলিণ্ডারটা নিতে ভুলল না, দু'পায়ে দাঁড়ানোমাত্র গুলি করল আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে। ফল কী হয়েছে দেখার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না, ম্যাগনামের খালি সিলিণ্ডারটা বের করে ফেলে দিয়ে অবিশ্বাস্য চালু হাতে লোড করল দ্বিতীয়টা। ততক্ষণে তিন নম্বর কাঠের-বোর্ড এগিয়ে আসছে। আবারও পর পর তিনবার ফায়ার করল রানা, রেযাল্ট কী দেখল না এবারও। মাথা নিচু করে ছুট লাগল এমন ভঙ্গিতে, যেন গুলি করছে চার নম্বর কাঠের-বোর্ড। কিছুদূর গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে পজিশন নিল একটা পিলারের আড়ালে, ডান হাতে আঁকড়ে ধরে আছে ম্যাগনামটা, ওটার নল মেঝের দিকে। রিভার্স মোডে থাকার কারণে কাঠের বোর্ডটা ততক্ষণে সরে যাচ্ছে আরও দূরে; ভাবখানা এমন, গুলি করে পালিয়ে যাচ্ছে অপরাধী। অ্যাকশন-থ্রিলার মুভির নায়কের মত উঁকি দিয়ে দেখল রানা "দৃশ্যটা", গুলি করার "মোক্ষম" সুযোগ পাওয়া গেছে বুঝে নিয়ে বের হলো আড়াল ছেড়ে, সিলিণ্ডারে তিনটে বুলেট বাকি থাকার পরও গুলি করল দু'বার, তা-ও আবার একটু সময় নিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে দেখল চার যুবক, বুলেটের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে কাঠের-বোর্ড টানা দুটো তার, মাত্র একটা মুহূর্ত নিজের জায়গায় স্থির হয়ে থাকল বোর্ডটা, তারপরই আছড়ে পড়ল ফায়ারিং রেঞ্জের মেঝেতে।

কান থেকে এয়ারফোন সরাল রানা, কাছের একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর নামিয়ে রাখল গরম হয়ে যাওয়া ম্যাগনামটা। দু'বার গড়ান দিয়েছে, কিছু ধুলোবালি লেগে গেছে কোটের আস্তিনে আর প্যান্টের পেছনে, সময় নিয়ে ঝাড়ছে ওসব। আড়চোখে তাকাল চার পেট্রলম্যানের দিকে।

একটু আগে যে-রকম তোষামুদি করছিল ওরা, সে-অনুযায়ী

রানার কীর্তি দেখে যারপরনাই খুশি হওয়ার কথা ওদের, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক চেহারা কালো হয়ে গেছে চারজনেরই, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা বোর্ড চারটের দিকে।

যে-তিনটা বোর্ড রানার গুলি "খেয়েছে", ফায়ারিং পজিশনের কাছে এসে হাজির হলো সেগুলো। দেখা গেল, সাদা কাগজের ওপর কালো কালি দিয়ে আঁকা তিনটে মানবমূর্তিরই বুকের বাঁ দিকে, হৃৎপিণ্ড যেখানে থাকে ঠিক সেখানে, একটা করে ত্রিভুজ--তিনটে করে গুলি লাগার কারণে তৈরি হয়েছে।

'এক শ'তে এক শ' দিতাম আপনাকে,' বলে উঠল রিডক্স্র, আগের চেয়ে অনেক ভারী হয়ে গেছে কণ্ঠ, 'কিন্তু দিতে পারলাম না। চার নম্বর কাঠের বোর্ডে গুলিই লাগাতে পারেননি আপনি। অথচ ওটাতে গুলি করতে সবচেয়ে বেশি সময় নিয়েছেন।'

'বুঝবার ভুল,' স্ট্যাণ্ড থেকে ম্যাগনামটা নিল রানা, চেম্বার খুলে সিলিণ্ডারটা ঘুরিয়ে মনোযোগ দিয়ে সে-আওয়াজ শুনল আবারও। তারপর সময় নিয়ে বুলেট ভরতে লাগল সিলিণ্ডারে।

'ভুল?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রিডক্সের। 'মানে?'

'মানে আমার চতুর্থ টার্গেটটা গুলি করছিল আমাকে, তাই মাথা নিচু করে ছুট লাগাই আমি। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে ওর বুলেট শেষ, স্রেফ উল্টো ঘুরে ছুট লাগায়। ওর তিন সঙ্গীকে খতম করেছি, ওকেও যদি শেষ করে দিই তা হলে মূল্যবান ইনফর্মেশন জানতে পারব কার কাছ থেকে? তাই ওর গায়ে না, পায়ে গুলি করলাম সময় নিয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। এবার ওকে পাকড়াও করার দায়িত্ব কার, জানো? তোমাদের।'

দেখে মনে হচ্ছে, স্রেফ বোবা হয়ে গেছে চার যুবক।

ওদেরকে চমকে দিয়ে পাঁই করে ঘুরল রানা, শুটিং পজিশনের সঙ্গে দশ ইঞ্চি পুরু আর ফুট চারেক উঁচু যে-দেয়াল আছে সেটাতে উঠে দাঁড়াল লাফিয়ে, পা দুটো ল্যাণ্ড করামাত্র টানছে

ম্যাগনামের ট্রিগার। প্রতিটা বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ফায়ারিং রেঞ্জের মেঝেতে পড়ে থাকা বোর্ডটা।

চারবার গুলি করে থামল রানা, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নামল দেয়াল থেকে। 'এবার কী করলাম, বলো তো?'

জবাব নেই চার যুবকের কারও মুখেই।

'ক্রিমিনালটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলে তোমরা, ভেবেছিলে পানির মত সহজ হবে কাজটা। কিন্তু অন্য মতলব ছিল লোকটার মনে, তোমাদের যে-কোনও একজনকে পাকড়াও করে পালাতে চাচ্ছিল পুলিশের কবল থেকে। তাই কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট কোল্টটা তোমাদের অগোচরে বের করে অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ পাওয়ামাত্র লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তোমাদের একজনের মাথায় ঠেসে ধরেছে কোল্ট। আমি তখন দেখলাম তোমাদের মধ্যে যে ধরা খেয়েছ তাকে বাঁচাতে হলে ওই লোককে মারতে হবে, তাই পরপারে পাঠিয়ে দিলাম ওকে। ...বোর্ডটার বুকে চারটা গর্ত আছে, ইচ্ছা হলে গিয়ে দেখতে পারো।'

কিন্তু ইচ্ছাটা হলো না চার যুবকের কারোরই। রানার কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছে ওরা। এবার একইসঙ্গে বিস্ময় ও প্রশংসা দেখা যাচ্ছে চারজনের চোখেই।

'চেষ্টা করে দেখবে নাকি?' শুটিং-এর আমন্ত্রণ জানাল রানা চার পেট্রলম্যানকে, ম্যাগনামে বুলেট ভরছে আবারও।

'না, স্যর, আপনার মত পারব বলে মনে হয় না,' প্রত্যাখ্যান করল কার্সন।

'আরে চেষ্টা করে দেখোই না,' স্পষ্ট চ্যালেঞ্জের সুর রানার কণ্ঠে, ঠোঁটের কোনায় উপহাসের হাসি।

'না, স্যর, পারব না।'

'পারিব না এ-কথাটি বলিয়ো না আর,' সুর করে বলছে রানা,

'কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার। মাসুদ রানা পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা...'

'সরি, স্যর, বুঝতে পারলাম না।'

'বললাম, তোমাদের মত ইয়াং জেনারেশানের এই এক সমস্যা। কিছু করার কথা বললেই পারব না...আমাকে দিয়ে হবে না...আরও কত অজুহাত! হারার আগেই হেরে যাওয়া তোমাদের অভ্যাস। কী করতে পারবে না, করার আগে জানলে কীভাবে?' ম্যাগনাম লোড করা শেষ, এগিয়ে গিয়ে অস্ত্রটা কার্সনের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা।

'ঠিক আছে, স্যর,' অস্ত্রটা নিল কার্সন। এমনভাবে ধরেছে সেটা, দেখলে মনে হবে নবজাতক বাচ্চাকে কোলে নিয়েছে বুঝি মা। উল্টেপাল্টে দেখছে ম্যাগনামটা--ঠিক যেভাবে প্রথমবারের মত সন্তানের চাঁদমুখ দেখে একজন প্রসূতি। ওজন বুঝবার চেষ্টা করছে--লড়াই শুরু করার আগে একজন বক্সার তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যেভাবে মাপে সেভাবে।

রানা বলেছিল ওটা নাকি হালকা, কিন্তু আসলে যথেষ্টর চেয়েও বেশি ভারী হওয়ায় কী যেন বলল কার্সন বিড়বিড় করে। টের পেল, রানার দিকে যতটা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল ওর বন্ধুরা, তারচেয়েও বেশি কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হর্ন রিম্ড চশমাটা খুলল, বলল, 'কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয় আমার। দূরে দেখতে তেমন কোনও সমস্যা নেই।'

অক্ষত আছে এ-রকম একটা বোর্ডের মুখোমুখি গিয়ে শুটিং পজিশনে দাঁড়াল সে। পাশের স্ট্যাণ্ডের মোটা হুকে আটকে রাখা আছে এয়ারফোন, সেটা খুলে নিয়ে পরল। অলিম্পিক সাঁতারুরা পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেভাবে টান-টান করে দেয় দু'হাত, সেভাবে লম্বা করল নিজের হাতদুটো।

দৃশ্যটা দেখে মুচকি হাসল রানা।

সানির দিকে তাকিয়ে সামান্য নড করল কার্সন। এগিয়ে গিয়ে মেশিনের সুইচ টিপে দিল সানি। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু একটা শব্দ তুলে সচল হলো মানবমূর্তির ছবিওয়ালা বোর্ড, এগিয়ে আসছে কার্সনের দিকে।

পরমুহূর্তে যে-ঘটনা ঘটল, সেটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না রানা।

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ম্যাগনামের ট্রিগার টানল কার্সন পর পর পাঁচবার, কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হলো মাত্র একবার ট্রিগার টেনেছে সে। বোর্ডটা ফায়ারিং পজিশনের কাছে আসার পর দেখা গেল, মানবমূর্তির বুকের বাঁ দিকে, এক সরলরেখায় চারটে ফুটো তৈরি হয়েছে।

একদৃষ্টিতে বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিছু বলছে না, নিজের বিস্ময়ভাব লুকানোরও চেষ্টা করছে না।

'জানি এক শ'তে এক শ' দেয়া যাবে না আমাকে,' ম্যাগনামটা রানার হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল কার্সন, ওর ঠোঁটের কোনায় লটকে আছে বিজয়ীর হাসি, 'কারণ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শেষের শটটা মিস করেছি। আসলে...ম্যাগনামটা একটু ভারী হয়ে গেছে আমার জন্য।'

'দুনিয়ার কোনও কাজে কাউকেই এক শ'তে এক শ' দেয়া যায় না,' সান্ত্বনার সুরে বলল রানা, তবে সেটা ঠিক কার উদ্দেশে বোঝা গেল না। 'কথায় আছে, কেউই নিখুঁত নয়।'

'তবে আপনি বোধহয় ব্যতিক্রম, স্যর,' বলল সানি।

আবার তোষামুদি, তাই আবারও বিরক্ত হলো রানা। বলল, 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো, কার্সন। এত ভালো ফায়ারিং শিখলে কোথায়?'

চশমা চোখে দিল কার্সন, রানার দিকে তাকাল। 'না, এখানে না। আসলে শুটিং আমার অনেকদিনের শখ। পুলিশে ঢোকার

আগে থেকেই প্র্যাকটিস করি, প্রাইভেটে। আর্মি রেঞ্জার্স নামের একটা ক্লাব আছে, সেনাবাহিনীর কয়েকজন রিটায়ার্ড অফিসার প্রতিষ্ঠা করেছে, ওখানে নাম লিখিয়েছিলাম,' দাঁত বের করে হাসল। 'আসলে আমরা চারজনই আগে-পরে ওই ক্লাবের সদস্য ছিলাম।'

'ও...আচ্ছা। তারমানে একটু আগে আমার সঙ্গে বেশি বিনয় করা হচ্ছিল?'

আবারও হাসল কার্সন। 'রিডক্সের নিশানা প্রায় আমার মতই। হেল্ডন আমাদের দু'জনের চেয়ে ভালো। আর সানি...ও তো এককথায় তুলনাহীন, আমার মনে হয় চোখ বন্ধ করে এক শ'তে এক শ' দেয়া যায় ওকে,' সানির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে।

হাসল রিডক্স, মৃদু ঘুসি মারল হেল্ডনের কাঁধে।

হাসল হেল্ডন, মৃদু ঘুসি মারল সানির কাঁধে।

হাসল সানি, মৃদু ঘুসি মারল কার্সনের কাঁধে।

আবারও আশ্চর্য হওয়ার পালা রানার। জানতে চাইল, 'স্কুলজীবনের বন্ধু নাকি তোমরা?'

'না, স্যর,' জবাব দিল সানি, 'তবে আমাদের বন্ধুত্ব স্কুলের বন্ধুত্বের চেয়ে কোনও অংশে কম না।'

চুপ করে ম্যাগনামটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিছুক্ষণ পর দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিল ওর ব্যাগটা। মাথা ঝাঁকাল চার পেট্রলম্যানের উদ্দেশে, বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল।

যে-ক্লুটা মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ছিল না ওর, সানিদেরকে দেখে খেয়াল হয়েছে সেটা।

এস্কেলেটর বেয়ে উপরে উঠে এসে পুলিশ বিল্ডিং-এর ইনফর্মেশন সার্ভিস সেন্টারের দিকে এগোল ও। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে সার্ভিস সেন্টারটা।

সাত

সিলভার গেট ব্রিজ থেকে কএক মাইল উত্তরে, মারিনা দেল রে লেকে যেন মাথা তুলে আছে বাইটুরন উপদ্বীপ; অদ্ভুত এক ভিন্নতা তৈরি করেছে পারিপার্শ্বিক সবকিছুর সঙ্গে। এখান থেকে দূরের সাগরতার দিকে তাকালে দেখা যায় একের পর এক সামুদ্রিক গুহ্য আর পাহাড়ের চমৎকার দৃশ্য। উত্তর পশ্চিমে, শীতে সবুজ আর গ্রীষ্মে বাদামি রঙ ধারণ করা চড়াই-উৎরাইপূর্ণ পাহাড়গুলোর মাথা ছাড়িয়ে যেন টাওয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছে পাটালমারিস পর্বত; সেখানে দেখা মিলবে রেড উড গাছে ভরা সঙ্কীর্ণ বা চওড়া বহু উপত্যকার, কোনও কোনও জায়গায় সে-জঙ্গলের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে হাজার হাজার চিরসবুজ ওক। রাজকীয় ওই পর্বতের সর্পিলাকার ঢাল গুলোর সঙ্গে নারীদেহের লোভনীয় সব বাঁকের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিল ইন্ডিয়ানরা সম্ভবত, তাই পর্বতটাকে নিজেদের মত করে পাটালমারিস, মানে "দ্য স্লিপিং মেইডেন" নাম দিয়েছে।

ঘুমন্ত কুমারীর পুবে, বাইটুরনের জায়গায় জায়গায় ওক জঙ্গলের প্রাকৃতিক কার্পেট। ঠিক উল্টোদিকে, বহু দূরে, মাউন্ট ডায়াব্লো। দক্ষিণে, সিলভার গেট ব্রিজ আর বাইটুরন ব্রিজের মাঝখানে, লস অ্যাঞ্জেলেস। দূর থেকে এ-শহরের দিগন্ত রেখার দিকে তাকালে সবার আগে চোখে পড়ে একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানির পিরামিডের মত দেখতে অফিস, আর ক্যালিফোর্নিয়ার

সবচেয়ে বড় বাঙ্কের বাক্সের মত দেখতে একটা স্কাইক্রেপার।

বাইটুরনের এককোনায় সুন্দরীর ঠোঁটের কোনার ভাজের মত, নিজের জন্য জায়গা করে নিয়েছে অ্যান্জেলে আইল্যান্ড। সবুজে ছাওয়া একের পর এক বেঁটে পাহাড় কৃত্রিম দ্বীপটার সৌন্দর্যই বাড়ায়নি শুধু, অদ্ভুত এক রহস্যময়তাও দিয়েছে সেটাকে। বিলাসবহুল এ-দ্বীপের একখণ্ড জমির দামে পাঁচটা নিম্নবিত্ত পরিবারের পুরো জীবন কেটে যাবে নির্ভাবনায়। মারিও পুজো'র গডফাদার শব্দটা আজকাল আর সেভাবে চলে না। এখানকার গডফাদাররা সবাই একেকজন সমাজপতি, আর লস অ্যান্জেলেসের সে-রকম কিছু সমাজপতি নিজেদের উইকএন্ডটা নির্ভাবনায় কাটাতে বেছে নিয়েছে অ্যান্জেলে আইল্যান্ডকে।

স্বর্গেও দাস-দাসী আছে, অ্যান্জেলে আইল্যান্ডেও দেখা মেলে নিম্নবিত্ত অনেকে লোকের- শুক্রবারের বিকেলটা গড়াতে না গড়াতেই বাড়তি কিছু কামাইয়ের আশায় লস অ্যান্জেলেসের শহরতলী থেকে লেকের বুক চিরে অ্যান্জেলের উদ্দেশে শুরু হয় ওদের ফেরিযাত্রা, ফিরতি পথে ছুট লাগায় রোববার ভোঁরে। ওদের সঙ্গে একি ফেরিতে অশরীরীর মত আসে আইনও, বাঘের জঙ্গলের শিয়ালের মত ভয়ে ভয়ে উইকএন্ডটা কাটায় দ্বীপে। আইল্যান্ডের সমাজপতিদের হাতে নিগৃহীত হয় নিম্নবিত্তরা। আইন দেখেও দেখে না; যারা তাদের পোষা কুকুরটার জন্য অথবা আদরের বিড়ালটার জন্য হাজার ডলার খরচ করতে সামান্য দ্বিধা করে না, তারাই ন্যায্য পাওনা থেকে ঠকায় নিম্নবিত্তদেরকে- আইন কিছুই জানে না সেসবের। আইন শুধু আপদ ছাড়া দুটো দিন কাটাতে পারলে রোববার সকালে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে যিশু ও তার কুমারী মাকে। পালতোলা ছোট-বড় ইয়ট সারাবছর যেভাবে উদ্দেশ্যহীন চক্কর লাগায় আইল্যান্ডকে ঘিরে, সমাজপতিদের অভয়ারণ্যে আইনের

উপস্থিতিও সে-রকম উদ্দেশ্যহীন।

রানার সঙ্গে ক্যাভিস হ্যারিংটনের দেখা হওয়ার পরেরদিন। আজ একটু বেশিই তেতে উঠেছিল সূর্যটা, তাই দুপুর গড়িয়ে গেলেও গরম কাটেনি এখনও। সকাল থেকে বাতাস নেই, কেমন গুমোট ভাব চারদিকে। অ্যাঞ্জেলে আইল্যাণ্ডের একটা ঘেসো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ক্রল করে নামছে লোকটা। কোনও তাড়া নেই তার, তাই একটু একটু করে নামছে আর মাথা তুলে তুলে দেখছে কয়েক শ' ফুট নীচের ম্যানসনটা। আভিজাত্য আর বিলাসিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা।

লোহার ভারী সদর-দরজা থেকে চমৎকার একটা ড্রাইভওয়ে এগিয়ে গেছে ভিতরের দিকে, দু'পাশে ইউক্যালিপ্টাসের ঝাড়। রাস্তা থেকে দেখা যাবে না হয়তো, কিন্তু লোকটা যেহেতু উঁচুতে আছে সেহেতু অনায়াসে দেখতে পাচ্ছে গাদাগাদি করে পার্ক-করা কয়েকটা মার্সিডিয, ক্যাডিলাক আর লিঙ্কন কন্টিনেন্টাল। পার্কিং এরিয়ার সঙ্গেই চোখজুড়ানো বাগান, প্রস্ফুটিত বাহারি ফুলের সারি নিঃশব্দে জানান দিচ্ছে প্রকৃতিতে এখন বসন্তের রাজত্ব।

আরেকটু নামল লোকটা। ওর পিঠের ওপর পড়ছে বিকেলের রোদ, পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম পরে থাকায় গরমই লাগছে। হঠাৎ মুচকি হাসল সে; নিজেকে অদৃশ্য অন্তর্যামী মনে হচ্ছে--ওই ম্যানসনটা এবং এখন ওখানে যারা আছে তাদের প্রায় সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। কাঁধে ঝোলানো ছোট কিন্তু ভারী ব্যাগটা খসাল, কী করতে যাচ্ছে কল্পনা করে নিঃশব্দে হাসল আবারও। একে একে বের করল একটা এম-সিক্সটিন রাইফেলের আলগা করে রাখা পার্টগুলো, দ্রুত আর অভ্যস্ত হাতে সেগুলো জোড়া দিতেই "জন্ম নিল" কুৎসিতদর্শন অস্ত্রটা, তারপর বাঁ হাঁটু মাটিতে রেখে সেটার সঙ্গে ডান হাঁটুটাকে

নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে খাড়া করল। রাইফেলের বাঁট ঠেকাল কাঁধে, ডান তর্জনী দিয়ে ট্রিগারটা পেঁচিয়ে ধরে চোখ রাখল টেলিস্কোপিক সাইটে।

হ্যাঁ, এই তো, ম্যানসনের ঝকঝকে উঠানসংলগ্ন বিশাল সুইমিংপুলের ধারে কী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

একটা লাউঞ্জচেয়ারে শুয়ে ছিল সোনালি চুলের এক মহিলা, এই মাত্র উঠে দাঁড়াল, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডাইভিংবোর্ডের দিকে। ওকে মহিলা বলাটা ভুল হলো বোধহয়, কারণ দেখলে মনে হয় তাজ্জব কোনও কারসাজিতে নিজের বয়সটা পঁচিশ থেকে আটাশের মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। পরনের ফুটকিওয়ালা হলুদ বিকিনি ওর যৌবন ঢাকার জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত। হাঁটার সদর্প ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় নিজের মোহনীয় শরীর সম্পর্কে শতভাগ জ্ঞান রাখে সে। তাই পুলের ধারে ছড়িয়েছিটিয়ে বসে থাকা কয়েকজন পুরুষের চোখ ওর শরীরের খাঁজে-ভাঁজে চুম্বকের মত আটকে গেছে টের পেয়ে সন্তুষ্টি ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোনায়। বিশাল এক হীরার আংটি দেখা যাচ্ছে ওর একটা আঙুলে, সেটাতে বার বার চুমু দিয়ে ঝিলিক তুলতে পেরে ধন্য হচ্ছে বিকেলের রোদ।

ডাইভিংবোর্ডে গিয়ে দাঁড়াল সে, অল্প অল্প দোল খাচ্ছে এখন; কী ইন্দ্রজাল তৈরি করতে পেরেছে দর্শকের মনে বুঝতে পেরে দাঁত বের করে হাসছে। তারপর, এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে, ধীরে ধীরে উপরে তুলল দুই হাত--ডাইভ দেবে হয়তো।

'উফ্, বেবি, দেখাও এবার!' কামকর্কশ একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল পুলের ধার থেকে, 'দেখি কত চমৎকার পারো তুমি কাজটা!'

কিন্তু এত জলদি ডাইভ দেয়ার ইচ্ছা নেই ওই মোহময়ীর। চোখ পিটপিট করছে সে, দোল খাচ্ছে একইসঙ্গে, বাসনার

আগুনে পুড়িয়ে মারছে ওর যৌবন পিপাসুদের।

বুকের ভিতর স্পষ্ট ধুকপুকানি টের পাচ্ছে পাহাড়ের উপরে বসে থাকা লোকটা। শুকিয়ে আসা গলা ভেজানোর জন্য ঢোক গিলল সে, একটুখানি মোচড় দিল শরীরটাকে। উদ্বাহু দোল খেতে থাকা ওই যৌনদেবী সুড়সুড়ি জাগিয়ে দিয়েছে ওর দেহমনে। কিন্তু জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল সে। ওদিকে ততক্ষণে শেষবারের মত দোল খেয়ে ডাইভ দিয়েছে যৌনদেবী, ঠিক অলিম্পিক ডাইভারদের মত চোখধাঁধানো ভঙ্গিতে শরীরটা বার বার পাক খাইয়ে পড়ল পুলে, পরমুহূর্তে উধাও হয়ে গেল পানির নিচে।

পুলের ধারে বসে আছে জনা আস্টেক লোক, ঘোর লেগে গেছে তাদের চোখে। মোটাসোটা সবাই, তাল তাল চর্বি শরীরের এখানে-সেখানে, পরনে বেদিংস্যুট। কারও হাতে জ্বলন্ত সিগার, কেউ টানছে দামি সিগারেট, কেউ আবার ভদ্রতাবোধকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে সোজা বসে গেছে মদের বোতল নিয়ে। না, মদ বলাটা ভুল হোল- এটা যেহেতু ওদের স্বর্গ, তাই শরাব বা সুরা বলাই উচিৎ।

সবাই ওরা সমাজপতি- অফিস আওয়ারে ডক্টর জেকিলের মত দুধে ধোওয়া তুলসি পাতা, আর অবকাশে মিস্টার হাইডের মত বেলেল্লা। আইনকে ওরা নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে; কখনও বেচে, কখনও কেনে। আবার কখনও আদালতে হাজিরা দিয়ে চারিত্রিক শুদ্ধতার সনদ নেয়, বেসি দরকার হলে আইনসভায় নিজেদের সুবিধামত বিল পাস করায়। সবার সঙ্গেই বর্তমানে এক বা একাধিক নারী, তবে ওদের কেউই ওই যৌনদেবীর মত মোহময়ী নয়; ওরা কে কার চেয়ে কত কম কাপড় পরবে অথবা কত বেশি সাজবে সে- প্রতিযোগিতা দেখলে অনুমান করা জেতে পারে, ওরা কেউই সমাজপতিদের স্ত্রী নয়।

দ্বীপশহরে এই ম্যানসন আসলে একটা বাগানবাড়ি, আর এখানে এখন অবসর বিনোদনের নামে চলছে নির্ভেজাল ভোগলালসার চর্চা। চলছে রাজনীতি, অর্থনীতি আর যৌনতার আলোচনা, সেই সঙ্গে চলছে অমুক কারনে তমুক খেতাব পাওয়া ডক্টর জেকিলরূপী মিস্টার হাইডদের শ্রাব্য-অশ্রাব্য খিস্তিখেউর।

চওড়া চোয়াল আর থলথলে গালওয়ালা জনৈক সমাজপতি খিলখিল করে হেসে উঠল হঠাৎ, পুলপারের মার্বেলে-বাঁধানো মেঝেতে নিজের পাছাটা ঘষতে ঘষতে এগিয়ে এসে দু'পা ডুবিয়ে দিল পানিতে, হাতের বোতলটা উপুড় করে অবশিষ্ট সুরা "উৎসর্গ" করল যৌনদেবীকে। সুর করে কিছু একটা বলছে সে, সম্ভবত প্রেমের গান গাইছে, সেটা কার উদ্দেশে টা বুঝতে পারার কথা একজন মূর্খেরও।

এই আমোদফুর্তি স্পর্শ করেনি পাহাড়ের উপরের লোকটাকে, করার কথাও না। এম-সিক্সটিনের টেলিস্কোপিক সাইটটা একটু সরিয়েছে সে, কারণ ম্যানসনের ডোরওয়ে পেরিয়ে উঠানে আবির্ভাব ঘটেছে লম্বাচওড়া আর শক্তপোক্ত এক লোকের, দেখলে মনে হয় এই লোক মেজবান। চেহারানকশা দেখলে আরও মনে হয়, লোকটা ইটালিয়ান। কি চলছে পুলের ধারে দেখল সে একনজর, তারপর প্রফুল্ল চিত্তে এগিয়ে গেল আরও খানিকটা। হেসে হেসে কথা বলছে সবার সঙ্গে, কারও কোনওকিছু লাগবে কি না জানতে চাইছে সম্ভবত। নিজেদের মধ্যে হাসিতামাশার মুডে ছিল সমাজপতিরা, ইটালিয়ান "পালোয়ানকে" দেখে কিছুটা হলেও ভাবান্তর এসেছে ওদের মধ্যে।

ভুসস্ করে পানির নিচ থেকে ভেসে উঠল যৌনদেবী, অদ্ভুত একটা আলোড়ন দেখা দিল পুলের আশেপাশে। খুশিতে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে পুরুষদের কেউ কেউ, কেই আবার মুখের ভিতরে দু'আঙুল ঢুকিয়ে শিস দিচ্ছে, কামকাতর কুকুরকে নকল

করে ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়ছে কেউ। ওদিকে মহিলারা জ্বলে-পুড়ে মরছে ঈর্ষার আগুনে।

'ব্যস, এটুকুই, বেবি?' গলা ফাটাল এক লোক। 'আরও দেখতে চাই আমরা, আরও! পুরোটা!'

'আরে, আমার কলিজাটা!' সুর মেলাল আরেকজন। 'এদিকে আয়!'

'চমৎকার! খাসা!'

এত প্রশংসার কারণ, উধাও হয়ে গেছে যৌনদেবীর বিকিনির টপ, বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত, নাকি স্রেফ দুর্ঘটনা। তবে টপ "খুলে যাওয়ায়" মোটেও দুঃখিত নয় যৌনদেবী, কারণ বেসবল মাঠে প্রিয় দল জিতলে সমর্থকরা যে-ভঙ্গিতে দলের পতাকা নাড়ে, টপটা ঠিক সে-ভঙ্গিতে নাচাচ্ছে সে। 'এসো সবাই!' চিৎকার করে আহ্বান জানাল, 'যার যার কাপড় খুলে ফেলি! কী দরকার এসব বাড়তি ঝামেলার?'

'টপ্‌টা পর্‌ বলছি,' সপ্তমে চড়েছে ইটালিয়ান পালোয়ানের গলা, তর্জনী তাক করে তেড়ে আসছে সে পুলের দিকে, বোঝা গেল যৌনদেবী সম্পর্কে কিছু একটা হয় তার। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল অভ্যাগতদের দিকে, 'আরে! আপনাদের কী হলো হঠাৎ, বলুন তো? আমার দিকে তাকান সবাই! ওই ডাইনির ওপর থেকে চোখ সরান! যদি কাউকে দেখেছি আর একটাবার ওর দিকে তাকাতে, খাবলে চোখ তুলে নেব!'

হাসির রোল উঠল পুলের ধারে। পুরুষরা তো বটেই, মহিলারাও মজা পেয়ে হাসছে এখন।

হাসতে হাসতে ঘাড় ঘুরাল পুরুষরা ঠিকই, কিন্তু ওদের আড়চোখ আটকে আছে যৌনদেবীর ওপর, আসলে দেবীর শরীরের বিশেষ একটা অংশের ওপর।

বোঝা গেল পালোয়ানকে ভীষণ ভয় পায় মহিলা, কারণ

হুমকি শোনামাত্র “পতাকা” নাচানো বন্ধ করেছে, জায়গামত পরে নিয়েছে টপটা।

বিকেলের সূর্য তখন প্রতিফলিত হচ্ছে এম-সিক্সটিনের নলে, কারণ সেটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখছে লোকটা। কিন্তু আলোর এই ঝলকানি দেখার সময় নেই ম্যানসনের কারোরই--পুলপারে যে-নাটক চলছে তা দেখা যায় না হরহামেশা। ব্যাগের ভিতর থেকে কিছু একটা বের করে সেটার সঙ্গের কর্ড ধরে টান দিল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল জিনিসটা থেকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা ছুঁড়ে মারল সে সর্বশক্তিতে। উড়ে গিয়ে পুলে, যৌনদেবীর থেকে এক হাত তফাতে পড়ল সেটা। ভয়ে আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল দেবী।

জিনিসটাকে উড়ে আসতে দেখেছে সমাজপতিদের কেউ কেউ, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা। এতক্ষণে বোঝা গেল ওদের কারও সিগারকেসের পাশে, কারও সিগারেটের বাক্সের নীচে, আবার কারও সুরার বোতলের পেছনে হ্যাণ্ডগান ছিল; উবু হয়ে যার যার অস্ত্র তুলে নিচ্ছে ওরা।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

ফুল অটোমেটিক মোডে বুলেট উগরাতে শুরু করেছে এম-সিক্সটিন। ছিটকে ছিটকে উঠছে পুলের পানি, চুরমার হয়ে যাচ্ছে ম্যানসনের জানালার কাঁচ।

পুলে পা ডোবানো সেই সমাজপতি বুকে বুলেটের একাধিক গর্ত নিয়ে এবার শরীরটাও ডুবিয়ে দিল পানিতে, তবে নড়ছে না একটুও।

লাল হয়ে উঠছে যৌনদেবীর আশপাশের পানি, আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে সাহায্যের আশায়, কিন্তু একটু আগেও যারা চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল ওকে তারা এখন ফিরেও তাকাচ্ছে না ওর দিকে।

তলপেটে গুলি খেয়ে পড়ে গেছে এক সমাজপতি, তার নিচে চাপা পড়েছে নাইন মিলিমিটার; তীব্র ব্যথায় নড়তে পারছে না সে, তাই উদ্ধার করতে পারছে না আগ্নেয়াস্ত্র, জুৎসই জবাব দিতে পারছে না পাহাড়ের লোকটাকে।

'শুয়ে পড়ুন সবাই! কভার নিন!' উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে বটে, কিন্তু ভয়ে পাগলপারা হয়ে গেছে ইটালিয়ান পালোয়ান নিজেই, বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ার জন্য ছুট লাগিয়েছে প্রাণপণে। কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতেই মুখ থুবড়ে পড়তে হলো তাকে, কারণ প্রথমে ওর পিঠে, পরে ফুসফুস ছিদ্র করে দিয়ে বেরিয়ে গেল তিনটা বুলেট।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে ছিটকে উঠল পুরো পুলের পানি—বিস্ফোরিত হয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটা, শুনে মনে হোল ডেপথ চার্জার ফেটেছে যেন। ম্যানসনের যে-জানালাগুলোর কাঁচ এম-সিক্সটিনের বুলেটে ভাঙেনি, সেগুলোও চুরমার হয়ে গেল এবার।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে যৌনদেবীর শরীর, শান্ত হতে থাকা পানিতে এখন কাগজের নৌকার মত ভাসছে ওর সেই টপ। আস্তে আস্তে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা গ্রাস করে নিচ্ছে ম্যানসনটাকে। ফুরিয়ে যাচ্ছে বিকেল, ছোপ ছোপ লালিমা লাগতে শুরু করেছে পশ্চিমের মেঘে।

হাতঘড়ি দেখল পাহাড়ের লোকটা, দ্রুত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে এম-সিক্সটিনটাকে বিচ্ছিন্ন করে ভরে ফেলল ব্যাগে, তারপর ব্যাগটা নিয়ে পিছলে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। পাহাড়ের গায়ে ধুলো উঠছে ওর শরীরের ঘষায়।

রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা মোটরসাইকেলের কাছে যত জলদি সম্ভব পৌঁছাতে হবে ওকে।

আট

টিভি সেটের পাশ থেকে ফ্রেমে বাঁধানো ক্যাভিস হ্যারিংটনের ফটোগ্রাফটা তুলে নিল রানা, দেখল কিছুক্ষণ। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে আড়চোখে তাকাল টিভি স্ক্রিনের দিকে। হেইডনকে দেখা যাচ্ছে। আলিশান একটা ম্যানসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে বডিগার্ডদের মত ঘিরে আছে আরও ৯জন ডিটেকটিভ, উর্দিপরা পুলিশ অফিসারও দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকজন। এদের সবাইকে ছেঁকে ধরেছে একদল প্রেসকর্মী আর টেলিভিশন রিপোর্টার।

'এভাবে আর কত লেফটেন্যান্ট?' সুযোগ পেয়ে হাতের মাইক্রোফোনটা হেইডনের মুখের কাছে নিয়ে গেল এক রিপোর্টার, পারলে ওটা ঢুকিয়ে দেয় হেইডনের মুখ দিয়ে। 'আন্ডারওয়ার্ল্ডের কাছে কি জিম্মি হয়ে আছে লস অ্যান্জেলেস?'

'এ মুহূর্তে বলার মত কিছু নেই আমার' ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোফোনটা সরিয়ে দিয়ে হেইডন হাটতে উদ্যত হয়েছে।

চিনির খণ্ড পেলে পিঁপড়া যেভাবে যেমন করে, তেমন করে হাজির হয়েছে তাই—এত সহজে হেইডনকে ছাড়তে চাইবে কেন রিপোর্টাররা? কাজেই সে নড়বার মত জায়গা পেল না, এই সুযোগে আবার প্রশ্ন করলো ওরা। 'গ্যাংওয়ার শুরু হয়েছে কি না লস অ্যান্জেলেসে?' জানতে চাইল আরেকজন।

ফুটন্ত তেলে পানি পড়লে যেমন ছ্যাঁত করে তেমনি 'গ্যাংওয়ার?' খেঁকিয়ে উঠল হেইডন। কি বলতে চাইছেন আপনি? এটা শিকাগো না মিস্টার-- লস অ্যান্জেলেস, বলে চলে যাওয়ার জন্য।

আবারও পা বাড়াল সে, সামনে আরেক রিপোর্টারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াতে হলো আবারও।

'স্যর, গেল বছর পনেরো শ'র মত খুন হয়েছে আপনার শহরে। এ-বছর এখন পর্যন্ত আট শ'র মত। এ-ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য?'

জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হেইডন, দাঁতে দাঁত পিষল। ঠিক সে-মুহূর্তে যুম করা হলো ওর চেহারায়, ওর দাঁত কিড়মিড়ানি স্পষ্ট দেখা গেল তাই। একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল কাছ দিয়ে, ব্যাপার কী দেখার জন্য নিজের ঘাড়ের পাশাপাশি ক্যামেরাও ঘুরিয়ে ফেলল ক্যামেরাম্যান, তাই স্ক্রীন থেকে উধাও হয়ে গেল হেইডন।

অনতিদূরের একটা পাহাড়ের দিকে উড়ে যাচ্ছে পুলিশ-হেলিকপ্টারটা ধীর গতিতে।

ক্যামেরা যখন আবার ফিরে এল হেইডনের ওপর, ততক্ষণে বান মাছের মত পিছলে বেরিয়ে গেছে সে সাংবাদিকদের ঘেরাও থেকে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের গাড়ির দিকে। যে-চ্যানেলটা লাইভ দেখাচ্ছে ওকে, সে-চ্যানেলের রিপোর্টার তখনও মাইক্রোফোন হাতে লেগে আছে ওর পেছনে কাঁঠালের আঠার মত। লোকটাকে বলতে শোনা গেল, 'লেফটেন্যান্ট, কী মনে হয় আপনার, এই সিরিয়াল কিলিং-এর পেছনে কি কোনও মাফিয়ার হাত আছে?'

গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছে হেইডন, ভেতরে উঠে পড়বে এখনই। প্রশ্নটা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে, আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। অনুত্তেজিত গলায় বলল, 'আজকের পর থেকে আর কোনও বম ফাটবে না কোনও সুইমিংপুলে। আজকের পর থেকে এত জঘন্যভাবে এতগুলো লোক একসাথে মারা পড়বে না লস অ্যাঞ্জেলেসের কোথাও। এ-মুহূর্তে শুধু এটুকুই বলার আছে

আমার,' আর দেরি করল না, ঢুকে পড়ল গাড়িতে, দ্রুত হাতে সিটবেল্ট বেঁধে চলে গেল গাড়ি চালিয়ে।

রিমোট চেপে টিভি বন্ধ করে দিল রানা। হাতে ধরা ফ্রেমটা আগের জায়গায় নামিয়ে রাখার আগে আরেকবার দেখল ছবির ক্যাভিস হ্যারিংটনকে। তারপর তাকাল হ্যারিংটনের তিন সন্তানের দিকে।

এরা ছবি না, জীবন্ত। পিঠাপিঠি। বড়টার বয়স ছয় কি বেশি হলে সাত। ওরা দাঁড়িয়ে আছে রানার বাঁ পাশে, বেডরুমের দরজার আড়ালে। একটু পর পর উঁকি দিয়ে কিছুটা ভয়মেশানো আর কিছুটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। দেখছে, অচেনা কিন্তু বাবার মতই ইউনিফর্ম পরা একটা লোক হাজির হয়েছে ওদের দু'রুমের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টটাতে, হেঁটে বেড়াচ্ছে সবখানে, এটা-সেটা দেখছে আগ্রহ নিয়ে, নিচু গলায় কী সব বলছে আপন মনে; মাঝেমধ্যে টুকটাক কথা বলছে ওদের মা'র সঙ্গে।

কিচেনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সারা রোযডেন--নিজের কুমারী নামটা আবার ধারণ করেছে, ক্যাভিস হ্যারিংটনের ভাষ্যমতে অপারেশন করে সেপারেশন নেয়ার পর। ওর হাতের ট্রে-তে একটা কফিপট, দুটো সুদৃশ্য মগ আর একটা প্ল্যাটারে ঘরে বানানো কয়েকটা বিস্কিট। বাস্তব জীবনের কঠোরতার কিছুটা ছাপ পড়েছে মহিলার সাদাসিধে চেহারাতে, তারপরও বেশ আকর্ষণীয় সে। তবে কিছুটা আড়ষ্ট। বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ। মাকে দেখে বাচ্চা তিনটের ভয় দূর হলো কিছুটা, কৌতূহল বাড়ল আরও, তাই দরজার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। ওদেরকে দেখে মুচকি হাসল সারা; ঘরের একমাত্র সোফার সামনে, ছোট একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল হাতের ট্রে। তারপর কফিপট থেকে মগ দুটোতে আগুনগরম কফি ঢালল রানা ও নিজের জন্য।

সারাকে দেখছে রানা। বাসায় সাধারণত যে ধরনের কাপড় পরে মহিলারা, সে-রকম কিছু পরেনি সে; বরং দেখে মনে হচ্ছে বাইরে কোথাও যাবে। সময় নিয়ে হালকা সেজেছেও। লম্বা একটা কাঁটা দিয়ে যেভাবে দীঘল সোনালি চুল আটকিয়েছে, তার ফলে চুলগুলো ঠিকমত বাঁধাও পড়েনি, আবার খুলে ছড়িয়েও যাচ্ছে না। একটুখানি পাউডারও বোধহয় ঘষেছে গালে-কপালে-নাকে।

'বসুন', সারার এক চিলতে হাসিটা বিদ্যায় নেইনি, 'কফি নিন'।

এগিয়ে এসে বসল রানা। কফির মগটা তুলে নিল, কিন্তু চুমুক দিল না। এত গরম কফি খায় না ও। একটা বিস্কিট তুলে কামড় দিয়ে বলল, 'দারুন তো' ঘরে বানানো?'

আন্তরিক প্রশংসা শুনে আড়ষ্টতা কেটে গেল মহিলার।

'হ্যাঁ, ঘরেই...' পায়ে পায়ে মা'র কাছে এসে হাজির হয়েছে বাচ্চাগুলো, ওদের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সারা।

শার্টের কলারের একটা কোনা মুখে পুরে চুষছে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা, ওর দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'মিস্টার হ্যারিংটনের সঙ্গে ঠিক কি সমস্যা হয়েছিল আপনার, বলা যাবে?'

হাসিটা বিদায় নিল সারার চেহারা থেকে। ড্রইংরুমের আলোটা তেমন উজ্জ্বল নয়, তারপরও বোঝা গেল সারার চেয়ালদুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, চিকন ঠোঁটদুটো কাঁপছে অল্প অল্প। 'বাচ্চাদের সামনে এসব নিয়ে...' নিচু গলায় কথাটা বলে চুপ হয়ে গেল।

'তার মানে কি ডিভোর্স হয়ে গেছে আপনাদের?'

'না, ঠিক ডিভোর্স নয়।'

'তা হলে?'

'আমরা আসলে... যাকে বলে... আলাদা থাকছি।'

চুপ করে আছে রানা, মনে হচ্ছে আরও কিছু বলার আছে সারার।

ওর অনুমান ঠিক হোল। 'এ-ই ভালো একদিক দিয়ে', নিখাদ তিক্ততা সারার কণ্ঠে, 'যার যার মত সে সে থাকো। কেউ কারও ধার ধেরো না। দুজনেই স্বাধীন।'

'মিস্টার হ্যারিংটন কি বাচ্চাদের জন্যও কোনও খরচপাতি দেন না?'

'একটা পয়সাও না। আমাদের চারজনের পেত একাই চালাতে হয় আমাকে।'

'কি করছেন আপনি এখন?'

'আমার এখানে আসার সময় রাস্তার ধারের বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা দেখেছেন না? ওটার ক্যাশ কাউন্টারের সামনে প্রতিদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি ঝাড়া আট ঘণ্টা, কখনও কখনও ওভারটাইমও করতে হয়। লোকে কেনাকাটা সেরে মানিব্যাগ থেকে টাকা বা ক্রেডিট কার্ড বের করে ছুঁড়ে মারে, তাদের বিল করি আমি। ওয়ার্কিং আওয়ারে যদি পান থেকে চুন খসে, বেতন কাটে মালিক।'

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা দেখেছে রানা। এখানে আসার আগে টুকটাক কিছু কেনাকাটা আছে বলে ওই স্টোরের কাছে নেমে গেছে শায়লা। তাই রানাকে একাই আসতে হয়েছে সারার বাসায়।

'আপনি কাজে গেলে বাচ্চাদের দেখে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বড়টাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। আমাদের স্টোরের সাথেই একটা ডে কেয়ার সেন্টার আছে, ছোট দুটো সেখানে থাকে। স্কুল ছুটির পর বড়টাও চলে আসে ওখানে। আমার ডিউটি শেষ হলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরি।'

‘মিস্টার হ্যারিংটনের সঙ্গে ইদানীং দেখা হয়েছে আপনার?’

পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা খেলনা দমকলগাড়ি তুলে নিল সারা। যখন সিধে হলো, দেখা গেল করুণ হাসি ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। ‘আরেকটু কফি খাবেন?’

‘আগেরটুকুই তো শেষ করতে পারলাম না।’

মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সারা। ‘ক্যাভিসের ব্যাপারে কিছু বলাটা আসলে আমার জন্যে কঠিন।’

‘বুঝতে পারছি।’ মাথা ঝাঁকাল রানা।

‘তারপরও বলব...যতটুকু না-বললেই নয়। কারণ দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন আপনি, আর আমার দায়িত্ব আপনাকে সাহায্য করা।’ লম্বা করে দম নিল সারা। ‘কাল রাতে এখানে এসেছিল ক্যাভিস।’

‘কাল রাতে?’ আশ্চর্য হয়েছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল সারা। ‘হঠাৎ করেই ফোন করল আমাকে, বলল, বাচ্চাদের দেখতে চায়। আমি হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই লাইন কেটে দিল। এখানে এল একটু রাত করেই, বাচ্চারা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।’

‘তারপর?’

‘তারপর...’ হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সারা। ‘ঘরে ঢুকে...’

কফি খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেছে, তাই মগটা নামিয়ে রাখল রানা টেবিলের ওপর। ‘বুঝতে পারছি।’

‘কিন্তু ওর যা উদ্দেশ্য ছিল তা চরিতার্থ করতে পারেনি শেষপর্যন্ত,’ আড়চোখে বাচ্চাদেরকে দেখে নিয়ে ধরা গলায় বলল সারা। ‘চরিতার্থ করতে দেব কেন আমি? সেপারেশন মানে সেপারেশন। সেপারেশন মানে তো আর টিনএজার প্রেমিক-প্রেমিকার মান-অভিমানের খেলা নয়।’

চুপ করে আছে রানা।

'ব্যর্থ হয়ে সে কী করল তখন, জানেন?' কিছুক্ষণ পর ধরা গলায় বলল সারা।

'কী?'

'জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করল,' বিষণ্নতার গাঢ় ছাপ পড়েছে সারার চেহারায়, এবং সে-কারণে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ওকে। ঘাড়ের ওপর নেমে আসা একগাছি চুল নাড়াচাড়া করেছে আনমনে।

'জানালা দিয়ে লাফ দেয়ার চেষ্টা করেছে!' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। লোকটার ডোশিয়ে মন দিয়ে পড়েছে সে।

মাথা ঝাঁকাল সারা।

'ঠিক কী ঘটেছিল?'

কান্না চেপে রাখার জোর চেষ্টায় দুই ঠোঁট কাঁপছে সারার। 'ঠিক কী যে ঘটেছিল, আমিও নিশ্চিত না। প্রথম থেকেই খুব আপসেট মনে হচ্ছিল ওকে। তারপর...আই মিন...আমার সঙ্গে যখন জোরাজুরি করল...মনে হচ্ছিল বিফল হয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ করেই ছুটে গেল জানালার দিকে। ও কী করতে যাচ্ছে টের পেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল বাচ্চাদের, বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ততক্ষণে জানালা দিয়ে কোমর পর্যন্ত বের করে দিয়েছে ক্যাভিস। দেখামাত্র বাবাকে চিনতে পারল বাচ্চারা, এবং যে-অবস্থায় দেখল, তাতে ঘাবড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল তিনজনই। তখন মনে হলো হুঁশ কিছুটা হলেও ফিরল ক্যাভিসের, সামলে নিল নিজেকে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল আমাদের দিকে। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আর একটি কথা না বলে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

'আপনার সঙ্গে কি অন্য কোনও বিষয়ে কথা হয়েছিল মিস্টার

হ্যারিংটনের?'

'টুকটাক। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। তবে...'

'তবে?'

'একটা বিষয় একাধিকবার উল্লেখ করেছে ও গতরাতে। এবং খুব গুরুত্বের সঙ্গেই বলেছে।'

'কী?'

'বলেছে, এ-শহরের ক্রিমিনালরা বেপরোয়া হয়ে গেছে। কারণ ওদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কিছুই নাকি করতে পারছে না আইন-আদালত। ক্যাভিস ভাবছে, যারা আইন তৈরি করে তারাই নাকি ব্যাকআপ দিচ্ছে ক্রিমিনালদের, এবং সে-কারণেই আজ এই অবস্থা। ক'দিন আগে এক গ্যাংস্টারকে খুন করা হয়েছে হাইওয়েতে...কী যেন নাম লোকটার...মনে করতে পারছি না...'

'মার্টিন বেকার।'

'হ্যাঁ...মিস্টার বেকার। ক্যাভিস বলছিল, যে বা যারাই খুন করে থাকুক, দারুণ কাজ করেছে, দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ডটার জন্য পদক দেয়া উচিত খুনিদেরকে। গত এক বছরের মধ্যে যত খুন হয়েছে, ওটাই নাকি সেরা। ...কথাগুলো যখন বলছিল ও, বিশ্বাস করুন, মনে পড়লেও শিউরে উঠি, জ্বলজ্বল করছিল ওর দু'চোখ। অদ্ভুত কিছু একটা দেখেছি আমি সেখানে। কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও, দম নিচ্ছিল ঘন ঘন।'

'তিনি যখন জানালার কাছে যাচ্ছিলেন, বাধা দেননি?'

'আমার যে তখন কী অবস্থা, মিস্টার রানা, বলে বোঝাতে পারব না আসলে। আমার জায়গায় আপনি থাকলে হয়তো বুঝতে পারতেন। ওকে ছুটে যেতে দেখে ভেবেছি, পরাজয় মেনে নিতে না পেরে বোধহয় সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। কিন্তু ও-রকম একটা কাণ্ড যে করে বসবে...' চোখের পানি মুছল সারা।

'জানেন, বাচ্চারা পরে কী জিজ্ঞেস করেছে আমাকে?'

'কী?'

'জিজ্ঞেস করেছে, ও-রকম কেন করছিল ওদের বাবা। জবাবে আমি কী বলেছি, জানেন? বলেছি, ওদেরকে মজা দেয়ার জন্য নতুন একটা খেলা খেলছিল।'

'আপনার চিৎকার শুনে আশপাশের অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে কেউ আসেনি?'

'এসেছিল দু'-চারজন। আসলে কার এত ঠেকা পড়েছে যে, রাতের ঘুম বাদ দিয়ে জামাই-বউয়ের...তা-ও আবার সেপারেশন হওয়া...ঝগড়া থামাতে আসবে? ...যারা এসেছিল তারা জানতে চাচ্ছিল কী ঘটেছে। ক্যাভিসের কাণ্ডটা বলতে বাধ্য হয়েছি তখন। সঙ্গে এ-ও বলেছি, প্রচণ্ড মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভুগছে ও। আরেকটা কথা বাড়িয়ে বলেছি--ডাক্তার দেখাচ্ছে নিয়মিত, ওষুধও খাচ্ছে, সেরে যেতে বেশি সময় লাগবে না।'

'এখন কোথায় থাকেন মিস্টার হ্যারিংটন, জানেন?'

রানার প্রশ্নটা শোনামাত্র সারার সমস্ত কষ্ট যেন নিমিষে পরিণত হলো অবদমিত ক্রোধে। 'না, জানি না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, 'এবং জানতে চাইও না।'

রানার চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি দেখে নিজেকে সামলে নিল।

'ক্যাভিস হ্যারিংটন আসলে গুরুতর অসুস্থ একটা মানুষ, মানসিকভাবে। এবং আমার ধারণা, ওর অসুখটা বাড়তে বাড়তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এ-রকম একটা লোককে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখতে দেয়াটা উচিত না। আপনাদের জায়গায় আমি থাকলে রাখতে দিতাম না।'

কিন্তু সে-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না করে রানা বলল, 'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, মিস্টার হ্যারিংটন কোথায় থাকেন, জানেন আপনি।'

মেঝের দিকে তাকাল সারা, মাথা নাড়ল, উত্তরটা এড়াতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে বুঝিয়ে দিল রানার অনুমান ঠিক। খুব নিচু গলায়, শোনা যায় কি যায় না এমন ভঙ্গিতে বলল, 'নর্থ হিলে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে নিজের জন্য, শুনেছি ওখানেই নাকি থাকে।'

আরেক দফা আশ্চর্য হলো রানা। 'এটা কি গোপন করার মত কিছু?'

রানার দিকে তাকাল সারা, চোখে অদ্ভুত দ্যুতি। 'যে-লোকের সঙ্গে এখনও আমার বৈবাহিক সম্পর্ক আছে, অথচ একসঙ্গে বাস করার উপায় নেই; যে লোকের প্রচণ্ড রাগ আর হতাশার কারণে তার সঙ্গে শান্তিতে দুটো কথা বলারও উপায় নেই, যে-লোকের জঘন্যতম শারীরিক চাহিদাকে বিকৃত বললেও অনেক কম বলা হয়, যদি জানতে পারি সে লোক কোনও ন্যুড ড্যান্সারকে নিয়ে থাকে...তা হলে কী করে কথাটা বলব মানুষের কাছে?'

জবাব দিল না রানা।

ওকে চমকে দিয়ে হঠাৎ করেই হাসতে শুরু করল সারা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত। তারপর একসময় আচমকা থেমে গেল হাসিটা। আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, 'জানেন, সব মেনে নিয়েছি আমি। সব। কারণ মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই আমার। বাঁচতে হবে আমাকে। যদি আমি মরি, আমার তিনটে বাচ্চাও মরবে। ঈশ্বরের দুনিয়ায় ওদেরকে দেখার কেউ নেই।'

সান্ত্বনা জানাল না রানা, কারণ কখনও কখনও সান্ত্বনা জানানো উপহাস করার সমান। ঘাড় ঘুরাল ও, আরও একবার তাকাল ক্যাভিস হ্যারিংটনের ছবিটার দিকে। লোকটার বিরুদ্ধে অনেক অভিমান সারার, অনেক অভিযোগ, তারপরও ওকে ভুলতে পারেনি--ফ্রেমে বাঁধাই করে একটা ছবি রেখে দিয়েছে নিভৃতে।

নীরবতা।

ওরা কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না হয়তো। হাই তুলছে বাচ্চারা, এমনকী বড়টাও; বোঝা যাচ্ছে ডিনারের পর বেশিক্ষণ জেগে থাকার অভ্যাস নেই ওদের।

এস.এম.এস. আসার আওয়াজ শোনা গেল সারার মোবাইল ফোনে। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে মেসেজটা পড়ল সে।

প্রথমে কালো হয়ে গেল ওর চেহারা, তারপর আস্তে আস্তে খুশির ঝিলিক দেখা দিল চোখেমুখে। মোবাইল ফোনটা যখন রেখে দিচ্ছে, তখন রীতিমত দাঁত দেখা যাচ্ছে ওর।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডাকাত পড়েছে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে,' জোর করে হাসি চাপল সারা, 'আমার এক কলিগ, আজ রাতে যার শিফটিং ডিউটি আছে, মেসেজ পাঠিয়েছে।'

চট করে উঠে দাঁড়াল রানা--শায়লা আছে ওখানে। 'এটা কি খুশি হওয়ার মত কোনও খবর?' বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'খুশি হব না?' এমনভাবে বলল সারা যেন আশ্চর্য হয়েছে। 'যখন-তখন ক্যাশ কাউন্টারে এসে হাজির হয় মালিক, আমরা মেয়েরা যারা কাজ করি সেখানে তাদের শরীর চোখ দিয়ে চাটতে থাকে তদারক করার নামে। ইচ্ছামত বেতন কাটে, যেদিন খুশি লাগে সেদিন বেতন দেয়, কিছু বলতে গেলেই দেয় চাকরি খাওয়ার হুমকি। আর ব্যবহার? আগের দিনের দাসব্যবসায়ীরাও নিগ্রোদের সঙ্গে ও-রকম আচরণ করত কি না সন্দেহ। কাজেই ওর দোকানে ডাকাত পড়লে বুক চাপড়ে আহাজারি করবে কে, বলুন?'

সারার দিকে তাকাল রানা। 'তারমানে স্টোরের কেউ নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন দেবে না?'

'মালিক ছাড়া আর কারও দেয়ার তো কথা না।'

যা বুঝবার ছিল তা বোঝা হয়ে গেছে, এমন ঢঙে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সবচেয়ে কাছের পুলিশ অফিসার যেহেতু আমিই, এবং সবার আগে খবরটা যেহেতু আমিই জানতে পেরেছি, কিছু একটা করা আমারই দায়িত্ব। ...আসি।' দেরি না-করে সারার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে চলে এল।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নামতে নামতে চেক করে নিল নিজের ওয়ালথারটা।

নয়

ইচ্ছা করেই গাড়ি নিল না রানা, বরং রাস্তায় বেরিয়ে এসে একদৌড়ে হাজির হলো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটার কাছে। একনজর তাকিয়েই বুঝতে পারল, এটাকে আসলে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর না বলে ডিসকাউন্ট স্টোর বলাই ভালো। বিভিন্ন পণ্যের মূল্যছাড় চলছে জানিয়ে বড় একটা নোটিস টানানো হয়েছে স্টোরের সামনে, কোন্ পণ্যতে কত ছাড় দেয়া হচ্ছে তা-ও জানানো হচ্ছে।

সরু একটা গলি ধরে স্টোরটার পেছনে, লোডিং এরিয়াতে চলে এল ও। এখানে একটা ব্যাকডোর দেখা যাচ্ছে। দ্রুত পায়ে স্টোরেজ কোয়ার্টার্স পার হয়ে এল, দ্বিতীয় আরেকটা দরজা খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দেখে মনে হচ্ছে স্টোরের সেলস এরিয়াতে হাজির হয়েছে।

অনতিদূরে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচু একটা

কাউন্টারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে এক লোক; চেহারায় একরাশ উদ্বেগ, মনে হচ্ছে সে-ই স্টোরের মালিক। কী কারণে যেন ঘুরে তাকাল লোকটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ওর পরনে স্টক বয় জ্যাকেট, কলারটা তুলে দিয়েছে। তাল তাল চর্বিতে ঠাসা সারা শরীর। ঢিলেঢালা শার্টের একটা অংশ ইন করা, বাকিটা হাস্যকর ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে প্যান্টের বাইরে। তারচেয়েও হাস্যকর ভঙ্গিতে ঝোলানো টাই ধরে নাড়াচাড়া করছে অকারণেই।

স্টোরের মালিককে দেখামাত্র বিরক্তিতে ভরে গেছে রানার মন। আরও একটা কারণ আছে ওর বিরক্তির--ভেবেছিল ডাকাতির খবর পেয়ে স্টোরে হাজির হওয়া প্রথম পুলিশ অফিসার সে-ই, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরা আরেক অফিসার হাজির হয়ে গেছে ওর আগে, খেলনার মত দেখতে একটা ল্যুগারসহ পজিশনও নিয়ে ফেলেছে। লোকটাকে নিজের ব্যাজ দেখাল রানা।

ওটা দেখে মাথা ঝাঁকাল লোকটা--কী বুঝেছে কে জানে। রানাও মাথা ঝাঁকাল প্রত্যুত্তরে।

অফিসার যে-জায়গায় পজিশন নিয়েছে তার পেছনে একটা টু-ওয়ে আয়না দেখা যাচ্ছে। সেদিকে একবার তাকাল রানা, খুঁজছে শায়লাকে, কিন্তু দেখতে পেল না। অফিসারের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল ও।

'ম্যাগাযিন র‍্যাকের পাশে,' ফিসফিস করে জবাব দিল অফিসার।

যেদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, সেদিকে তাকাল রানা।

বেশ লম্বা, হালকাপাতলা আর মাথাভর্তি কালো চুলওয়ালা এক যুবককে দেখা যাচ্ছে, সারা চেহারায় রাজ্যের উৎকণ্ঠা। র‍্যাক থেকে বিভিন্ন ম্যাগাযিন নামাচ্ছে, কিন্তু ভালোমত দেখার বদলে

একটুখানি উল্টেপাল্টে দেখে রেখে দিচ্ছে সবগুলোই, চোরাচোখে বার বার তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক।

'কাহিনি কী?' ফিসফিস করল রানা।

'আগে একবার ডাকাতি হয়েছিল এই স্টোরে,' ফিসফিস করেই জবাব দিল অফিসারটা, 'তখন যে-ডাকাতরা এসেছিল, মালিকের ধারণা ওই ছোকরাও তাদের সঙ্গে ছিল। যদি তা-ই হয়, তা হলে...' বাকিটা না বলে চোখ টিপে বুঝিয়ে দিল।

'হুঁ,' টু-ওয়ে আয়নাটার ওপর চোখ রেখে একটু একটু করে সরে এল রানা, শত পদের ক্রোকারিয আইটেমে ঠাসা একটা র‍্যাকের পেছনে আড়াল করল নিজেকে। মোবাইল বের করে ফোন করবে নাকি শায়লাকে? সতর্ক করে দেবে ওকে? কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়? যদি আতঙ্কিত হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে মেয়েটা?

'তোমার কী ধারণা?' জানতে চাইল অফিসার।

'আমার?' শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে যা-ই নিক না কেন ওই ছোকরা, দাম দেবে না,' আবার চোখ রাখল আয়নায়, "সন্দেহভাজন" যুবককে দেখছে।

ডিনারের পর শপিং করতে এসেছে বেশ কিছু লোক, ওরা এখনও বেরিয়ে যায়নি স্টোর থেকে। কাজেই ভিড় মোটামুটি আছে বলা যায়। ঘাড়টা বকের মত উঁচু করল রানা সাবধানে, শরীরটাকে পাক খাওয়াল একটুখানি--স্টোরের সামনের জানালা থেকে শুরু করে বরাবর অনেকখানি দেখা যাচ্ছে এখন। কিন্তু সন্দেহ করার মত আর কাউকে পেল না রানা আয়নায়। সবচেয়ে কাছের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, বৈসাদৃশ্যটা চোখে পড়তে সময় লাগল না।

নো পার্কিং এরিয়াতে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি।

‘ওই গাড়িটা,’ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, ‘দেখেছ?’ মোবাইল বের করল পকেট থেকে, কোথায় আছে জানিয়ে খুদেবার্তা পাঠাল। চাচ্ছে স্টোরের ভেতরে যেখানেই থাকুক না কেন মেয়েটা, এখানে যেন চলে আসে।

ঘাড় ঘুরাল অফিসার, গাড়িটা দেখতে পেল, রানা কী বোঝাতে চেয়েছে বুঝতে পারছে স্পষ্ট। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর, আগের মতই ফিসফিস করে বলল, ‘মাই গড! তোমার দেখানোর আগেই ব্যাপারটা খেয়াল করা উচিত ছিল আমার। করলাম না কেন?’

উত্তরটা জানা নেই রানার, জানতে চায়ও না। ফিসফিস করে বলল, ‘ল্যুগারটা নিয়ে চলে যাও স্টোরের বাইরে। যদি কোনও কারণে ব্যর্থ হই আমরা, তোমার হাত গলে যেন পালাতে না পারে কেউ।’

উঠে চলে যাচ্ছিল অফিসার, নিচু গলায় যোগ করল রানা, ‘এটা ইমারজেন্সি সিচুয়েশন, কাজেই দয়া করে সেফটি ক্যাচটা অফ্ করো তোমার ল্যুগারের,’ অফিসারের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আয়নার দিকে তাকাল আবার।

নতুন কিন্তু খারাপ কিছু একটা ঘটছে কিংবা ঘটতে চলেছে স্টোরের ভেতরে। ম্যাগাযিন ঘাঁটাঘাঁটি শেষ যুবকের, অলস্ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে স্টোরের মেইনডোরের দিকে--হয়তো বেরিয়ে যাবে। একইসময় ভেতরে ঢুকল তিনজন লোক, নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়াই চোরাচোখে যুবকের দিকে তাকাল তিনজনই।

নতুন আসা তিনজনকে সতর্ক চোখে দেখছে রানা।

একজনকে দেখে মনে হচ্ছে ছোটবেলায় লম্বা হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এবং প্রথম হয়েছে, তাই পিঠটা কুঁজো করে হাঁটার পরও ওর উচ্চতা সাড়ে ছ'ফুট ছাড়িয়ে গেছে। পাকানো দড়ির মত বলিষ্ঠ শরীর লোকটার, কাঁধদুটো যথেষ্টর

চেয়ে বেশি চওড়া। দ্বিতীয়জন কোনওরকমে মাথা তুলতে পেরেছে লম্বুর পাঁজরের কাছাকাছি; সে যতটা না বেঁটে, গাট্টাগোট্টা শরীরের কারণে তারচেয়েও বেশি বেঁটে দেখায় ওকে। তৃতীয়জন মাঝারি উচ্চতার, একটা ওভারকোট পরেছে, এবং ডান হাতটা সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার পরও সেটা চেপে ধরেছে শরীরের সঙ্গে--আসলে শটগান বা ওই জাতীয় কিছু একটা আড়াল করতে চাচ্ছে।

মেইনডোরের কাছে পজিশন নিল গাট্টাগোট্টা, বাকি দু'জনের হাঁটার গতি ততক্ষণে দ্রুত হয়েছে। উঁচু কাউন্টারটার কাছে, মালিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে, পৌঁছাতে সময় লাগল না ওদের। বুড়োর কাছ থেকে বেশি দূরে দাঁড়িয়ে নেই শায়লা--দেখতে পেয়ে বুকের ভেতরে ধাক্কার মত লাগল রানার। পার্স থেকে মোবাইল বের করেছে মেয়েটা, রানার এস.এম.এস. পড়ছে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে এতক্ষণে।

ভোজবাজির মত হ্যাণ্ডগান বেরিয়ে এসেছে লম্বুর হাতে। ওদিকে শরীর থেকে "আলগা" হয়ে গেছে "ওভারকোটের" ডান হাত. বাঁ হাত দিয়ে একটানে একটা কাটা অটোমেটিক শটগান বের করেছে সে। অস্ত্রটা মালিকের বুকের দিকে তাক করে বলল, 'তোমার অনুমান সম্পূর্ণ ঠিক, আঙ্কেল। কিছু কিনতে আসিনি আমরা, তারপরও কিছু নিয়ে যেতে এসেছি। এবং যত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে পূরণ করতে পারবে আমাদের চাহিদা, তোমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।'

কাউন্টারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল এক মহিলা খদ্দের, কথাগুলো শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। একটা উদ্যত হ্যাণ্ডগান আর একটা কাটা শটগান দেখে নিজের অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে আসছিল মহিলার মুখ দিয়ে, ওর চাঁদিতে পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে ওকে অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল লম্বু। পড়ে যাচ্ছিল অচেতন দেহটা, হাত বাড়িয়ে মহিলাকে ধরে

ফেলল লম্বু, শুইয়ে দিল মেঝেতে।

আয়নায় শায়লার সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। মেয়েটাকে ইশারায় স্বাভাবিক থাকতে বলল ও। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের বুকে খোঁচা মারল কয়েকবার, বুঝিয়ে দিল যদি কিছু করার দরকার হয়, সে-ই করবে।

মেইনডোর আগলে দাঁড়ানো গাট্টাগোট্টা চাপা গলায় কিছু একটা বলল এমন সময়, ঠিক বুঝতে পারল না রানা। তবে কথাটা শুনে অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য দেখা দিল ক্রেতাদের মধ্যে, কারও কারও চেহারায় চাপা আতঙ্ক। যার যার জায়গায় স্রেফ জমে গেছে অনেকেই, কারণ কাটা শটগানটা বার বার এদিক-সেদিক তাক করছে ওভারকোট, এবং অস্ত্রটা নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে পারছে সফলভাবে।

মেঝেতে পড়ে থাকা মহিলাকে জোরে একটা লাথি মারল লম্বু, কোনও কারণ ছাড়াই। দৃশ্যটা দেখে নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হলো শায়লার, নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে ঘুরে গেল শটগান, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ওভারকোট, 'খবরদার, বিশ্বসুন্দরী, নোড়ো না! আমি যতবার ছ্যাঁকা খেয়েছি সুন্দরীদের কাছ থেকেই খেয়েছি, তাই তোমাদের ওপর এমনিতেই বিতৃষ্ণা আছে আমার। ওটা বাড়িয়ে দিয়ে মারা পোড়ো না বেঘোরে। পরে তোমার বয়ফ্রেণ্ড অভিশাপ দেবে আমাকে।' মালিকের দিকে তাকাল। 'আঙ্কেলের কি হার্টঅ্যাটাক হয়ে গেছে? নড়ছ না কেন? সাবধান, নড়তে গিয়ে কাউন্টারে তোমার যে-সিকিউরিটি অ্যালার্ম আছে সেটাতে হাত দিয়ে ফেলো না যেন। কাজটা যদি করো, তা হলে যিশুর কিরে, হাতটা একগুলিতে উড়িয়ে না দিলে আমি একবাপের ছেলে না।'

নিজের জায়গায় বরফের মত জমে গেছে শায়লা। ওদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে বুড়ো মালিক, জানে ডাকাতদের সময়

যত নষ্ট করতে পারবে তত লাভ ওর।

'বুঝেছি, মিষ্টি কথায় আক্কেলের চিঁড়ে ভিজবে না। জলদি করো! জানের মায়া নেই?'

অদ্ভুত কোনও অসুখে আক্রান্ত হলো মালিক এমন সময়, ভীষণ কাঁপতে শুরু করেছে হঠাৎ করে। একজন সেলসগার্ল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই, হতাশ চোখে মেয়েটাকে দেখল বুড়ো, ইশারায় সরে যেতে বলল।

মসৃণ পদক্ষেপে ওর কাছে গিয়ে হাজির হলো লম্বু, আবারও ভোজবাজি দেখিয়েছে--ভাঁজ খুলে বড় করা যায় এ-রকম একটা বস্তা দেখা যাচ্ছে ওর হাতে এখন।

'ক্যাশ কাউন্টারে একটা ডলারও যেন না থাকে,' বুড়োকে হুমকি দিল লম্বু।

ইতস্তত করছে বুড়ো, করারই কথা। সারাদিনের বিক্রি, নেহাত কম টাকা জমা হয়নি কাউন্টারে। ওর দ্বিধা দেখে আরেক পা আগে বাড়ল লম্বু, পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মারল ওর পাঁজরে।

ম্যাগাযিন র‍্যাকের কাছে এতক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিল এক টিনএজার, এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারল না আর, স্টোর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হঠাৎ দৌড় দিল মেইনডোরের উদ্দেশে। চমৎকার রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখিয়ে মুহূর্তের মধ্যে নড়ে উঠল ওভারকোট, শটগানটাকে কুড়ালের মত কাজে লাগিয়ে "কোপ" মারল টিনএজারের পায়ে, আর্তচিৎকার করে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল ছেলেটা। এগিয়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে ওকে দাঁড় করাল ওভারকোট, দেখা গেল ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে বেচারার।

ওর কানের কাছে মুখ নামাল ওভারকোট, দেখে মনে হচ্ছে ফিসফিস করে কিছু বলবে। কিন্তু না, স্টোরের অনেককেই চমকে

দিয়ে গলা ফাটাল লোকটা, 'পরপারে যেতে চাইলে বল্, ব্যবস্থা আছে আমার কাছে। কি, যাবি?'

জবাব দিল না ছেলেটা, প্রচণ্ড ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

ঘাম দেখা দিয়েছে বুড়োর চেহারায়, কিন্তু মুছবার সময় নেই ওর, কিংবা থাকলেও সাহস নেই। ক্যাশ কাউন্টারের চারটে ড্রয়ারই খুলে ফেলেছে, মুঠো মুঠো ডলার নিয়ে সমানে ভরছে লম্বুর দেয়া বস্তায়। কাজটা শেষ করে কোনওরকমে তাকাল লম্বুর চোখে, মিনমিন করে বলল, 'আর নেই।'

'আছে তো,' লম্বুর ঠোঁটের কোনায় জুলিয়েটের-দেখাপাওয়া-রোমিও'র হাসি।

কিছু বলছে না বুড়ো, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

'সিন্দুক,' বলে দিল লম্বু। 'আমরা জানি বেশ বড় একটা সিন্দুক আছে তোমার। সেটার ভেতরে কী আছে তা-ও বলে দিতে হবে?'

'আমার...আমার...কোনও সিন্দুক নেই,' জিনিসটা থাকুক বা থাকুক, বুড়োর গলায় যে জোর নেই সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

'শালা, শুয়োরের বাচ্চা!' মুখ খারাপ করল লম্বু। 'আমার সঙ্গে মামদোবাজি? সিন্দুক কই তোর?'

'যিশুর কিরে,' গলা ফাটাল বুড়ো, 'মা মেরির কসম...'

'এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব শালা!' বুড়োকে কথা শেষ করার সুযোগ দিল না লম্বু। 'এর মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবি তোর সিন্দুকের কাছে, আমার সামনে খুলবি সেটা, তারপর পুরো খালি করবি। যদি না করিস তা হলে আমার প্রথম বুলেটটা তোর শরীরের কোন্ জায়গা দিয়ে ঢুকবে জানিস? প্রকৃতি ডাকলে যে-জায়গা ব্যবহার করে কমোডে বসিস সেখান দিয়ে। ...এক।'

'বিশ্বাস করো...ভাই আমার, বাপ আমার, আমার কোনও...'

'দুই।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলছে বুড়ো, শোনা যাচ্ছে না--জীবনের সব পাপের জন্য বোধহয় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ঈশ্বরের কাছে।

'তিন।'

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে বুড়ো--শটগানের বুলেট ওর শরীরের যে-জায়গা দিয়েই ঢুকুক, দৃশ্যটা দেখতে চায় না।

কিন্তু ওকে গুলি করল না লম্বু। ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে লোকটার চেহারা, পিস্তল দিয়ে জোরে বাড়ি মারল বুড়োর চোয়ালে।

কালবৈশাখীর দাপটে ভেঙেপড়া গাছের মত পড়ে গেল বুড়ো মেঝেতে। কিন্তু আশ্চর্য, এত ব্যথায়ও কোনও আওয়াজ করল না।

শায়লার ওপর চোখ পড়ল লম্বুর, ওকে স্টোরের কর্মচারী ভাবল সে। 'এই যে, বিশ্বসুন্দরী, মুখটা যখন হাঁ করেছ, দয়া করে বলে দাও কোথায় আছে সিন্দুকটা।'

মুখ বন্ধ করল শায়লা।

রাগ বাড়ল লম্বুর। 'নিশ্চয়ই চাও না পিস্তলের একবাড়িতে নাকের হাড়টা ভেঙে দিয়ে কিংবা টসটসে ঠোঁটদুটো থেঁতলে দিয়ে তোমার সৌন্দর্যের বারোটা বাজাই? বলো, চাও? তা হলে চুপ করে আছ কেন?'

তবুও কথা নেই শায়লার মুখে।

অনুমানে দেখে নিল রানা কী ঘটতে চলেছে আর কয়েক মুহূর্ত পর।

অতি সন্তর্পণে, নিশাচর চিতাবাঘের মত, আড়াল ছেড়ে বের হলো ও; ওয়ালথারটা চুম্বকের মত সেঁটে আছে তালুর সঙ্গে।

একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে স্টোররুমের ভেতর দিয়ে।

'ও...' যা বুঝবার ছিল বুঝে গেছি এমন সুরে বলল লম্বু, 'বুড়ো বোধহয় তোমার ভাতার লাগে, না? সেজন্যে চুপ করে আছ, বলছ না কোথায় আছে সিন্দুকটা? সতী? ঠিক আছে, দেখাচ্ছি আমি সতী কাকে বলে। এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে আমার কাছে আসবে তুমি, সবার সামনে তোমাকে...' খিকখিক করে হেসে বাকি কথা বুঝিয়ে দিল। 'আর যদি না আসো, আমিই যাব তোমার কাছে। ...এক।'

ঠিক সে-মুহূর্তে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হলো মালিক। ওর কপাল আর নাকের সংযোগস্থলটা বিশ্রীভাবে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, ভেঙে যাওয়া চশমার কাঁচের দু'-একটা টুকরো বোধহয় ঢুকেছে ডান চোখে, কারণ চোখটা খুলতে পারছে না।

ঘা-ওয়ালা কুকুরের দিকে যেভাবে তাকায় লোকে, ওর দিকে সেভাবে তাকিয়ে লম্বু বলল, 'দুই।'

একছুটে এমন সময় স্টোররুম থেকে বের হলো রানা, চমকে উঠে ওর দিকে তাকাতে গিয়ে একটা মুহূর্ত নষ্ট করল লম্বু আর ওভারকোট, সেই সুযোগে ডাইভ দিল রানা। ফুটবলের মত ড্রপ খেয়ে প্লাস্টিকসামগ্রীতে ভরা একটা র‍্যাক পার হলো ও। ওকে এইম করতে গিয়ে আরও একটা মুহূর্ত নষ্ট করল লম্বু আর ওভারকোট।

হাঁটুতে ভর দিয়ে সিধে হলো রানা, কিন্তু দাঁড়াল না, বরং গড়ান দিয়ে সরে গেল আরও কয়েক ফুট। আড়াল ছেড়ে চলে এসেছে বিপজ্জনকভাবে, ইচ্ছা করলেই এখন ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারে লম্বু।

এবং ইচ্ছাটা হলো বলেই ওর দিকে হ্যাণ্ডগানের নল ঘুরিয়ে ট্রিগার টানল লম্বু।

বুলেটটা লাগল প্লাস্টিকসামগ্রীর ধাতব র‍্যাকে, এককোনায়।

ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ শোনা গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ওয়ালথারের ট্রিগারে টান দিল রানা, পর পর দু'বার, কিন্তু এত দ্রুত যে, আওয়াজ শুনে মনে হলো মাত্র একবার গুলি করেছে ও।

বুকের বাঁ দিকে একটা, আর দুই ভ্রূর ঠিক মাঝখানে আরেকটা রক্তাক্ত ফুটো নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সশব্দে আছড়ে পড়ল লম্বু। এসব দেখার সময় নেই রানার, জানে কী পরিণতি হয়েছে শত্রুর, তাই আবারও গড়ান দিয়ে সরে গেছে ও, থরে থরে সাজানো কিছু ইলেকট্রনিক্স আইটেমের একটা র‍্যাকের আড়ালে পজিশন নিয়েছে এখন।

ফায়ারিং শুরু হয়ে গেছে, মারাও পড়েছে একজন, তাই আর চুপ করে থাকার মানে হয় না--গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে ক্রেতাদের অনেকেই, বিশেষ করে মহিলা ক্রেতারা। মেইনডোর আগলে রাখা গাট্টাগোট্টার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা ম্যাগনাম, কিন্তু ঠিক কাকে গুলি করা উচিত বুঝতে পারছে না। ওর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দিল সেই পুলিশ অফিসারটা, স্টোরের বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'হোল্ড ইট! পুলিশ!' কথাটা শোনামাত্র দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল গাট্টাগোট্টা, এক হাতে দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে পর পর তিনটা বুলেট পাঠিয়ে দিল পুলিশ অফিসারের উদ্দেশে।

স্টোরের বাইরে থেকে কোনও জবাব না আসায় যা বুঝবার বুঝে নিল রানা। সাপের মত বুকে-পেটে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও একটু একটু করে, আরেকটা র‍্যাক পার হলেই এমন একটা জায়গায় হাজির হবে, যেখান থেকে, ওর অনুমান যদি ভুল না হয়, ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পাওয়া যাবে শটগানধারী ওভারকোটওয়ালাকে।

'এই যে, হিরো, কোথায় গেলে?' বোঝা গেল আতঙ্কে মাথা

খারাপ হয়ে গেছে ওভারকোটের, তা না হলে এ-রকম পরিস্থিতিতে কথা বলে নিজের পজিশন ফাঁস করে না কেউ, কণ্ঠও কেমন ভাঙা ভাঙা, 'আমার শটগানটা তাক করে রেখেছি বুড়োর যুবতী স্ত্রীর দিকে। ভালোয় ভালোয় যদি বেরিয়ে আসো তুমি দু'হাত উপরে তুলে, ছেড়ে দেব ছুকরিকে। তা না হলে মাত্র দু'বার গুলি করব, স্রেফ তিন টুকরো হয়ে যাবে মেয়েটা।'

আরেকটা র‍্যাক পার হলো রানা।

হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে এখন শটগানওয়ালাকে।

একদম নিঃশব্দে আরও দু'ফুট এগোল রানা।

'কী, হিরো?' শটগান তুলছে ওভারকোট, নিশানা শায়লার দিকে। 'আসবে না তা হলে? ঠিক আছে, আর দেরি করতে পারলাম না...'

বুকটা মেঝেতে রাখা অবস্থাতেই গুলি করল রানা, এবারও পর পর দু'বার।

প্রথম বুলেটটা লাগল ওভারকোটের কোমরে, ঠিক যে-জায়গায় অ্যাপেনডিক্স থাকে বলে জানে সবাই সেখানে। প্রচণ্ড ধাক্কায় কিছুটা ঘুরে যেতে বাধ্য হলো ওভারকোট, দ্বিতীয় বুলেটটা বদহজম করল তখন। ওর বাঁ দিকের ফুসফুসটাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা।

ম্যাগনামওয়ালা গাট্টাগোট্টার কথা ভোলেনি রানা, তাই ওভারকোটকে গুলি করেই গড়ান দিয়ে সরে গেছে পজিশন ছেড়ে, এবং বেঁচে গেল সে-কারণেই। মেইনডোরের কাছ থেকে ওকে লক্ষ্য করে পর পর তিনবার ট্রিগার চাপল গাট্টাগোট্টা, তিনটা বুলেটই বিদ্ধ হলো স্টোরের মেঝেতে।

হিসেবমত এখন কোনও বুলেট থাকার কথা না গাট্টাগোট্টার ম্যাগনামে, যদি না অলৌকিক দ্রুততায় রিলোড করে থাকে সে। চিকন বেত বাঁকিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যেভাবে সপাং করে দাঁড়িয়ে

যায়, ঠিক সেভাবে একলাফে উঠে বসল রানা, পরমুহূর্তে পজিশন নিল হাঁটুতে ভর দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালথারের পঞ্চম গুলিটা করল গাট্টাগোট্টার পা লক্ষ্য করে--লোকটা ততক্ষণে অর্ধেক বেরিয়ে গেছে মেইনডোর দিয়ে। হঠাৎ ঝাঁকি খেতে বাধ্য হলো সে, কারণ রানার বুলেট ওর ডান হাঁটুর পেছন দিয়ে ঢুকে মালাইচাকি ছিদ্র করে বেরিয়ে গেছে।

পালাচ্ছে এমন কারও, লোকটা যত বড় শত্রুই হোক না কেন, পিঠে গুলি করে না রানা। ইচ্ছা করলে ওয়ালথারের ছ'নম্বর বুলেট দিয়ে গাট্টাগোট্টার স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে ফেলতে পারত রানা, কিন্তু কাজটা করল না ও। বরং ওয়ালথারটা হাতে নিয়েই ছুট লাগাল এক শ' মিটার স্প্রিণ্টারের মত--পাকড়াও করতে চায় গাট্টাগোট্টাকে, এবং স্রেফ বোকা বনে গেল। ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে ঘুরল গাট্টাগোট্টা, আরও আশ্চর্য করে দিয়ে রিলোড করল হাতের ম্যাগনাম; রানা ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে লোকটার পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই ডাইভ দিল ও। ওয়ালথারটা ডান হাতে আছে, তাই বাঁ দিকে লাফিয়ে পড়তে হলো ওকে। একসারিতে কতগুলো কোট-ওভারকোট ঝুলছে একটা র‍্যাকের হ্যাঙ্গারে, গড়ান দিয়ে ওগুলোর আড়ালে চলে এল ও। ততক্ষণে রিলোডিং শেষ গাট্টাগোট্টার, ম্যাগনামটা তুলেই পাগলের মত ট্রিগার টানতে লাগল সে রানার কাল্পনিক অবস্থান লক্ষ্য করে। ঝাঁকি খেল কয়েকটা কোট-ওভারকোট, খসে পড়ল দুটো হ্যাঙ্গার, নতুন করে আহাজারি শুরু করে দিল আটকা-পড়া খদ্দেরদের কেউ কেউ, ওদিকে কনুই-বুক-পেটের ওপর ভর দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে এল রানা। মুখ হাঁ করে নিঃশব্দে দম নিতে নিতে জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল এক্সট্রা ম্যাগাযিন, আগের ম্যাগাযিনটা বের করে রিলোড করল ওয়ালথার।

নীরবতা। স্টোরের বদ্ধ বাতাসে করডাইটের গন্ধ। যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু আগে ফায়ার করেছে গাট্টাগোট্টা, কোট-ওভারকোটগুলোর কারণে সে-জায়গা দেখতে পাচ্ছে না রানা। ঝুঁকি নিয়ে মাথা তুলবে কি না, সে-সিদ্ধান্তও নিতে পারছে না। শায়লার কী অবস্থা, কে জানে! স্টোরের বাইরের পুলিশটা কী করছে? মারা পড়েছে নাকি? ওকে না বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটপরা অবস্থায় দেখেছিল রানা?

হঠাৎ বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল কে যেন। একটা বুড়ি। কাঁদছে, সেই সঙ্গে কপাল চাপড়াচ্ছে সম্ভবত, আর একইসঙ্গে এই স্টোরে শপিং করতে আসার জন্য অভিশাপ দিচ্ছে নিজেকেই। চাপা গলায় ধমক দিল কে যেন--কান্না থামাতে বলল বুড়িকে, নইলে আর কোনওদিন কাঁদতেও পারবে না জানিয়ে সতর্ক করল।

বাইরে থেকে কে যেন গুলি চালাল এমন সময়। পর পর তিনবার, সময় নিয়ে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেইনডোরের কাঁচ, টুকরোগুলোর মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দও পাওয়া গেল। কিন্তু কেউ কোনও আর্তনাদ করল না। তারমানে বাইরে থেকে যে-ই গুলি করে থাকুক, গাট্টাগোট্টাকে শোওয়াতে পারেনি।

কে গুলি করেছে? বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটওয়ালা ওই পুলিশ? নাকি ব্যাকআপ এসে গেছে?

মাথাটা একচুল না তুলে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। হাতের ডানে, কোট-ওভারকোটের র‍্যাক ছাড়া কোনও আড়াল নেই। এবং সেখানে যেতে চায় না রানা, কারণ গাট্টাগোট্টা ধরে নিয়েছে ওই জায়গাই রানার বর্তমান অবস্থান। বাঁয়ে, ঠিক চার ফুট দূরে, নামি কোম্পানির দামি ডিওডোরেন্টের একটা র‍্যাক।

চিৎ হলো রানা, পিঠ আর নিতম্বে ভর দিয়ে পিছিয়ে গেল কিছুটা, খেয়াল রাখল ওভারকোটের আড়ালেই যেন থাকে ওর

শরীর। হিসেবমত দূরত্বে যাওয়ার পর দু'পা ভাঁজ করে তুলল বুকের কাছে, ওয়ালথারটা এখনও আছে ডান হাতে। এক দুই করে ঠিক দশ পর্যন্ত গুনল, তারপর সাপ যেভাবে ছোবল দেয় ঠিক সে-দ্রুততায় দু'পা দিয়ে একসঙ্গে লাথি মারল র‍্যাকের একদিকের পায়ায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে শুরু করল ডিওডোরেন্টের র‍্যাকের উদ্দেশে।

চরকির মত পাক খেয়ে সরে গেছে কোট-ওভারকোটের র‍্যাক, কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে নিজের ভারের কারণে, এবং আচমকা থামার কারণে কাত হয়ে গেছে কিছুটা। কী হচ্ছে বুঝতে গিয়ে মূল্যবান দুটো মুহূর্ত খরচ করে ফেলল গাট্টাগোট্টা। মেইনডোরের কাছে, ইটের পুরু দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে; বাইরে যায়নি--যেহেতু দৌড়াতে পারবে না সেহেতু রাস্তায় কোনও পুলিশ থাকলে তাদের সহজ নিশানায় পরিণত হতে হবে। আবার, তিনটা কারণে সরেওনি দরজার কাছ থেকে। এক, নতুন কোনও পুলিশকে ঢুকতে দিতে চায় না স্টোরের ভেতরে। দুই, নড়াচড়া বেশি করলে রক্তপাত বাড়বে, দুর্বল হয়ে যাবে শরীর; তিন, ম্যাগনাম উঁচিয়ে আছে সে, উজ্জ্বল বাদামি চামড়ার লোকটাকে দেখামাত্র গুলি করবে।

র‍্যাকটাকে পাক খেতে দেখে যখন গুলি করবে কি করবে না সে-সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে, ততক্ষণে দু'বার গড়ান দেয়া হয়ে গেছে রানার, এবং গাট্টাগোট্টাকে দেখে ফেলেছে ও। তাই ডিওডোরেন্টের র‍্যাকটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে, র‍্যাকটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যে-মুহূর্তে থামল সে, ঠিক সে-মুহূর্তে আগুন উগলাতে শুরু করল ওর ওয়ালথার। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই পর পর তিনবার ট্রিগার টানল রানা, এক মুহূর্তের মধ্যে গাট্টাগোট্টার বুকের বাঁ দিকে তিন জায়গায় তিনটে ফুটো তৈরি হলো।

আজ যদি মারা যায়, কসম খেয়েছিল গাট্টাগোট্টা, তা হলে

অন্তত উজ্জ্বল বাদামি চামড়ার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে মরবে; প্রতিজ্ঞাটা পূরণ করতে পারল না সে।

এ-সময়ের আবহাওয়া পাগলা কিসিমের। হুট করেই দমকা বাতাস ছাড়ল, কোত্থেকে এসে একরাশ মেঘ জড়ো হলো আকাশে, পরেরবারের ঠাণ্ডা বাতাসটা জানিয়ে দিল বৃষ্টি নামছে। কিন্তু প্রায় কাউকেই কোনওরকম প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ না দিয়ে শুরু হয়ে গেল মুষলধারার বর্ষণ।

বৃষ্টি কেবল শুরু হয়েছে, এমন সময় পুলিশ বিল্ডিং-এর পার্কিংলটে গাড়ি থামাল শায়লা। পাশে গম্ভীর চেহারায় বসে আছে রানা।

চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল শায়লা, চালু করে দিল ওয়াইপার। নিচু গলায় বলল, 'কিছু বলছেন না যে?'

ডিসকাউন্ট স্টোর থেকে বের হওয়ার পর এই প্রথম কথা হচ্ছে দু'জনের মধ্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'স্টোরের বাইরে থেকে গুলি করেছিল কে?'

'বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটপরা ওই পুলিশ। অবস্থা সুবিধার না বুঝে ডাকাতদলের চতুর্থ সদস্য, মানে ওই লম্বা ছেলেটা ওদের গাড়ি থেকে ইয়া বড় এক শটগান বের করে নিয়ে স্টোরে ঢুকতে যাচ্ছিল। পুলিশটা গুলি খেয়েছিল আগেই--জ্যাকেটে দুটো, আর পায়ে একটা। তারপরও নড়েনি পজিশন ছেড়ে, মেইনডোর পাহারা দিচ্ছিল। ওর তিনটা গুলির দুটো লেগেছে ছেলেটার গায়ে, আর একটা ভেঙেছে মেইনডোরের কাঁচ।'

চুপ করে আছে রানা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওয়াইপার দুটোর দিকে। ফুলস্পিডে চলছে ওগুলো। বার বার যেন চাপড় মেরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে অবিরাম জলধারাকে।

'আমি...সরি, মাসুদ ভাই।'

শায়লার দিকে তাকাল রানা। 'কেন?'

'ফায়ার করার একাধিক সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু...। আমি যে-জায়গায় ছিলাম সেখান থেকে যদি গুলি করতাম, তা হলে হয়তো সহজেই ঘায়েল হতো মোটাসোটা লোকটা, বেকায়দায় পড়তে হতো না আপনাকে...'

হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল রানা। গাড়ি থেকে নামল, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দৌড় দিল।

নামল শায়লাও, দৌড় দিল সে-ও।

দরজা দিয়ে ঢুকে পাশাপাশি হাঁটছে দু'জনে, এমন সময় দেখা গেল বেরিয়ে আসছে সানি, কার্সন, রিডক্স আর হেল্ডন; বৌলিং-এর ব্যাগের মত দেখতে একটা করে ব্যাগ চারজনের কাঁধে।

রানাকে দেখে মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল চারজনই। জবাবে রানা হাসল না, কিন্তু নড করল। মৃদু গলায় বলল, 'আগে শুনেছিলাম থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, এখন দেখছি চার।'

শায়লা জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বৌলিং-এর ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নিশ্চয়ই সাঁতার কাটতে যায় না লোকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সানি।

আর কিছু বলল না শায়লা।

চলে গেল "ফোর মাস্কেটিয়ার্স"।

'পরিচয় হয়েছে ওদের সঙ্গে?' শায়লার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ঠিক পরিচয় বলা যাবে না। অল্পবিস্তর কথা হয়েছে আর কী। ট্রাফিকে আছে চারজনই।'

'আর কী জানো ওদের ব্যাপারে?'

'আর? না, তেমন কিছু না। তবে ওদেরকে যখনই একসঙ্গে দেখি, কেন যেন ফ্লাইপেপার, মানে মাছি ধরার কাগজের কথা

মনে পড়ে যায় আমার।'

'মানে?'

'মানে যখনই ওদেরকে দেখি, একসঙ্গে দেখি। ওরা হাজির দেয় একসঙ্গে, কাজে বের হয় একসঙ্গে, থাকে একসঙ্গে, এমনকী ফেরেও একসঙ্গে। একসঙ্গে থেকে কী যে করে, ওরা ছাড়া কেউ বোধহয় তা জানে না। অদ্ভুত, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

দশ

মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। ঠাণ্ডা, ঝোড়ো, ভেজা বাতাস ঝাপটা দিচ্ছে একটু পর পর।

শহরের দিকে মুখ করে থাকা ন্যাড়া আর বেঁটে একটা পাহাড়ের মাথায় বসে আছে হোটেলটা। পাশের রাস্তায় স্বাভাবিক সময়েই যান চলাচল কম থাকে, আর আজ রাতের কথা তো বলাই বাহুল্য। মাঝেমধ্যে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে দু'-একটা ট্যাক্সি। যাদের ট্যাক্সিতে চড়ার সামর্থ্য নেই, অথচ এ-রাস্তা দিয়ে না-গেলেই নয়, বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে জবুথুবু হয়ে যত দ্রুত সম্ভব হেঁটে যাচ্ছে ওরা। একটু পর পর বিজলি চমকাচ্ছে আকাশে। কখনও কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ছে কাছেই কোথাও।

হোটেলের রিভলভিং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল আটাশ-ঊনত্রিশ বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরী, দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাড়া আছে

ওর। দ্রুত হাঁটার ছন্দে দুলছে ভাঁজেখাঁজে অপরূপ ছিপছিপে শরীরটা। হোটেল-লবিতে বয়-বেয়ারা যে-ক'জন আছে, তাদের সবার চোখ যেন চুম্বকের মত আটকে গেছে সুন্দরীর দেহের বিভিন্ন এলাকায়। বাহারি রঙের অত্যন্ত আকর্ষণীয় পোশাক ওর পরনে--খুবই খাটো বেগুনি স্কার্ট, টপসটা বোধহয় চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সী কারও কাছ থেকে ধার করা, কানে ইয়া বড় হলুদ দুল। জ্বলজ্বলে লিপস্টিকের সম্ভবত পুরোটাই খরচ করা হয়েছে ঠোঁটে।

সুন্দরী জানে পুরুষেরা কেন কোন্ দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে, যেদিন থেকে যৌবন আসতে শুরু করেছে ওর শরীরে সেদিন থেকেই জানে সে কথাটা; তাই ঘাড় ঘুরিয়ে কারও দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করছে না। বৃষ্টির পানি জমে গেছে রাস্তার যত্রতত্র, দামি হাই হিল জোড়ার যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য ওদুটো খুলে নিল সে, জমে থাকা পানি এড়ানোর জন্যে ছোট একটা লাফ দিল। কিন্তু ল্যাণ্ড করল পানিতেই; যে দু'-চারজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল কাছের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে, পানির ছিটা খেতে হলো তাদেরকে। অন্য কেউ হলে কিছু গরম কথা শুনত নির্ঘাত, কিন্তু সুন্দরীর বেলায় তা ঘটল না; ওকে কয়েকবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কথাগুলো গিলে ফেলল লোকগুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা খালি ট্যাক্সি এসে থামল স্ট্যাণ্ডে, যারা অপেক্ষা করছিল তাদের প্রথম লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সিটার দিকে। এমন সময় আরেক দফা গতি সঞ্চারিত হলো সুন্দরীর দেহে, সবাইকে "ওভারটেক" করে আর প্রথম লোকটাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে পৌঁছে গেল সে ট্যাক্সির কাছে, প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা একটানে খুলে ঢুকে গেল ভিতরে, বসে পড়ল। তারপর আরেকটানে দরজাটা আটকে দিয়েই হুকুম দিল ড্রাইভারকে, 'গাড়ি ছাড়ো!'

সুন্দরীর ধাক্কা খেয়েছে যে লোক, তাকে দুষছে তখন বাকিরা, ‘কিছু বললেন না কেন? আপনিই তো আগে ছিলেন!’

পেলব শরীরের কোমল স্পর্শ পাওয়া লোকটা মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে দিতে মিনমিনে গলায় বলল, ‘কী করব, বলুন? হঠাৎ করে ওভাবে...’

ততক্ষণে ট্যাক্সির ভিতরে ড্রাইভারকে ঠিকানা বলা হয়ে গেছে সুন্দরীর, আর রাস্তা খালি পেয়ে সেদিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার।

আরাম করে হেলান দিল সুন্দরী, হাত-পা ছড়িয়ে রসল। ঠেলে বেরিয়ে থাকা আধখোলা দুই স্তনের মাঝখান থেকে বের করল একগাদা ডলার, কী মনে হতে তাকাল রিয়ারভিউমিররের দিকে। রাস্তা থেকে হটে গেছে ড্রাইভারের চোখ, নির্নিমেষ দেখছে সে সুন্দরীকে।

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল লোকটা, কিন্তু বলতে পারল না, ঢোক গিলল। চেষ্টাটা আবারও করল সে, আবারও ব্যর্থ হলো, টের পেল পিপাসা লেগে গেছে ওর এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও।

ঠোঁট বাঁকিয়ে উপহাসের হাসি হাসল সুন্দরী। ওর মনে হচ্ছে, ওকে যে-কথাটা বলতে চায় ড্রাইভার, তা বলার সাহস নেই লোকটার। তাই কিছুটা যেন বিরক্ত হয়েই বলল, ‘কী?’

খোদার খাসি মধ্যবয়স্ক ড্রাইভার আরেকবার ঢোক গিলে বলল, ‘টাকাই সবকিছু না।’

‘তোমার মাথা,’ তাচ্ছিল্যের হাসি যায়নি সুন্দরীর ঠোঁটের কোনা থেকে। সময় নিয়ে ডলারগুলো গুনল সে, তারপর সেগুলো ভরে রাখল আগের জায়গায়। সন্তুষ্ট চেহারাটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, একটু আগে হোটেলকামরায় জনৈক খদ্দেরের ক্ষুধা মিটিয়ে ভালোই কামিয়েছে।

'আমি কিন্তু ঠিক কথাই বলেছি,' বলল ড্রাইভার।

সমানে পানি গড়াচ্ছে দু'পাশের জানালায়, একদিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সুন্দরী। চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা নেই ওর।

ব্যাপারটা বুঝেও বুঝতে চাইল না ড্রাইভার। 'বলছিলাম, টাকাই সব না, জীবনে আরও অনেককিছু আছে।'

লোকটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সুন্দরী, ওর বিরক্তি বাড়ছে। 'জীবনটাকে আমার চেয়ে বেশি দেখেছ মনে হয়?'

পিঠ সোজা করে বসল ড্রাইভার, গতি কমাল ট্যাক্সির, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। 'বেশি দেখেছি কি না জানি না, কিন্তু কমও দেখিনি।'

তর্কে গেল না সুন্দরী। নিজের পাশে, সিটের ওপর নামিয়ে রেখেছিল হাই হিলদুটো, ওগুলো তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে পায়ে গলাল। কাজটা করতে গিয়ে আরও উন্মুক্ত করে দিল নিজের বুক।

ট্যাক্সির গতি আরও কমল, কারণ রিয়ারভিউমিরর থেকে চোখ সরাতে পারছে না ড্রাইভার, হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসছে তার, সেই পিপাসাটা আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে।

কাজ শেষে সিধে হলো সুন্দরী, আবারও হেলান দিয়ে ধারাল গলায় বলল, 'সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ঠিক তোমার মত। সে-কারণেই শরীর বেচতে হয় আমার মত মেয়েদের। চোখ সরাও আয়নার ওপর থেকে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাও। আরও অনেক টাকা কামাই করতে হবে আমাকে, কাজেই অ্যাক্সিডেন্টে মরতে চাই না।'

জোঁকের মুখে লবণ পড়ল যেন--নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হলো ড্রাইভার, বৃষ্টিভেজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

সুন্দরীর বলা ঠিকানায় পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না ওর।

ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝল, বিলাসবহুল একটা অ্যাপার্টমেন্টের দোরগোড়ায় হাজির হয়েছে।

মিটারটা একনজর দেখে নিয়ে আগের কায়দায় কিছু ডলার বের করল সুন্দরী, বখশিশসহ ভাড়ার টাকা হিসেবে কয়েকটা ডলার ছুঁড়ে দিল ড্রাইভারের দিকে, বাকি টাকা জায়গামত গুঁজে রেখে দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল দেমাগ দেখিয়ে।

'বেশ্যা মাগী,' গাড়ির গিয়ারের কাছে এসে পড়া ডলারগুলো তুলতে তুলতে বিড়বিড় করে বলল ড্রাইভার।

যাকে বলা হয়েছে কথাটা সে ততক্ষণে কুঁজো হয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে দৌড় দিয়েছে ভারী বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ধাক্কা খেল বিশালদেহী এক লোকের সঙ্গে। কার গায়ে ধাক্কা লেগেছে দেখার জন্য মুখ তুলে তাকাল সুন্দরী, এবং লোকটাকে চিনতে পারামাত্র চেহারা শুকিয়ে গেল ওর। একথাবায় সুন্দরীর কাঁধ খামচে ধরল লোকটা, দুষ্টু বালক যেভাবে খেলনা গাড়ি ধাক্কায় সেভাবে ধাক্কিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে গেল ট্যাক্সির কাছে, দরজা খুলে কোলবালিশের মত ভিতরে ছুঁড়ে দিল ওকে। তারপর নিজেও উঠে বসল।

কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না ড্রাইভার, তাই চেহারাটা হাঁ হয়ে গেছে ওর। সুন্দরীর সঙ্গীকে দেখার জন্য উঁকিঝুঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে রিয়ারভিউমিররে, কিন্তু আগন্তুকের বড় ফেডোরা হ্যাটের কারণে ঠিকমত দেখতে পারছে না।

টান মেরে ট্যাক্সির দরজাটা আটকে দিল বিশালদেহী।

সুন্দরী বলল, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু...'

ঠাস্ করে ওকে একটা চড় মারল বিশালদেহী। 'চুপ কর্, মাগী!' ড্রাইভারের দিকে তাকাল। 'এই ভোটকার বাচ্চা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিস কী? গাড়ি চালা!'

সঙ্গে সঙ্গে সচল হলো ট্যাক্সির ইঞ্জিন।

‘কিন্তু...কোথায় যাব?’ মিনমিনে গলায় কোনওরকমে বলল ড্রাইভার।

‘জাহান্নামের দিকে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো,’ দাঁতে দাঁত পিষে বলল বিশালদেহী, ‘কিন্তু তা যেহেতু সম্ভব নয়, সোজা চালা। ডানে কোনও মোড় দেখলেই গাড়ি ঘুরাতে থাকবি। আর আমি না বলা পর্যন্ত ট্যাক্সি যেন না থামে!’

‘ডানে...স্যর?’ ঢোক গিলল ড্রাইভার।

‘কানে কম শুনলে বল্, শালা, তোর কানের ফুটো এত বড় করে দেব যে, সেখান দিয়ে অনায়াসে বিড়াল ঢুকতে পারবে।’

বৃষ্টিভেজা রাস্তায় বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে ঘুরতে শুরু করল ট্যাক্সির চাকা।

সীলের চামড়ার জ্যাকেটপরা বিশালদেহী তাকাল সুন্দরীর দিকে। ‘তারপর...খবর কী?’

‘আমাকে যেতে দাও!’ উঁচু গলায় বলল সুন্দরী।

সঙ্গে সঙ্গে গরিলার মত বড় দুই হাতে মেয়েটার গলা চেপে ধরল বিশালদেহী। ‘আমার সঙ্গে মামদোবাজি? রাস্তার নেড়ি কুত্তী!’

ঠিকমত দম নিতে পারছে না মেয়েটা, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে বিশালদেহীর দিকে।

গলা ধরে মেয়েটাকে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিল লোকটা। ‘মনে রাখবি, এই লাইনে আমিই এনেছি তোকে, আমিই তোকে কোলেপিঠে মানুষ করেছি। কাজেই আমিই তোর বাপ, আমিই তোর মা, আমিই তোর দালাল। তোর আগে যারা আমাকে ডিঙিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে বিছানায় শুয়েছে, তারা সবাই মরেছে। তুইও...। এবার দেখি, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। দেখি আমাকে না জানিয়ে কত কামাই করলি,’ বলতে বলতে সুন্দরীর গলা ছেড়ে দিয়ে বুকের দিকে হাত বাড়াল সে।

সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল সুন্দরী, বুকের কাছে হাত তুলে "সিন্দুকটা" আড়াল করার চেষ্টা করছে। 'তোমার সঙ্গে মামদোবাজি করিনি আমি। আসলে...লোকটা সরাসরি যোগাযোগ করেছিল আমার সঙ্গে, আর খুব তাড়া দিচ্ছিল, তাই তোমাকে বলার সুযোগ পাইনি। দেখো, কাজ শেষে কিন্তু তোমার কাছেই ফিরে এসেছি, রাফি ডার্লিং।'

এক থাবায় সুন্দরীর একটা হাত মুচড়ে ধরল রাফি, জোর খাটিয়ে সেটাকে নিয়ে গেল মেয়েটার পিঠের কাছে। একই কায়দায় আরেকহাতও নিয়ে গেল আগেরটার কাছে, তারপর হাত দুটো ধরল নিজের এক হাত দিয়ে। খালি হাতটা ঢুকিয়ে দিল সুন্দরীর টপসের ভিতরে, বের করে আনল সবগুলো ডলার। কাজ শেষে ছেড়ে দিল সুন্দরীকে, শীতার্ত লোক যেভাবে হাতের সঙ্গে হাত ঘষে সে-কায়দায় ডলারগুলো ঘষল গ্লাভ্‌সপরা দুই হাতের তালুতে। খাওয়ার জন্য বাটিভর্তি দুধ পাওয়া বিড়ালের মত সন্তুষ্ট গলায় বলল, 'তোর চাহিদা দেখছি দিন দিন বেড়েই চলেছে!'

সব-হারানো মানুষের মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল মেয়েটার গলা দিয়ে। সিদ্ধান্ত নিল, চলন্ত ট্যাক্সির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বে বাইরে। দরজার দিকে হাত বাড়িয়েছে মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে ওর উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল রাফি, মাপা কয়েকটা ঘুসি মারল সুন্দরীকে। প্রচণ্ড ব্যথায় পানি চলে এল মেয়েটার চোখে, শরীরটা আপনাআপনি হেলে গিয়ে বাড়ি খেল সিটের সঙ্গে, ফোঁপানি আরও বেড়েছে।

খানাখন্দে ভরা রাস্তার ওপর থেকে বার বার সরে যাচ্ছে ড্রাইভারের চোখ, বার বার তাকাচ্ছে সে রিয়ারভিউমিররের দিকে। ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ, জিহ্বাটা নড়তে চাইছে না মুখের ভিতর। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। মনে মনে বলছে, কী কুক্ষণেই না এ-রকম একটা বেশ্যা মেয়েকে নিজের ট্যাক্সিতে

তুলতে গিয়েছিল!

এখনও এলিয়ে পড়ে আছে মেয়েটা, অর্ধসচেতন। চুল ধরে টেনে ওকে সোজা করতে গেল রাফি, ওর হাতে চলে এল পরচুলা। সেটার দিকে একটা মুহূর্ত বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাফি, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্যাক্সির মেঝেতে। ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ভঙ্গিতে মেয়েটার ছোট-করে-কাটা চুল মুঠ করে ধরল, পরমুহূর্তে নাক-মুখ সজোরে ঠুকে দিল নিজের হাঁটুর সঙ্গে। কাজটা পর পর কয়েকবার করল। যখন ছেড়ে দিল তখন মেয়েটার নাকমুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে, চিৎকার করে কাঁদার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু ভয়ে সেটাও পারছে না।

জ্যাকেটের পকেট থেকে কুৎসিতদর্শন একটা বোতল বের করল রাফি, সময় নিয়ে ছিপি খুলল, তারপর জোর করে মেয়েটার মুখ হাঁ করিয়ে বোতলটা উপুড় করে দিল সেখানে। রাফির বুকে সজোরে কিল বসিয়ে দিতে চাইল মেয়েটা, কিন্তু ওর প্রায় অচেতন শরীরে সে-শক্তি নেই, তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বোতলের কিছু তরল গিলতে হলো তাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল বেচারী, ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে সুন্দর চেহারাটা, মৃগী রোগীর মত খিঁচুনি উঠছে সারা শরীরে। বেঁচে থাকার দুর্নিবার তাড়নায় বমি করতে চেষ্টা করল; কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে আরও কিছু তরল গিলল। ওর মুখ থেকে যখন বোতলটা সরাল রাফি, ততক্ষণে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করেছে সে, একইসঙ্গে ফেনা গড়াতে শুরু করেছে ঠোঁটের কোনা বেয়ে। যেটুকু জ্ঞান ছিল সেটুকুও হারাল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল ট্যাক্সির মেঝেতে, খিঁচুনি শুরু হলো আবারও।

রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকানোর সাহস অনেক আগেই হারিয়েছে ড্রাইভার। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে, কিন্তু আজ একমনে ডাকছে তাঁকেই। অসহায়ের মত দেখছে, থর থর করে

কাঁপছে ওর দু'হাত, চেষ্টা করেও সে-কাঁপুনি থামাতে পারছে না, স্টিয়ারিংটা কীভাবে ধরে আছে জানে না। তাই রাফি যখন ট্যাক্সি থামাতে বলল ওকে, কথাটা শুনতেই পেল না।

পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে ওর কানে থাবড়া মারল রাফি। 'বিড়াল বোধহয় ঢুকাতেই হবে তোর কান দিয়ে, না? গাড়ি থামা, শালা বেশ্যার বাচ্চা!'

ব্রেকপ্যাডেলে পা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ড্রাইভার, রাস্তায় আরেকবার বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে থেমে গেল ট্যাক্সিটা।

ড্রাইভারকে খুন করার জন্য ধীরেসুস্থে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছিল রাফি, কিন্তু ওর মনোভাব টের পেয়ে ঝড়ের গতিতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল লোকটা, বৃষ্টির চাদরের মধ্যে উধাও হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

'বেঁচে গেলি, শালা!' বিড়বিড় করে বলল রাফি। পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করে ফেলেছিল, হাতটা সরিয়ে নিল। কোনও তাড়া নেই, তাই হেলেদুলে নামল ট্যাক্সি থেকে। এই তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে হচ্ছে বলে নিচু গলায় অভিশাপ দিল লাশ হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটাকে, পা বাড়াতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল। ধস্তাধস্তির সময় খসে পড়েছে ওর ফেডোরা হ্যাট, ট্যাক্সির ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে খুঁজে নিল সেটাকে। মাথায় চাপিয়ে সোজা হতে যাবে, কী মনে হতে শেষবারের মত তাকাল বিস্ফারিত চোখে খোলা মুখে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে, ওর মুখে থু করে একদলা থুতু নিক্ষেপ করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

পুলিশ যদি ডিএনএ টেস্ট করে?

বুক চিতিয়ে দাঁড়াল সে, লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

বেশিদূরে যায়নি ড্রাইভার, কাছের এক বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল ট্যাক্সির দিকে। বিশালদেহী উধাও হয়ে

যাওয়ার পরও মিনিট বিশেক অপেক্ষা করল, তারপর বেরিয়ে এল সাবধানে। ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে নিজের ক্যাবের দিকে। কাছে পৌঁছে, যেদিকের দরজা খুলে রেখে চলে গেছে বিশালদেহী, সেখান দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল মেয়েটাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ওর, মোচড় খেল তলপেটের ভেতরটা, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বসে পড়তে বাধ্য হলো সে।

মূর্ছা যাওয়ার আগে হড়হড় করে বমি করল লোকটা।

পরদিন সকাল।

আকাশটা দেখলে কেউ বলবে না, গতরাতে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। কেউ যেন ইচ্ছেমত গাদা গাদা নীল রঙ মেখে দিয়েছে সারা আকাশে। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো পেঁজা তুলো দেখলে বোঝা যায়, ওগুলো "নির্বিষ" মেঘ, অন্তরটা সাদা।

শহর ছাড়িয়ে মাত্র বের হয়েছে গাড়িটা, সিলভার গেট ব্রিজে উঠেছে। চালকের আসনে বসে আছে রাফি। শিস বাজাচ্ছে, হাল সময়ের একটা জনপ্রিয় গানের সুর ওর ঠোঁটে। একেবারে ফুরফুরে মেজাজ। দালালি করে নেহাত কম টাকা কামাই করে না সে। এবং বিনাশ্রমে এতগুলো টাকা আয় করতে হলে সবার আগে চাই বেশ্যাদের ওপর নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কে কখন কার সঙ্গে শোবে, কত টাকায় শোবে, আদৌ শোবে কি শোবে না--সব হাতের মুঠোয় রাখতে হবে রাফিকে। তা না হলে ওর ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলতে বেশি সময় লাগবে না। এবং এত কষ্ট করে গড়ে তোলা এত চালু একটা ব্যবসা কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না সে, কারণ ব্যবসা নষ্ট হওয়া মানে জীবন থেকে সব হাসি-আনন্দ মুছে যাওয়া। ব্যবসা নষ্ট হওয়া মানে এই ড্রাইভিং, শিস বাজানো, ফুরফুরে মেজাজ--সব হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া।

সেটা হতে দিতে পারে না রাফি।

নিজের সদর্পে ছুটে চলা ব্রোঞ্জ রঙা গাড়িটা কল্পনার চোখে দেখে হাসিটা আরও চওড়া হলো তার। ভেতরের পুরোটা দুধসাদা রঙের, আধুনিকতার ছোঁয়া সবখানে। গোটা শহরের সব মানুষের যেদিন কাজ করতে করতে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, সেদিন এভাবে হালকা মেজাজে শহরময় ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগে রাফির। নিজের পেশা ও নেশাকে উপভোগ করে সে মনেপ্রাণে।

ব্রিজের শেষমাথার কাছে পৌঁছে বাঁ দিকের লেনে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল সে, এখানে রংধনু আকৃতির একটা টানেল আছে। ভেতরে কোনও স্পিড লিমিট নেই; কাজেই নতুন কেনা গাড়িটার স্পিডোমিটারের কাঁটা যদি দেড় শ'র ঘর স্পর্শ করে, তা হলে কেমন লাগে জানতে চায় রাফি।

উফ্, কী অনুভূতি! এসব না থাকলে বেঁচে থাকার মানে কী? সাঁই সাঁই করে ছুটছে গাড়িটা, সেই সঙ্গে টানেলের আরেক প্রান্তে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠছে পাটালমায়িসের চূড়া। গাছে ভরা ছোট ছোট পাহাড়গুলোও দেখা যাচ্ছে একটু-আধটু। গাড়ির গতি কমাল রাফি, গিয়ার বদলাল। এবার ফ্রিওয়ে ধরে সৈকতের দিকে ছুটে যাবে সে। ওখানকার রোডসাইড রেস্তোরাঁ, মোটেল আর সার্ভিস স্টেশনগুলোতে বিকিনিপরা ভিনদেশীদেরকে দেখলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায় ওর। মন চাইলে বীচেও যেতে পারে, বিশাল কোনও ছাতার নীচে প্রায় উলঙ্গ হয়ে বসে থাকা কোনও যুবতীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতে পারে, দুধসাদা চামড়ার মেয়েদের ব্যাপারে একরকমের মোহ আছে ওর।

একটা বোতাম চেপে গাড়ির সবগুলো কাঁচ নামিয়ে দিল রাফি। আরেকটা বোতাম চেপে ছাদটা উধাও করে দিতে যাবে, এমন সময় রিয়ারভিউমিররে দেখল, নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করছে একটা পুলিশ মোটরসাইকেল, লাল-নীল আলো জ্বলছে সেটার দু'পাশের বাতিতে।

মুখ খারাপ করে জঘন্য একটা গালি দিল রাফি। পুলিশ দু'চোখে দেখতে পারে না সে, কারণ ব্যবসা যাতে টিকে থাকে সেজন্য নিজের "কষ্টের" কামাইয়ের একটা বড় অংশ প্রায়ই তুলে দিতে হয় ওদের হাতে। আরেক দফা গতি কমাল সে, গিয়ার বদল করল আবারও, তারপর ড্যাশবোর্ডের একটা ড্রপডাউন ড্রয়ার খুলে দেখে নিল ওর পয়েন্ট থ্রি এইটটা জায়গামত আছে কি না। আজ মনের সুখে ঘুরবে ভেবে শোল্ডার হোলস্টার পরেনি সে।

আশ্চর্য, নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করেই চলেছে ট্রাফিক অফিসার, গাড়ি থামাতে বলছে না কেন যেন। তারপর, হঠাৎ করেই একটা নির্জন জায়গা পেয়ে গতি বাড়াল লোকটা, ধেয়ে এসে পাশাপাশি চলতে লাগল রাফির, ইঙ্গিতে গাড়ি থামাতে বলছে।

কাজটা করল রাফি।

মোটরসাইকেল থেকে নেমে এসে ব্রোঞ্জ রঙা জানালার পাশে দাঁড়াল ট্রাফিক অফিসার। 'গুড ডে, স্যর।'

পাথরকঠিন চেহারায় মনে মনে রাফি বলল, 'দিনটা তোমার পশ্চাদ্দেশের হলুদের মতই শুভ, বেজন্মা কোথাকার!'

'গাড়িটা কি আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন করা?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

অতিরিক্ত রাগে হেসে ফেলল রাফি। 'সে-রকমই তো জানি।' ইঙ্গিতে মোটরসাইকেলটা দেখাল। 'ওটা আবার অন্য কারও নয় তো?'

বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না অফিসার। 'আপনার লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশনটা দেখতে পারি?'

'কেন, সেগুলোতে কি উদোম বুকের কোনও সুন্দরীর ছবি আছে বলে ধারণা করছেন?'

'লাইসেন্স অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন, প্লিয।'

'হয়রানি করার অভিযোগে আমি যদি জায়গামত একটা ফোন দিই, তা হলে আপনার অবস্থা কী হতে পারে জানেন?'

'সেটা জানার জন্যই তো লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশনটা দেখতে চাচ্ছি।'

'কেন?'

'টানেলে ঢোকার আগে, ব্রিজে যখন ছিলেন, স্পিড লিমিট ভেঙেছেন আপনি।'

'কোনও শুয়োরের বাচ্চা যদি প্রমাণ করতে পারে সেটা, তা হলে হাতে বুলহর্ণ নিয়ে নেমে পড়ব লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায়, গলা শুকিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বলতে থাকব আমার বাপ আর মা'র মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক ছিল না। আমি বেজন্মা!'

ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে বাঁ হাত আগে বাড়াল অফিসার।

'ঠিক আছে, যখন দেখতেই চাচ্ছেন...' ডান হাতটা পেছনদিকে নিল সে, প্যান্টের হিপপকেটে রাখা মানিব্যাগ বের করল। খুঁজে খুঁজে বের করল লাইসেন্সটা, সঙ্গে এক শ' ডলারের দুটো নোট। হোটেলের বেয়ারাকে যে-ভঙ্গিতে বখশিশ দেয় লোকে, সেভাবে তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে নিতান্ত অবহেলায় ধরে লাইসেন্সসহ নোটদুটো বাড়িয়ে ধরল অফিসারের দিকে।

কিন্তু অফিসার নোটদুটো নিচ্ছে না দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল রাফির, ব্যাপার কী জানার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

আশ্চর্য, রাফি টেরই পায়নি, কখন যেন নড়ে উঠেছে পাশে দাঁড়ানো লোকটা, কখন যেন লম্বা নলের একটা ভয়ালদর্শী পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম বেরিয়ে এসেছে লোকটার ডান হাতে।

রাফির চোখ জোড়া বিস্ফারিত হওয়ার আগেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল ম্যাগনামের সাইলেন্সারের নলে। দক্ষ হাতের দ্রুত

একাধিক ফায়ারে ছিঁড়ে গেল ওর স্পাইনাল কর্ড, সেই সঙ্গে বড় গর্ত তৈরি হলো বুকের বাঁ পাশে।

ওর ওপর ম্যাগনামের পুরো চেম্বার খালি করে ঘুরল অফিসার, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল মোটরসাইকেলের দিকে, ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে যাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই।

এগারো

রাতটা পরিষ্কার, মৃদুমন্দ বাতাস ভেজা ভেজা। আকাশে থালার মত গোল চাঁদ। অনারারি অফিসার হিসেবে আরেকটা দিন গাধার খাটুনি খেটে রানা ক্লান্ত। যে-অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকছে ও, মধ্যম গতিতে চালিয়ে সেটার পাশের রাস্তায় হাজির হলো।

অনেকে বলে, রানা বিলাসী মানুষ। কথাটা ঠিক, আবার সবসময় ঠিকও না। যেমন লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন রানা এজেন্সির শাখা খোলে ও, নিজের থাকার জন্য বেছে নেয় পুরনো এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটাকে। বিলাসের তেমন কোনও উপকরণই নেই এখানে। সাদামাটা বাড়িটা কেন যে মনে ধরে গিয়েছিল রানার, নিজেও জানে না। কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, হয়তো সেজন্যে। আবার, ওর বেডরুমের জানালা খুলে দিলে বাধাহীন দৃষ্টি সোজা গিয়ে পড়ে ছোট শাখানদীটার ওপর, যেটার বুক চিরে রাতের বেলায় স্বপ্নিল আলো জ্বেলে ঘুরে বেড়ায় প্রমোদতরীগুলো--সেটাও একটা কারণ হতে পারে। সবচেয়ে

বড় কথা, সাবটেরোনিয়ান গ্যারেজের দিকে ধীর গতিতে ড্রাইভ করতে করতে ভাবছে রানা, এটা আমার মতই নিঃসঙ্গ--পথের শেষমাথায় একা দাঁড়িয়ে আছে, আশপাশে আরও কোনও বাড়ি নেই।

এই বাড়িটা, কপালের গুণই বলতে হবে, ওর অনারারি অফিসারের চাকরির জন্য সুবিধাজনক হয়েছে। এখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরোলে পুলিশ বিল্ডিং মাত্র দশ মিনিটের পথ। ভাড়ার হিসেব অনুযায়ী অ্যাপার্টমেন্টটা মোটামুটি সস্তা, প্রতি বছর একবার করে এসে সারাবছরের ভাড়া একসঙ্গে চুকিয়ে দিতে গায়ে লাগে না রানার। ওদিকে এত ভালো ভাড়াটে পেয়ে বাড়িভাড়া বাড়ানোর নামও নেয় না বিধবা বুড়ি মালিক, রানাকে উঠতে বলা তো পরের কথা। রানাই বরং খোঁজখবর নিয়ে প্রতি বছর কিছু কিছু করে বাড়িয়ে দেয় ভাড়া।

সস্তা কিন্তু অ্যান্টিক ভ্যালু আছে এ-রকম অল্প কিছু আসবাব কিনে অ্যাপার্টমেন্টটা সাজিয়ে নিয়েছে ও।

গ্যারেজে হাজির হয়ে নিজের পার্কিংস্পেসে গাড়ি রাখল রানা। এখানকার ফ্লোরে, ওর গাড়িটা যেখানে থাকে সেখানে, ইংরেজিতে সাদা রঙে বড় বড় করে আর এ এন এ লেখা আছে। বাড়িওয়ালির কাজ।

হেডলাইট নেভাল রানা, গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করল। সাইডওয়াক ধরে হাঁটছে। কিছুটা সামনে ছোট একটা সিঁড়ি উঠে গেছে গ্রাউণ্ডফ্লোরের দিকে। ওটা বেয়ে উঠে শেষমাথায় পৌঁছে গেছে রানা, এমন সময় নীচতলার একটা অ্যাপার্টমেন্টের একদিকের জানালার খড়খড়ি নড়ে উঠল--কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

থেমে দাঁড়িয়েছে রানা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে শব্দের উৎসের দিকে। ডান হাতটা আপনাআপনি চলে গেছে জ্যাকেটের ভিতরে,

শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারের বাঁটে।

একজোড়া কালো কৌতূহলী চোখ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই খড়খড়ি নামিয়ে দিল চোখের মালিক, উধাও হয়ে গেল।

আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, হাত সরাল ওয়ালথারের বাঁট থেকে। সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো টপকে হেঁটে গিয়ে ঢুকল ভেস্টিবিউলে, পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল ভেতরের দরজা, এগিয়ে যাচ্ছে নিজের নাম লেখা মেইলবক্সের দিকে। ওটা খুলে দেখল ভেতরে কিছু আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। দুটো কাগজ দেখা যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে কাগজ দুটো নিল রানা, খুলে দেখল কী ওগুলো। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না--বিদ্যুৎ বিলবাবদ পুরো এক বছরের খরচের হিসেব, বাড়িওয়ালিই রেখে দিয়েছে। ওই খাতে কত লাগতে পারে মোটামুটি হিসেব করে প্রতি বছর টাকাটা অগ্রিম দিয়ে যায় রানা এজেন্সির লোক, ও ফিরে এলে ওকে হিসেবের কাগজ ও বাড়তি টাকা ফেরত দেয় বাড়িওয়ালি।

মেইলবক্সটা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির মূল সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রানা, শরীর ক্লান্ত থাকার পরও লিফট ব্যবহার করতে ইচ্ছা করছে না। নীচতলার একটা অ্যাপার্টমেন্টের সদর-দরজা খুলে গেল এমন সময়। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। এক থাবায় বের করতে যাচ্ছিল ওয়ালথারটা, কিন্তু খোলা দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে সামলে নিল নিজেকে।

গোবরাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী, চেহারাটা একনজর দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটার বাবা অথবা মা'র যে-কোনও একজন চাইনিয বা জাপানিয, যদিও চোখদুটো কাঠবাদাম নয়। একরাশ কালো চুল লুটোপুটি খাচ্ছে কাঁধের ওপর।

রঙতুলির কাজই মেয়েটার পেশা সম্ভবত। কারণ, ওর পরনের

নীল জিন্স এবং প্রায় সবগুলো বোতাম খুলে রাখা ওয়ার্কশার্টের জায়গায় জায়গায় টাটকা-বাসি দু'রকমেরই রঙের দাগ। বোতামখোলা শার্টের কারণে মেয়েটার বুক আর পেটের যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তা দেখে রানার একটু আগে দেখা চাঁদটার কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটার টানা টানা দু'চোখে স্পষ্ট আমন্ত্রণ।

রানা নিশ্চিত, একটু আগে খড়খড়ি সরিয়ে এই মেয়েই দেখছিল ওকে।

'হাই,' বলল মেয়েটা, ডান হাতটা উপরে তুলে আঙুলগুলো নাচাল একটুখানি।

হাই তুলল রানা, নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'হ্যালো।'

কপালের ওপর নেমে আসা একগাছি চুল হাত দিয়ে সরাল মেয়েটা, হাসল। জিভ বের করে সময় নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভেজাল ঠোঁট জোড়া, নাকটা কোঁচকাল একটুখানি; এমন ভাব করছে যেন রানাকে বলার মত অনেক কথা আছে ওর, কিন্তু কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না।

'কিছু বলবে?' হাতঘড়ি দেখল রানা।

যেন ঠিক এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল, এমনিভাবে হড়বড় করে মেয়েটা বলল, 'প্রায় একবছর হলো এখানে ভাড়া থাকছি আমি।'

'ও আচ্ছা,' নাক টানল রানা। 'আমাকে সারাদিন অনেক কাজ করতে হয়।'

'জানি।'

'কীভাবে?'

'খেয়াল করেছি।'

'যেমন?'

'যেমন, তুমি স্থায়ীভাবে থাকো না, হঠাৎ হঠাৎ আসো লস অ্যাঞ্জেলেসে। সেই কাকডাকা ভোরে ওঠো তুমি ঘুম থেকে, জগিং

করতে যাও। কোনও কোনওদিন আবার যাও না। যেদিন যাও, সেদিন সাতটা বাজার কিছুক্ষণ আগে ফিরে আসো। তারপর আটটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়ো গাড়ি নিয়ে। তারপর ফেরো...' সোনালি হাতঘড়ি দেখল মেয়েটা, 'এত রাতে।'

'বাহ্, অনেককিছু খেয়াল করেছ তো।'

রানার মেকি প্রশংসাতেও খুশি হলো মেয়েটা, হাসল আবারও। 'শুধু তা-ই না, আমি জানি, ইদানীং তুমি পুলিশে চাকরি করছ।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল আস্তে আস্তে। 'তা করছি বটে।'

'অনেকদিন থেকেই ভাবছি,' আবারও জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মেয়েটা, 'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তোমাকে। কিন্তু করি করি করেও করা হচ্ছে না।'

'কী প্রশ্ন?'

'একটা মেয়ে যদি তোমার সঙ্গে শুতে চায় তা হলে তাকে কী করতে হবে?'

আবারও একদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার বয়ফ্রেণ্ড তোমাকে ছেড়ে গেছে বুঝি? বিচ্ছেদবেদনা সহ্য হচ্ছে না? কাজে ডুবে যাও, দেখবে সব ভুলে গেছ একসময়। না পারলে নতুন কাউকে খুঁজে নাও,' আর অপেক্ষা করল না, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দরজা খুলে লাইট জ্বালাল ও, লিভিংরুম পার হয়ে এগিয়ে গেল কিচেনের দিকে। বাতি জ্বালানোর ঝামেলায় না গিয়ে রেফ্রিজারেটর খুলল, উঁকি দিয়ে দেখল কী আছে ভেতরে। এক বোতল আঙুরের-জ্যাম, কয়েক ক্যান বিয়ার, আর বারবারা'স রেস্টুরেন্ট থেকে এনে রাখা একটা প্যাকেট। প্যাকেটের বার্গারদুটো তশতরিতে করে মাইক্রোওয়েভ

আভেনে একমিনিট গরম হতে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল বেসিনে।

বীফবার্গার আর বিয়ারের একটা ক্যান নিয়ে লিভিংরুমে চলে এল রানা। ক্যানটা কার্পেটের ওপর নামিয়ে রেখে বসে পড়ল ওর প্রিয় রকিংচেয়ারে। বড়সড় দুটো বীফবার্গার হাসছে ওর দিকে চেয়ে, দেখে হাসি এসে গেল ওরও।

মস্ত কামড় বসাচ্ছে বার্গারে, সেই সঙ্গে একটা করে চুমুক দিচ্ছে বিয়ারের ক্যানে। খাওয়া শেষ করে এনেছে, এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়।

রানা জানে কে এসেছে, তাই কোনও তাড়াহুড়ো করল না। উঠে গিয়ে আবার ঢুকল কিচেনে, রেফ্রিজারেটর খুলে আরেক ক্যান বিয়ার নিল। আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে আর ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সদর-দরজার দিকে। তৃতীয়বার যখন টোকা পড়ল দরজায়, তখন খুলে দিল দরজা।

সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে, পরনে পুরনো একটা রেইনকোট। ধূসর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। খালি পায়ে এসেছে মেয়েটা, রেইনকোটের নীচে অন্যকিছু পরেনি সম্ভবত।

'আমাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে আরও প্রশ্ন আছে বুঝি?' বলল রানা।

উঁকিঝুঁকি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা দেখল মেয়েটা। 'তুমি কি সারা বাড়িতে শুধু একটা বাতিই জ্বেলে রাখো?'

'কখনও কখনও। যখন বেশি ক্লান্ত থাকি, তখন অতিরিক্ত আলো সহ্য হয় না।'

'ভেতরে আসতে বলবে না?'

মুখের ওপর না বলা যায় না, তাই দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল রানা।

ভেতরে ঢুকে সোজা হেঁটে গিয়ে একটু আগে যে-চেয়ারে বসে ছিল রানা সেটাতে বসে পড়ল মেয়েটা।

কী দিয়ে আপ্যায়ন করবে ভাবছে রানা। ‘বিয়ার চলবে? না চললে...তোমাকে দেয়ার মত আর কিছু নেই।’

‘আর কিছুই নেই?’ মদির দৃষ্টিতে রানাকে আপাদমস্তক দেখল মেয়েটা। ‘শিয়োর?’

মেয়েটাকে পাত্তা দিল না রানা। ‘একটু আগে এলে একটা বার্গার সাধতে পারতাম।’

‘ঠিক আছে, বিয়ার চলবে,’ হাসল মেয়েটা।

‘ক্যান থেকেই খেতে হবে কিন্তু। ঝকঝকে পরিষ্কার কোনও গ্লাসও নেই হাতের কাছে।’

‘ঠিক আছে, ক্যান থেকেই খাব,’ দোল খেতে আরম্ভ করল মেয়েটা। একটু উপরে উঠে গেল ওর রেইনকোট, ধবধবে ফর্সা, নির্লোম ঊরু দেখা যাচ্ছে এখন।

রেফ্রিজারেটর থেকে আরেক ক্যান বিয়ার নিয়ে এল রানা, দিল মেয়েটাকে। ‘তোমার নাম জানা হয়নি।’

‘কিচেনে ঢোকার সময় লাইট জ্বালিয়েছ দেখলাম,’ রানার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মেয়েটা। ‘তারমানে তোমার ক্লান্তি কি কিছুটা কমেছে?’

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়।

প্যান্টের বাম পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল রানা। ‘হ্যালো?’

‘মাসুদ রানা নাকি?’ ধমকের সুরে জানতে চাইল কেউ।

বলার বদমেজাজি ভঙ্গিটা পরিচিত, কিন্তু কর্কশ কণ্ঠটা অচেনা। কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে রানা বলল, ‘হ্যাঁ। কে বলছেন?’ মেয়েটার দিকে তাকাল। রেইনকোটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে একটা ধরাচ্ছে সে।

‘চিনতে পারোনি? চেনা উচিত ছিল। ভেবেছিলাম, ফোনে

আমাদের প্রথম কনভার্সেশনে আরও স্মার্ট হবে তুমি।'

'লেফটেন্যান্ট হেইডন?'

'যাক, চিনতে পেরেছ এতক্ষণে। বেটার লেইট দ্যান নেভার। শোনো, মিস্টার-ফিস্টার আর আপনি-আপনি করে অনেক ন্যাকামো হয়েছে তোমার সঙ্গে, অতটা সম্মান আমার কাছ থেকে আশা কোরো না আর। তা ছাড়া ঢুকেই যখন পড়েছ এলএপিডিতে তখন আমরা কলিগ, এবং একই র‍্যাঙ্কে; কাজেই তুমি করে বলাটাই ভালো। কী বলো?'

'যা ভালো মনে করো।'

'একা নাকি?'

'কী ব্যাপার? কথা নেই বার্তা নেই, আচমকা ব্যক্তিগত প্রশ্ন?'

'ভাবছিলাম তুমি যদি একা থাকতে তা হলে জরুরি একটা কাজে ডাকতাম তোমাকে।'

'না, এ-মুহূর্তে একা নই। অপূর্ব সুন্দরী এক চাইনিয কিংবা জাপানিয মেয়ে হাজির হয়েছে আমার ঘরে...'

'চাইনিয বা জাপানিয মানে? এখনও মেয়েটার জাতীয়তা নির্ণয় করতে পারোনি? নাহ্, রানা, আরও ফাস্ট হতে হবে তোমাকে। বাই দ্য ওয়ে, মেয়েদের জাতীয়তা কোন্ জায়গায় থাকে, জানো তো?'

'ফাস্ট হওয়ার সুযোগ দিলে কই? জাতীয়তা নির্ণয় করতে যাচ্ছিলাম, তখনই তো বেরসিকের মত ফোন দিয়ে বসলে। ...বলো, কী খেদমত করতে পারি তোমার।'

'খেদমত একটা না, কয়েকটা করতে হবে।'

'যেমন?'

'এক, গুডবাই জানাও অপূর্ব সুন্দরীকে, বলো অফিসের বড় স্যার ডেকেছেন। দুই, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আবার ন্যাংটো চলে এসো না, দয়া করে অন্তত প্যান্টটা পোরো। তিন, যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজির হয়ে যাও এলএপিডি'র মর্গে।'

'মর্গে? কেন, তোমার বউ তোমাকে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছে নাকি? থাকার জায়গা পাচ্ছ না বলে মর্গে গিয়ে উঠেছ?'

'খোঁচা দিচ্ছ কেন?'

'দিতে চাইনি। তুমিই শুরু করেছ আগে।'

'ঠিক আছে। তা হলে খোঁচাখুঁচি বন্ধ। মর্গে চলে এসো। ইন্টারেস্টিং কিছু একটা দেখতে পাবে।'

'হেইডন, আমি কিন্তু হোমিসাইডের লোক না। এখনও অফিশিয়ালি...'

'ফালতু বোকো না! অফিশিয়ালি অনেক ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়নি বটে, কিন্তু আনঅফিশিয়ালি এমন সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা এর আগে দেয়া হয়নি এলএপিডি'র কোনও অফিসারকে। অস্বীকার করতে পারো, ট্রাফিকে কাজ করার নামে আসলে ট্রাফিক অফিসারদের ওপর নজরদারি করছ? অস্বীকার করতে পারো, কাউকে কিছু না বলে সিরিয়াল কিলিংগুলোর তদন্ত করছ? কাজেই মা'র কাছে মাসির গল্প কোরো না। তা ছাড়া বড় স্যররা হঠাৎ করেই তোমাকে আর তোমার ওই মহিলা সাগরেদকে...কী যেন নাম মেয়েটার...ধুর, মনেও আসছে না...হোমিসাইডে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করেছেন, তবে সাময়িকভাবে। এখন ইচ্ছা হলে এসো, না হলে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল হেইডন।

'না হলে?'

'না হলে তুমি আমার পিরিতের নাগর না যে, তোমার জন্য সারারাত অপেক্ষা করব,' লাইন কেটে দিল হেইডন।

মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা। তাকিয়ে দেখল, আরাম করে সিগারেট ফুঁকছে মেয়েটা; ভাবখানা এমন, আজ সারারাত কাটাবে রানার সঙ্গে।

‘তোমার নাম জানতে চেয়েছিলাম। বলনি।’

‘নিকি,’ ফুঁ করে একগাদা ধোঁয়া ছাড়ল মেয়েটা। ‘সেই তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে যাদের আদর পেয়েছি, তারা ওই নামেই ডেকেছে।’

‘তো, নিকি, যদি কিছু মনে না করো, অফিসের বড় স্যর ডেকেছেন আমাকে, এখনই যেতে হবে। তোমার সঙ্গে পরে কখনও গল্প করব।’

‘চলে যেতে বলছ?’ পিঠ সোজা হয়ে গেছে মেয়েটার।

‘হ্যাঁ, বলছি। তোমাকে তো আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না আমার অফিসে।’

‘যদি বলো তা হলে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারি...এখানেই। অথবা...তোমার বিছানায়।’

‘কোনও দরকার নেই,’ সাফ মানা করে দিল রানা। ‘কাজে যাওয়ার সময় দরজায় তালা লাগানো আমার পুরনো অভ্যাস।’

পুলিশ বিল্ডিং-এর সঙ্গে একটা নিউযস্ট্যাণ্ড আছে, অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে সেটা। দোকানের মালিকের সঙ্গে এ-ক'দিনে খাতির হয়ে গেছে রানার। বুড়ো লোকটাকে সবাই বিলি বলে ডাকে। জ্বলন্ত সিগার ছাড়া কখনোই দেখা যায় না তাকে। ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাওয়ার সময়ও সে ঠোঁটের কোনায় সিগার নিয়ে যায় হয়তো।

রানাকে দেখে চেহারা উজ্জ্বল হলো বিলির, সিগারটা দাঁতে কামড়ে বলল, ‘হ্যালো, রানা।’

হাসল রানা। ‘আর কত কামাই করবে, বিলি? এ-বয়সেও এত রাত পর্যন্ত বেচাবিক্রি করেই চলেছ। ক্ষান্ত দাও এবার, বাসায় গিয়ে একটু আরাম দাও শরীরটাকে।’

‘বাসা আমার আছে বটে,’ সিগার খেতে খেতে ফুসফুসের

বারোটা বাজিয়েছে বিলি, তাই ধোঁয়া ছাড়ার সময় ফোঁসফোঁস শব্দ হচ্ছে ইদানীং, 'কিন্তু আরাম দেয়ার মত কেউ নেই। ফিরে গিয়ে করব কী? তাই দোকান নিয়েই পড়ে থাকি যতক্ষণ পারি।'

লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর "বুঝতে পেরেছি" ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটা ধরল। বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে লিফটে চড়ল, চলে এল বেইযমেণ্টে। এখানকার লম্বা করিডোরের বিভিন্ন দিকে একাধিক দরজা আছে, একেকটা দরজা খুললে একেক জায়গায় যাওয়া যায়।

উর্দিপরা এক হোঁৎকা পুলিশ অফিসারকে গোমড়া চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একটা দরজার সামনে। রানাকে এগোতে দেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা একটুখানি তুলে "গুডলাক" জানাল সে। জবাবে কিছু বলল না রানা, শুধু মাথা ঝাঁকাল, চার কজা লাগানো ভারী দরজার বিশাল হাতলটা কব্জির মোচড়ে ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ফ্লুরোসেণ্ট আলোর আভায় আলোকিত হয়ে আছে ঘরটা, বাইরের সহনীয় আলোর সঙ্গে তুলনা করলে এ-আলোকে বিচ্ছিরি বলা ছাড়া উপায় নেই। তিনদিকের দেয়ালে সারি সারি ক্রোম রেফ্রিজারেটর ডোর। মড়া রাখার বারোটা লম্বা টেবিল দুই সারিতে রাখা আছে ঘরের মাঝখানে, প্রতিটা টেবিলের চার পায়াতেই চাকা আছে। এবং বারোটা টেবিলের কোনওটাই খালি নেই, প্রতিটাতেই একটা করে লাশ। পাতলা সবুজ প্লাস্টিকের বিশেষ কভার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে লাশগুলো, শুধু পায়ের পাতা দেখা যায়। প্রত্যেকের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বড় ট্যাগ, সেগুলোতে হাবিজাবি অনেককিছু লেখা। হেইডনকে নিয়ে ডোনাল্ড পিয়ার্স নামের এলএপিডি'র এক ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন একটা টেবিলের কাছে, বিচ্ছিরি আলোটা সহ্য করতে পারছেন না বলে একটা লাশের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন

দু'জনই।

টকটকে লাল চেহারা মিস্টার পিয়ার্সের, হৃষ্টপুষ্ট শরীরের কারণে মধ্যবয়স্ক লোকটার বয়স বেশি মনে হয়। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে আজকের এই অবস্থানে হাজির হয়েছেন তিনি।

রানার উপস্থিতি টের পেয়ে পিয়ার্স আর হেইডন দু'জনই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন, বিরক্তির ভাব কিছুটা হলেও কেটে গিয়ে কৌতূহল দেখা দিল তাঁদের চেহারায়।

'নাটকীয়, না?' কাছাকাছি গিয়ে মুখ খুলল রানা।

'কী?' জিজ্ঞেস করল হেইডন।

'এই যে...হঠাৎ করেই হোমিসাইডে আগমন ঘটল আমার।'

'হোমিসাইডের চেয়ে অনারারি অফিসার হিসেবে তোমার আগমন বেশি নাটকীয়,' বললেন পিয়ার্স। 'চলো সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় চলে যাই। আমাদের তথাকথিত সিরিয়াল কিলার লস অ্যাঞ্জেলেসের আদালতকে ছুটি দিয়ে দিতে চাইছে। মাদকব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বেশ্যার দালাল, পেশিশক্তিবাজ থেকে শুরু করে গডফাদার--আরামের ঘুম হারাম হয়ে গেছে সবার।' যে-লাশের কাছে দাঁড়িয়েছিল, প্লাস্টিক কভারের চেন টেনে খানিকটা নামিয়ে দিয়ে চেহারাটা ভালোমত দেখার সুযোগ করে দিল রানাকে। 'কয়েক ঘণ্টা আগে এসেছে লাশটা, সে-হিসেবে এটাই...যাকে বলে...সবচেয়ে টাটকা। একের বেশি ভালো নাম ছিল এই বিশালদেহীর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করায় এর নামও বিভিন্ন হয়েছে, তবে বেশ্যার দালাল হিসেবে রাফি নামে বেশি পরিচিত ছিল সে পুলিশের কাছে। দেখলে মনে হয় ওকে খুন করে মজা পেয়েছে আমাদের সিরিয়াল কিলার।' ইঙ্গিতে পাশের টেবিলটা দেখাল। 'যাদের দালালি করত সে, তাদের একজন শুয়ে আছে ওর পাশেই। জোর করে বিষ খাইয়ে রাফিই খুন করেছে মেয়েটাকে।'

নিজের হাতে চেন খুলে কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরীর চেহারা দেখল রানা। তারপর পিয়ার্সের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল।

'গতরাতে এক ট্যাক্সিড্রাইভার নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করে খবর দেয়, তখন আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসে লাশটা। ঘটনা মোটামুটি জানা গেছে ওই ড্রাইভারের কাছ থেকেই।'

কৌতুকভরা চোখে হেইডনের দিকে তাকাল রানা। 'হোমিসাইডের ঘাগু অফিসারদের কর্তব্যনিষ্ঠার কারণেই লাশ রাখার টেবিলগুলোর একটাও খালি নেই।'

'বেশি বাহাদুরি দেখিয়ো না, বুঝলে?' খেঁকিয়ে উঠল হেইডন। 'সিরিয়াল কিলিং শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা হোমিসাইডের লোকেরা অফিসের চেয়ারে পাছা লাগিয়ে কাজ করতে পারছি না একদিনও।'

পিয়ার্স বললেন, 'এতগুলো খুন হলো, তারপরও সাক্ষী পাওয়া গেছে মাত্র একজন। তা-ও সে জোর দিয়ে বলতে পারেনি, ট্রাফিক পুলিশের উর্দিপরা লোকটাই গুলি করেছে কি না মার্টিন বেকার আর ওর সঙ্গের লোকদেরকে। কাজেই আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নেব আমরা হোমিসাইডে।'

'দেখা যাক যে *মাসুদ রানা মাসুদ রানা* বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছে আমাদের বড় স্যররা,' ফোড়ন কাটল হেইডন, 'সে মাসুদ রানা আসলেই কত কাজের।'

'যে লোকটাকে খুঁজছি আমরা,' রাফির লাশের দিকে তাকিয়ে আবারও ভ্রূ কুঁচকালেন পিয়ার্স, 'সে মোটেও অ্যামেচার না। শুধু তা-ই না, লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত। প্রতিটা খুনের সময় ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিল আমাদের কমপক্ষে একজন ট্রাফিক অফিসার, কিন্তু সে কিছু টের পাওয়ার আগেই কাজ সেরে নির্বিঘ্নে কেটে পড়েছে খুনি।'

রাফির লাশের দিকে তাকিয়ে আছে রানাও, বুলেটের ক্ষতগুলো দেখছে একদৃষ্টে, কী যেন ভাবছে আনমনা হয়ে। হঠাৎ জানতে চাইল, 'রাফিকে যখন খুন করা হয় তখন পেট্রলম্যান হিসেবে ধারেকাছে দায়িত্ব পালন করছিল কে?'

'ডেল কার্সন...সম্ভবত,' সমর্থনের আশায় হেইডনের দিকে তাকালেন পিয়ার্স।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল হেইডন।

হেইডনের দিকে তাকাল রানা। 'আমাকে তোমার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে নাও, আপত্তি নেই আমার, কিন্তু আমাকে আমার মত কাজ করতে দিতে হবে, অন্তত কোনও কোনও ক্ষেত্রে। সমস্যা থাকলে সাফ জানিয়ে দাও আগেই।'

'সমস্যা নেই, কিন্তু তোমারও যেন মনে থাকে, ক্ষেত্র শব্দটার আগে কোনও শব্দটা উচ্চারণ করেছ দু'বার। বুঝতে পেরেছ কী বলতে চেয়েছি? যদি না পেরে থাকো তা হলে বলছি, আমার অধীনে থাকতে হবে তোমাকে। বুঝতেই পারছ, র‍্যাঙ্ক সমান হলেও সিনিয়র আমিই। কী করছ না করছ সে-রিপোর্ট সবার আগে দাখিল করতে হবে আমার কাছেই।'

'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!' ঠাট্টার ছলে বলল রানা।

কথাটার মানে জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন। রানা অনুবাদ করে শোনাতেই- হেসে উঠলেন হা হা করে। কালো হয়ে গেল হেইডনের ফরসা মুখ। ওর দিকে ফিরে রানা বলল, 'দেখো, হেইডন, 'সিনিয়র-জুনিয়রের প্রশ্নই ওঠে না। তোমার খেয়াল রাখতে হবে, তুমি এখানে চাকরি করো, আমি না; আমাকে সাধাসাধি করে ডেকে আনা হয়েছে তোমাকে নয়, পুলিশ বিভাগকে সাহায্য করার জন্যে। মুখে-মুখে হম্বিতম্বি যতই যা করো, আমার ফাইনাল রিপোর্ট দেব আমি ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড ও মিস্টার উইলিনস্কির কাছে। ইন দ্য মিন টাইম, তোমার মুখটা

একটু সামলে রাখলে ভালো করবে।'

ভুরু কুঁচকে আরেক দিকে চেয়ে রইল হেইডন।

'আগামীকাল সকাল থেকে ব্যালিস্টিক রিপোর্টগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতে চাই আমি।'

'ব্যালিস্টিক রিপোর্ট? কেন?' টিটকারি মারল হেইডন। 'হাতি-ঘোড়া গেল তল, রানা বলে কত জল। ওগুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ করা হয়ে গেছে আমাদের। পড়তে পড়তে সবগুলো রিপোর্ট মুখস্থও হয়ে গেছে আমার। কিছু জানার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, তোমার কৌতূহল মেটানোর জন্য আমিই যথেষ্ট।'

'তোমার যথেষ্ট জ্ঞানের কারণেই পুলিশের মর্গে লাশ রাখার আর জায়গা হচ্ছে না, তা-ই না?' শান্ত গলায় বলল রানা।

জোঁকের মুখে লবণ পড়লে যে-অবস্থা হয়, ঠিক সেভাবে চুপসে গেল হেইডন।

পিয়ার্স বললেন, 'রানা, রিপোর্টগুলো দেখতে চাচ্ছেন, দেখুন। অসুবিধা নেই। নতুন কিছু বের করতে পারলে আমাদেরই লাভ। কিন্তু আমিও হেইডনের মত আশা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের সিরিয়াল কিলার খুবই প্রফেশনাল। আমার মনে হয় ব্যালিস্টিক রিপোর্টগুলো আপনার সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু করবে না। চেষ্টা করে দেখুন আর কোনওভাবে কিছু করা যায় কি না।'

'তা তো করবই,' বলল রানা। 'আমি ফাইলওয়ার্ক-ফিল্ডওয়ার্ক দুই পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল, কিন্তু গেল না, আবার মুখোমুখি হলো হেইডনের। 'যদি তোমাকে না বলে থাকি, তা হলে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সবজান্তার ভান করাটা কিন্তু স্মার্টনেস নয়।' আর অপেক্ষা না করে হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে।

নিজের গ্যারেজে যখন গাড়ি পার্ক করছে রানা, তখন ঘড়ির কাঁটা

রাত বারোটা ছুঁই ছুঁই করছে।

ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছে ও। এই ক্লান্তি যতটা না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, সহজ কোনও পথ আছে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডগুলো সমাধানের। কিন্তু যতই ভাবছে ও পথটা নিয়ে, ততই কোনও না কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা সরিয়ে দিচ্ছে ওকে সেই চিন্তা থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, এমন সময় খুলে গেল নীচতলার দরজাটা।

পাতলা ফিনফিনে নাইটি পড়ে গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে নিকি, করিডোরের উজ্জ্বল আলোর কারণে মেয়েটার শরীরের ভাঁজখাঁজ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

রানাকে দেখে হাই তুলল অথবা হাই তুলবার ভান করল সে। 'অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

আশ্চর্য হওয়ার ভান করল রানা। 'চলে যাওয়ার আগে তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম নাকি? মনে পড়ছে না তো!'

'তোমার অসুবিধাটা কী, বলো তো?' মনে হচ্ছে রেগে যাচ্ছে নিকি। 'মেয়েদেরকে দেখতে পারো না? নাকি *গে?* অথবা শারীরিক কোনও সমস্যায় ভুগছ না তো?'

'এসবের কোনওটাই না,' হাই তুলল রানা, হঠাৎ করেই ঘুম পাচ্ছে ওর। 'যেটা না চাইতেই পাওয়া যায়, কেন যেন সেটার ওপর রুচি আসে না আমার। আফটার অল, প্রেম-ভালোবাসার সঙ্গে দৈহিক আকর্ষণের একটা সম্পর্ক আছে, অস্বীকার করতে পারবে না কেউই। ...গুডনাইট।'

বারো

এমনিতে ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর লম্বা মেডিটেশন, কিছু এক্সারসাইয, দাড়ি কামানো, শাওয়ার নেয়া, সবশেষে ব্রেকফাস্ট, এই হলো রানার প্রাত্যহিক রুটিন। কিন্তু আজ সেটার ব্যতিক্রম করল ও। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শাওয়ারের নীচে, গতরাতের ক্লান্তিটাকে ধুয়ে বিদায় করতে চায়। তারপর শেভ করে বের হলো বাথরুম থেকে, ব্যায়ামটা আজকের মত বাদ। নীল হাফহাতা শার্টের সঙ্গে ম্যাচ করে ছাইরঙা গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট পরল, ইন করল না। চকচকে কালো শু পায়ে গলিয়ে, পাতলা একটা বাদামি জ্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে। কোনও রেস্টুরেন্টে নাস্তা সারবে আজ, ঘরের রসদ ফুরিয়েছে। গাড়ি নিল না; কাল রাতে মর্গ থেকে ফেরার পর ফোন করে জানিয়েছিল শায়লাকে সকালে কাজ আছে, যেন তৈরি থাকে গাড়ি নিয়ে।

এজেন্সির কথা ভেবে খারাপই লাগল রানার। মাথার ওপর শায়লা নেই বলে বাকি চারজন টুকটাক কাজ ছাড়া ধরতে গেলে বসাই। যে কাজটা হাতে নিয়েছে ওরা সেটা অনেক বেশি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। এ-কাজে সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এই শহরে থাকবে কি থাকবে না। তাই পুরো মন, মেধা ও শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা দু'জন।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট

সারতে সারতে শায়লাকে ফোন দিল রানা। 'উঠেছ ঘুম থেকে?'

'হ্যাঁ,' ঘুমজড়ানো গলায় বলল মেয়েটা, হাসল। 'তবে আরেকটু গড়াগড়ি দিতে পারলে ভালো লাগত।'

'বিয়ের আগেই ধুমসি হতে না চাইলে সময় থাকতে গড়াগড়ির অভ্যাসটা ত্যাগ করো, শায়লা। আমি তো সেই সাত-সকালে উঠে পুলিশ বিল্ডিং-এ পৌঁছে কাজে লেগে গেছি।'

'চাপা মারার জায়গা পান না, মাসুদ ভাই?'

'অ্যাঁ!' চমকে গেল রানা। 'তুমি বিশ্বাস করছ না আমার কথা?'

'কী করে করি? নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কেমন করে?' হাসল শায়লা, 'পষ্ট দেখলাম, এইমাত্র রেস্তোরাঁয় ঢুকে নাস্তার অর্ডার দিলেন।'

অবাক চোখে চারপাশে চেয়ে শায়লাকে দেখতে পেল রানা, দিব্যি কোণের একটা টেবিলে বসে খিলখিল করে হাসছে ওর দিকে চেয়ে। কানে ধরা মোবাইল সেট।

লাইন কেটে দিয়ে হাসল রানাও। হাতছানিতে ডাকল। শায়লা একটা চেয়ার টেনে বসতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এই সাত-সকালে এখানে কী করছ তুমি?'

'গড়াগড়ি দিচ্ছি, নইলে ধুমসি হব কী করে! সেই সক্কাল থেকে বসে আছি...ভুলে গেলেন? আপনার না আজ সকালে ওয়েলিংটন অ্যাভিনিউ-এ যাওয়ার কথা?'

'ওহ্-হো, বলিনি বুঝি, সেটা এখন আর অতটা জরুরি নয়। গতরাতে আমাদের বদলি করা হয়েছে হোমিসাইডে। এসো, কী খাবে? খেয়ে নিয়ে সত্যিই ছুটতে হবে পুলিশ বিল্ডিং-এর দিকে।'

'আমি বাসা থেকে নাস্তা করে এসেছি। এক কাপ কফি চলতে পারে।' হাতের ইশারায় বেয়ারাকে ডাকল শায়লা।

ওয়েলিংটন অ্যাভিনিউ-এর কাজটা শায়লার ওপর চাপিয়ে

দিয়ে রানা নেমে গেল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

কাজ সেরে ফিরে এসে শায়লা যখন পৌঁছুল ব্যালিস্টিক ল্যাবে, ততক্ষণে অ্যান্থনি স্কারযা নামের এক টেকনিশিয়ানকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে রানা।

একটা টেবিলের ওপর কিছু ফাইল আর একগাদা রিপোর্ট নিয়ে কথা বলছিল দু'জন, শায়লাকে ঢুকতে দেখে ওকে একনজর দেখে নিয়ে স্কারযা বলল, 'মাইক্রোস্কোপটা সেট করা আছে।'

কফি মেশিন থেকে ডিস্পোযেবল কাপে এক কাপ কফি নিয়ে মাইক্রোস্কোপের কাছে চলে এল রানা। উৎসুক ভঙ্গিতে দু'হাত ঘষল, তারপর চোখ রাখল মাইক্রোস্কোপের আইপিস লেন্সে।

সিরিয়াল কিলারের ক্রাইম সিন থেকে বেশ কিছু বুলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ, কিছু বুলেট পাওয়া গেছে ভিক্টিমদের মৃতদেহ থেকেও। সবগুলো নমুনা আছে ব্যালিস্টিক ল্যাবে। সে-রকম কয়েকটা বুলেট চেয়ে নিয়েছে রানা স্কারযার কাছ থেকে।

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিসদৃশ দুটো বুলেট রাখল ও মাইক্রোস্কোপের স্টেজে। কোর্স ফোকাস আর ফাইন ফোকাস বার বার ঘুরিয়ে একটা বুলেটের সঙ্গে আরেকটা বুলেটের খাঁজ মেলাল, স্ট্রাইয়েশন মেলাল। এরপর তৃতীয় একটা বুলেট নিয়ে প্রথমদুটোর সঙ্গে ক্রস ম্যাচ করল সেটাকে।

গাড়ির বডি, অথবা ক্রাইম সিনের অন্যান্য ভারী ধাতব বস্তুতে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বুলেটগুলো; স্বাভাবিক আকৃতি হারিয়েছে। তারপরও, অনেক সময় নিয়ে ক্রস ম্যাচিং করার কারণে, রানার মনে হচ্ছে পারফেক্ট ক্রস ম্যাচিং হয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক মিলে গেছে বুলেটগুলো।

তারমানে, ধরে নেয়া যায়, একই পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছে।

ঠোঁট বাঁকা করল রানা, ভেংচিটা কার উদ্দেশে বোঝা গেল না

ঠিক। মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে সরে এসে একটা সুইভেল চেয়ারে বসে পড়ল ও, হেলান দিল আরাম করে। শায়লা আর স্কারযার দিকে তাকাল। ল্যাবের জানালার কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে, চোখেমুখে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ঝকঝকে সকালের উজ্জ্বল রোদ এসে ঢুকছে ল্যাবে খোলা জানালা দিয়ে, আলোকিত করে তুলেছে পুরো ঘরটাকে।

'তিনটা বুলেট মেলালাম,' স্কারযাকে বলল ও, 'তিনটেই প্রায় খাপে খাপে মিলে গেল একটা আরেকটার সঙ্গে। বাকিগুলোর কী অবস্থা?'

ঘাড় চুলকাল স্কারযা। 'একই। আমাদের ধারণা, প্রতিটা খুনেই ব্যবহার করা হয়েছে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম। ভিক্টিমদের শরীর ফুঁড়ে যেগুলো বেরিয়ে গেছে সেগুলো শক্ত কিছুতে লেগে একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে। আর যেগুলো শরীরের ভেতর পাওয়া গেছে সেগুলোও প্রায় সমানই বিকৃত হয়েছে। "হলো পয়েন্ট" বুলেট, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ছোঁড়া...বুঝতেই পারছেন। মাত্র এই তিনটে পাওয়া গেছে মোটামুটি আস্ত, যেগুলো উদ্ধার করা গেছে সেগুলোর প্রায় কোনওটাই ক্রস ম্যাচিং-এর জন্য উপযুক্ত অবস্থায় নেই। হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র রাখতে পেরেছি মাইক্রোস্কোপের স্টেজে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে হলো পয়েন্ট বুলেট ভিক্টিমকে যেমন ছ্যাত্‌রা-ভ্যাত্‌রা করে ফেলে, ওগুলোর নিজেদের অবস্থাও হয় তথৈবচ। বুলেট এতখানি ড্যামেজ্‌ড হলে আর ম্যাচিং করা যায় না। সিরিয়াল কিলারের লেটেস্ট ভিক্টিম, মানে রাফি নামের লোকটা গুলি খেয়েছে সবচেয়ে কাছ থেকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, মাত্র একটা বুলেট উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা ক্রাইম

সিন থেকে। বাকিগুলো লোকটার শরীর ভেদ করে, এমনকী গাড়ির বডি ছিদ্র করে বেরিয়ে গেছে।'

কী মনে হতে চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা, আবার এগিয়ে গেল মাইক্রোস্কোপের দিকে, চোখ রাখল আইপিস লেন্সে। ওর ঠোঁটদুটো একটা আরেকটার সঙ্গে চেপে বসেছে দৃঢ়ভাবে, কোর্স ফোকাস আর ফাইন ফোকাস নিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করছে ও। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিকই বলেছ, স্কারযা। থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম ব্যবহার করছে আমাদের সিরিয়াল কিলার। আরেকটা কথা। পিস্তলের ব্যারেলটা টার্গেট গ্রেডের।'

'সম্ভবত,' মাথা ঝাঁকাল স্কারযা। 'কিন্তু সেটা জেনে লাভ কী?'

'তেমন কোনও লাভ সত্যি নেই, আবার আছেও। সিরিয়াল কিলারের ব্যাপারে একটা অতিরিক্ত তথ্য জানার মানে হলো, খোঁজের পরিধি আরেকটু ছোট হওয়া।' আইপিস লেন্স থেকে চোখ তুলল রানা। 'পরিধিটা যত ছোট হবে আমাদের তত লাভ, না?'

তেতো হাসি হাসল স্কারযা। 'হ্যাঁ, আমাদের লাভই বটে। পরিধিটা ছোট হতে হতে শেষপর্যন্ত সে-পরিধির ভেতরে কে আটকা পড়তে পারে, জানেন? আপনার-আমার মতই কোনও পুলিশ অফিসার।'

স্থির দৃষ্টিতে স্কারযার দিকে তাকাল রানা। 'কেন বললে কথাটা?'

'নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না আপনাকে, হেইডনের সন্দেহের তালিকায় একনম্বর নামটা হচ্ছে ক্যাভিস হ্যারিংটন। সে একজন বিকারগ্রস্ত পুলিশ অফিসার, অ্যানুয়াল শুটিং কমপিটিশনে কয়েকবারের চ্যাম্পিয়ন, সবচেয়ে বড় কথা সে এমন একজন মানুষ যে খুনিদেরকে খুন করাটাকেই সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচার বলে মনে করে।'

'কথাটা মন্দ বলেননি স্কারযা,' সুর মেলাল শায়লা। 'হতে পারে, হ্যারিংটনই সেই সিরিয়াল কিলার যাকে আমরা খুঁজছি। ডিপার্টমেন্টের যতজনের সঙ্গে কথা বলেছি ওর ব্যাপারে, সবাই বলেছে, আউট ল'দের বিরুদ্ধে যতখানি বিষ আছে ওর মনে, ততটা আর কারও নেই।'

'আউট ল'দের বিরুদ্ধে বিষ আমার মনেও আছে,' বলল রানা, 'এবং সেটার পরিমাণও নেহায়েত কম নয়। সেজন্যে কি আমাকেও সন্দেহ করবে?'

স্কারযার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল শায়লা। 'আমরা আসলে একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। তা ছাড়া হ্যারিংটনের ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত মত কী জানি না, মাসুদ ভাই, কিন্তু ডিপার্টমেন্টের অনেকেই ওর ওপর নাখোশ। যেদিন থেকে কিলিংগুলো শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে ডিউটিতে অনিয়মিত হয়ে গেছে সে। আর মার্টিন বেকার মারা যাওয়ার পর থেকে তো একরকম লাপাত্তাই বলা যায় ওকে। সময়মত ডিউটিতে আসে না। কোথায় থাকে, কেউ জানে না। কী করে, তা-ও জানা নেই কারোরই।'

'হ্যারিংটনকে সন্দেহের বাইরে রাখছি না আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু দিল্লি এখনও অনেক দূরে।'

'মানে?' রানার কথাটা বুঝতে পারেনি স্কারযা।

'মানে সিদ্ধান্ত নেয়ার মত সময় হয়নি এখনও। ...স্কারযা, রাফির গাড়িটা দেখতে চাই আমি। সম্ভব?'

'সম্ভব। চলুন।'

গ্যারেজে হাজির হলো তিনজনে।

এককোনায়, তেতে ওঠা সূর্যালোকের নীচে, নিথর দাঁড়িয়ে আছে রাফির গাড়িটা। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় না, কারও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের নীরব সাক্ষী ওটা। কাছে গেলে টের পাওয়া

যায় ব্যাপারটা।

বুলেটের ট্রাজেক্টরি বোঝানোর জন্য হুকওয়ালা হলদে-সবুজ তার ব্যবহার করা হয়েছে। ড্রাইভিং সিটে যতগুলো "ক্ষত" আছে সবগুলো থেকে বেরিয়ে আছে ওসব তার, মিলিত হয়েছে একজায়গায়--যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছিল খুনি সেখানে একটা কাল্পনিক অবস্থান তৈরি করে আটকে আছে একটা ইস্পাত দণ্ডের সঙ্গে। গাড়িটা দেখে কেন যেন হারপুনবিদ্ধ তিমির কথা মনে পড়ে গেল রানার। এদিক-ওদিক তাকাল ও। গ্যারেজের আরেক কোনায় কাজ করছে কয়েকজন টেকনিশিয়ান, মার্টিন বেকারের লিমাযিনটাতেও হলদে-সবুজ তার লাগানো হয়েছে।

'লোকটা যে-ই হোক না কেন,' নীরবতা ভাঙার উদ্দেশ্যে বলল স্কারযা, 'খুনগুলো করার সময় উপভোগ করেছে ব্যাপারটা। মার্টিন বেকার আর রাফিসহ অন্তত চারটে অ্যাটেম্পটের বেলায় আমরা নিশ্চিত, প্রথম গুলিতেই মারা পড়েছিল ভিক্টিম। তারপরও ম্যাগনামের চেম্বার খালি করেছে সে লাশের গায়ে।'

'বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের কাজ,' বলল শায়লা। 'অথবা কত দ্রুত কত নিখুঁতভাবে টার্গেট ভেদ করতে পারে জানার জন্যও করে থাকতে পারে।'

'নিখুঁতভাবে?' শব্দটা ধরল স্কারযা। 'এরচেয়ে নিখুঁত আর কী হতে পারে, বলুন? প্রায় প্রতিটা লাশের শরীরে দু'-এক জায়গা বাদে অন্য কোথাও বুলেটের ক্ষত নেই, আবার একই জায়গা দিয়ে ঢুকেছে একাধিক বুলেট। আমারও ধারণা, খুন করার পর ভিক্টিমকে নিয়ে স্রেফ টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে লোকটা।'

'মুদ্দাফরাশের কাজ সহজ হয়েছে,' তিক্ত গলায় বলল শায়লা। 'লাশগুলোকে মর্গের টেবিলে শুইয়ে সুঁই-সুতোর কাজ তেমন একটা করতে হয়নি।'

ধীর পায়ে হেঁটে ইস্পাত দণ্ডটার পাশে দাঁড়াল স্কারযা। 'ঠিক

এখান থেকে গুলি চালিয়েছিল খুনি। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ,' আনমনে স্পর্শ করল ধাতব দণ্ডটা।

'জিযাস!' বিড়বিড় করে বলল শায়লা, ঘটনার ভয়াবহতা কল্পনা করে শিউরে উঠে বুকে ক্রস আঁকল।

ওকে আড়চোখে দেখে নিয়ে স্কারযার দিকে তাকাল রানা। 'রাফির লাইসেন্স পাওয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল স্কারযা। 'গেছে। সঙ্গে আর কী পাওয়া গেছে, জানেন? এক শ' ডলারের দুটো নোট। পুলিশ যখন গিয়ে রাফির লাশ পায়, তখন ওর পায়ের কাছে পড়ে ছিল লাইসেন্স আর নোটদুটো।'

'পায়ের কাছে পড়ে ছিল?' কথাটা ধরল রানা। 'কেন? ওখানে তো থাকার কথা না!'

'হুঁ, ওখানে থাকার কথা না। যে-কোনও কারণেই হোক, লাইসেন্সটা বের করতে হয়েছিল ওকে।'

'ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে বেকারের ড্রাইভারের বেলায়,' বলল শায়লা।

'এবং একটা বাচ্চাছেলেও জানে, হাইওয়েতে কেবল একটা সময়েই লাইসেন্স বের করার দরকার হয় কোনও ড্রাইভারের--যখন একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসার দেখতে চায় সেটা।'

'আবারও সেই ট্রাফিক পুলিশ অফিসার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শায়লা। 'তারমানে আবারও ক্যাভিস হ্যারিংটন।'

রানাকে একনজর দেখে নিয়ে স্কারযা বলল, 'হ্যারিংটন কি না জানি না, তবে আপাতদৃষ্টিতে একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসারের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় হত্যাকাণ্ডগুলোর পেছনে। আবার এটাও বলা যায়, আমাদের অতি চালাক খুনি কখনও কখনও ট্রাফিক পুলিশের বেশ ধরে করছে খুনগুলো, যাতে ওকে ট্রেস করতে বেগ

পেতে হয় আমাদের।'

'রাফিকে যখন খুন করা হয়, তখন বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সে-রকম কোনও আলামত পেয়েছ?'

'না, পাইনি। কারণ বাধা দেয়ার সুযোগই পায়নি লোকটা সম্ভবত। ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে খুনি। ওর গাড়িতে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট পিস্তল পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করেনি সে। ওকে সে-সুযোগ দেয়নি খুনি। একেবারে প্রফেশনাল কাজ।'

'তারমানে,' রানার দিকে তাকাল শায়লা, 'ধরে নেয়া যায়, খুনির সঙ্গে পূর্বশত্রুতা নেই ভিক্টিমদের কারোরই। যদি ওকে চিনতে পারত ভিক্টিমরা, কেউ না কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করতই।'

'অথবা,' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার, 'যদি চিনেও থাকে, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি গুলি চালাবে লোকটা।'

ঠিক দশটায় হোমিসাইডের কয়েকজন গোয়েন্দার সঙ্গে রানা আর শায়লাকে প্রোজেকশন রুমে ডেকে পাঠাল হেইডন।

সবাই আসার পর রুমের ডেস্কটপ কম্পিউটার আর প্রোজেক্টরটা চালু করল হেইডন, পকেট থেকে পেনড্রাইভ বের করে ঢুকিয়ে দিল ইউ.এস.বি. পোর্টে। ব্যস, কোনও ভূমিকা ছাড়াই শুরু হয়ে গেল ওর প্রেযেন্টেশন।

একটা একটা করে স্লাইড আসছে, এখন পর্যন্ত যাদেরকে খুন করেছে সিরিয়াল কিলার তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। এলএপিডি'র ফটোগ্রাফার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তুলেছে ছবিগুলো, বেছে বেছে সবচেয়ে ভালোটা আলাদা করেছে হেইডন প্রত্যেক ভিক্টিমের ক্ষেত্রে, সেটাই দেখাচ্ছে আর নামগুলো জানাচ্ছে ওর শ্রোতাদের। জানাচ্ছে ভিক্টিমদের ডিটেইলস, এবং কোনও

কোনও ক্ষেত্রে বায়োগ্রাফিও। প্রতিটা ছবি স্ক্যান করে স্লাইডে দেয়ার আগে ভিক্টিমের চেহারায় লাল মার্কারপেন দিয়ে ক্রস চিহ্ন দিয়েছে।

বর্ণনা শেষ করে সিগার ধরাল সে। ঘন ঘন টান দিচ্ছে সিগারে, বোঝা গেল আরও কিছু স্লাইড দেখানো বাকি আছে ওর।

দ্বিতীয় দফায় যে-স্লাইডগুলোর প্রদর্শনী শুরু হলো, সেগুলোর কোনওটাতেই লাল কালির ক্রস চিহ্ন নেই।

'আলবার্ট ক্যাভেনডিশ,' প্রথম স্লাইডের ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ, টেকো আর বিকট চেহারার লোকটাকে দেখিয়ে বলছে হেইডন, 'ক্যাভি দ্য বুল'স আই নামে যার কুখ্যাতি বেশি। একজন প্রথম শ্রেণীর হিটম্যান। লোকটা উচ্চশিক্ষিত। সমাজবিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী, পরে স্নাতকোত্তর করার সময় লেখাপড়া বাদ দেয়, কীভাবে যেন জড়িয়ে পড়ে আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। একসময়কার গডফাদার আর মাফিয়া বসদের হয়ে ভাড়া খাটতে শুরু করে। ওর নাম বুল'স আই হওয়ার কারণ, গুলি করে টার্গেট ভেদ করতে ওর জুড়ি মেলা ভার। কী হালকা কী ভারী, কী খাটো কী লম্বা, কী নতুন কী পুরনো--যে-কোনও আগ্নেয়াস্ত্রে ওর হাত সাংঘাতিক। তবে গত দু'-চার বছর ধরে ডাইরেক্ট অ্যাকশনে খুব কম যাচ্ছে ক্যাভি। ইদানীং ওর ডান হাত যদি লস অ্যাঞ্জেলেস আর আশপাশের মাদকসাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে, তা হলে বাঁ হাত আড়ালে থেকে চালাচ্ছে এখানকার বেশ্যার দালালদের। সমাজের বিভিন্ন মহলে ওর যেমন বন্ধু আছে, তেমন শত্রুও আছে। ...আমাদের সিরিয়াল কিলারের লেটেস্ট ভিক্টিম রাফি, ওর হত্যাকাণ্ডকে দালালির বখরা নিয়ে মনোমালিন্যের পরিণাম হিসেবে অনুমান করছি আমরা। এবং সেক্ষেত্রে নেপথ্যে থাকা লোকটার ক্যাভি দ্য বুল'স আই হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।' থামল সে, ক্যাভির

চেহারাটা মনে গেঁথে নেয়ার সময় দিচ্ছে ডিটেকটিভদের। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হ্যালেক আর ডেডরিক, ক্যাভি তোমাদের। এখন থেকে ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি করবে তোমরা, কোনও ডেভেলপমেন্ট হলেই জানাবে আমাকে।'

চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির কাজ মোটেও পছন্দ না চার্লি হ্যালেকের, কারণ স্নায়ুবিধ্বংসী কাজটাতে ছোট-বড় ভুল করেছে সে আগে কয়েকবার। তাই, প্রোজেকশন রুমের অন্ধকারে ওকে হেইডন দেখতে পাবে না জেনে, ভেংচি কাটল লেফটেন্যান্টের উদ্দেশে। ওদিকে লেংথ অভ সার্ভিস অনুযায়ী সময়মত প্রমোশন না পাওয়ায় মাঝবয়সী লী ডেডরিক বেশিরভাগ সময়ই হতাশ থাকে, হেইডনের ঘোষণাটা শোনার পর হতাশা আরও বাড়ল লোকটার। কারণ, ওর ধারণা, ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডগুলোর নেপথ্যে কেউ নেই, এগুলো আদৌ ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড নয়, তাই ওর মনে হচ্ছে হেইডনকে কোনও ডেভেলপমেন্ট দিতে পারবে না সে। ফলে আরও ফিকে হবে ওর প্রমোশনের সম্ভাবনা।

কিন্তু দু'জনের কেউই হেইডনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না।

প্রোজেকশন স্ক্রীনে ততক্ষণে আবির্ভূত হয়েছে আরেকটা স্লাইড। একটা গ্রুপ ছবি দেখা যাচ্ছে এখন, মোটাসোটা শরীর আর শক্তপোক্ত চেহারার জনা ছয়েক লোককে দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে। উজ্জ্বল বাহারি রঙের শার্ট পরে আছে সবাই, হাসি একান-ওকান হয়ে গেছে ওদের। পেছনের দৃশ্য দেখলে মনে হয় কোনও গল্ফকোর্সে তোলা হয়েছে ছবিটা। পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, ছ'নম্বর মানুষটা একটু দূরে। ওই পাঁচজন তাকিয়ে আছে ষষ্ঠ লোকটার দিকে। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ দেখে রানা বুঝল, আলাদা লোকটা আর কেউ নয়--

মার্টিন বেকার। কোনও একটা টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল, পুরস্কার জিতেছে, সে-কারণে এত খুশি ওর।

কিন্তু মার্টিন বেকারকে দেখানোর জন্য স্ক্যান করা হয়নি ছবিটা। যে-পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে, তাদের একজনের চেহারা ঘিরে গোল দাগ দেয়া হয়েছে গ্রিয পেন্সিলের সাহায্যে। এই লোকটা, খেয়াল করল রানা, অন্য সবার চেয়ে বেশি মোটা।

'রানা,' এমনভাবে ডাকল হেইডন যেন রানার সঙ্গে জনম জনমের দোস্তি ওর, 'মোটকুকে খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই? তোমার স্পেশাল ট্যালেন্টের কথা বিবেচনা করে ওর দায়িত্ব দিচ্ছি তোমাকে।'

হেইডনের আবছা চেহারার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবারও মোটকুর দিকে তাকাল রানা। সানগ্লাস পরা লোকটাকে দেখে কেন যেন বুলডোযারের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। জিজ্ঞেস করল, 'নাম কী এই বুলডোযারের?'

'বুলডোযার?' হাসল হেইডন, হাসল কয়েকজন ডিটেকটিভও। 'ভালো বলেছ। ওর নাম শর্টি টার্নার। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওজন ছিল তিন শ' দুই পাউণ্ড। সাতাশটা খুনের অভিযোগ আছে লোকটার বিরুদ্ধে, একটাও প্রমাণ করতে পারেনি পুলিশ। বয়সকালে ঘুম হারাম করে ছেড়েছে এলএপিডি'র, ইদানীং ঘুম হারাম হয়ে গেছে নিজেরই। কারণ অনেকদিন থেকে ভুগছে জটিল আলসার আর মাইগ্রেনে। ব্যথা যখন ওঠে, বিশেষ করে আলসারেরটা, তখন স্রেফ কুত্তাপাগল হয়ে যায়। হাতের সামনে যাকে পায় তাকে ফ্রি-স্টাইল কুস্তির মার মেরে ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। শেষ যে-সাতটা খুনের অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে, তাদের তিনজনের বেলায় নিজের বিশাল শরীরটা বাদে অন্য কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেনি--পুলিশের সে-রকমই ধারণা,

কারণ প্রতিটা কেসে ময়নাতদন্ত রিপোর্টে লেখা ছিল: মারাত্মক প্রহারজনিত আঘাত।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল কয়েকজন ডিটেকটিভ, ঠিক বোঝা গেল না।

হেইডন বলে চলল, 'এককালে বেকারের সঙ্গে কাজ করেছে টার্নার। সঙ্গে কাজ করেছে না বলে আসলে বলা উচিত ছিল, বেকারের হয়ে কাজ করেছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অনেকেই বলাবলি করত, বেকারের ডান হাত ছিল টার্নার। আমাদের কাছে প্রমাণ নেই, কিন্তু অভিযোগ আছে--বেকারের কথামত গোটা দশেক খুনও করেছে সে। ...এ-রকম ভয়ঙ্কর একটা লোককে সামলানোর দায়িত্ব মাসুদ রানা ছাড়া আর কাকে দিতে পারি আমি?'

'তোমার উদার হৃদয়ের যেমন তুলনা হয় না,' শীতল গলায় বলল রানা, 'তেমনই তোমার যুক্তিবুদ্ধির গুণগান গেয়ে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আমার মনে হয়...'

'তোমার কী মনে হয় না-হয় তাতে কিছু যায়-আসে না আমার।'

'...এই সিরিয়াল কিলিংগুলোর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই টার্নারের,' শেষ করতে না পারা কথাটা শেষ করল রানা।

'চুপ!' ধমক দিল হেইডন। 'হোমিসাইডে যদি থাকতে চাও, টার্নারকে নিজের মুঠোর ভেতরে রাখবে। যদি না পারো...। মনে রেখো, হোমিসাইডের চিফ আমিই, এখানে আমার সিদ্ধান্তই আইন।'

'জোর করে নিজের সিদ্ধান্তকে আইনে পরিণত কোরো না, হেইডন। টার্নারের যে-বর্ণনা দিলে, সেটার সঙ্গে সিরিয়াল কিলিংগুলোর স্টাইল কোনওভাবেই মেলে না। টার্নার যদি সাতাশটার জায়গায় সত্তরটা খুনও করত, তবুও একই কথা

বলতাম আমি।'

প্রোজেকশন রুমের ডিটেকটিভরা, এমনকী শায়লাও, ঘাড়টা কুঁজো করে আরেকটু দেবে বসল যার যার চেয়ারে, কারণ, বুঝতে পারছে, এখনই "গোলাবর্ষণ" শুরু করবে বদমেজাজি হেইডন। লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা নির্নিমেষ, রানার সঙ্গে ওর দ্বৈরথ উপভোগ করছে কিছুটা হলেও।

'মাসুদ রানা! যা বলছি করো,' গোলাবর্ষণের বদলে সাপের মত হিসহিস করল হেইডন, চেহারাটা আবছাভাবে দেখা গেলেও বোঝা যাচ্ছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'তোমার যে-নাকটা নরকে যাবেই, দয়া করে সেটাকে আঠার মত সাঁটিয়ে রাখো টার্নারের পাছার ফুটোয়। সে যদি একটা বায়ুও ত্যাগ করে, আমি যেন জানতে পারি গন্ধটা কেমন।'

'আর যদি মল ত্যাগ করে?' নির্বিকার ভঙ্গিতে জানতে চাইল রানা, 'চেখে দেখার জন্যে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে?'

হেসে উঠল ঘরের সবাই। অপমানে লাল হয়ে উঠল হেইডনের চেহারাটা, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। আবারও মুখ খুলল রানা, 'প্রতিপাদ্য বিষয় হলোঃ আবারও বলছি, আমার সঙ্গে মুখ সামলে কথা বলবে। কারণ, ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখবেঃ তুমি এলএপিডি'র চাকর, আমি তা নই। এবার বলো কী বলছিলে।'

অধস্তন অফিসারদের সামনে এমন অপদস্থ হয়ে কাঁপতে শুরু করল হেইডন। নিজের দোষেই ধাক্কা খেয়েছে দেয়ালের গায়ে। তবে সামলে নিল অল্পক্ষণেই। বিষদৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে নরম গলায় বলল, 'আশা করি তুমি কোনও রিপোর্ট দেয়ার আগেই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে অ্যারেস্ট ওয়ার‍্যান্ট ইস্যু করাতে পারব লোকটার নামে। আর অ্যাসাইনমেন্টটা যদি ভালো না লাগে

তোমার...সরাসরিই বলি, যদি ভয় পেয়ে থাকো, তা হলে সবার সামনে খোলাখুলি বলো, তোমার অনারারি অফিসারগিরি থেকে যাতে মুক্তি পাও, সে-ব্যবস্থা করব আমি।' দাঁতে দাঁত পিষল সে। 'শুয়োরের বাচ্চা টার্নারকে আমার চাই-ই চাই। আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে একটা লোক দিব্যি খুনের পর খুন করে যাবে, আর আমাকে চুপচাপ সহ্য করতে হবে সব--তা হবে না।'

ঘরের বাকিরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে রানার দিকে, ওর জবাব শোনার অপেক্ষা করছে।

আশ্চর্য, কিছুই বলছে না রানা, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে হেইডনকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথামতই কাজ হবে।'

তেরো

শর্টি টার্নারের গুদাম থেকে দুই ব্লক দূরে, পার্ক করে রাখা একটা ডেলিভারি ভ্যানের সঙ্গে গাড়ি থামাল শায়লা। ওর পাশের সিটে বসে ছিল রানা, দরজা খুলে নামল।

গুদামটা একতলা, আয়তাকৃতির। বছরের পর বছর ধরে রোদবৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করতে করতে ফিকে হয়ে গেছে বাইরের দেয়ালের রঙ, বাড়িটা নীরবে বলছে নতুন রঙ চাই তার। সদর-দরজায় ঝোলানো সাইনবোর্ডে লেখা আছে: টার্নার ইম্পোর্টেড ফুডস্ কম্পানি।

যারা কোনও না কোনও অবৈধ কারবার করে, অথচ সমাজের

সামনে বলার সময় বুক ফুলিয়ে কোনও একটা হালাল পেশার নাম উচ্চারণ করে, টার্নার তাদেরই একজন; নিজেকে তাই স্বনামধন্য ব্যবসায়ী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে সে, নতুন কেউ জানতে চাইলে বলে, আমি ইটালি থেকে প্যাকেটজাত পাস্তা আর বোতলজাত টমেটো-সস আমদানি করে পাইকারি বেচি। হাল জমানার ছোকরা-ছুকরিদের তো দেশি খাবারের প্রতি আগ্রহই নেই, উদরপূর্তির জন্য তাদের চাই ইউরোপিয়ান, বিশেষ করে ইটালিয়ান ডিশ, তাই ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে ইটালিয়ান এজেন্টদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় আমার।

শায়লাকে নিয়ে গুদামটার ঠিক উল্টোদিকে, একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁর ওপরতলায় চলে এল রানা। খাঁ-খাঁ করছে ফ্লোরটা, কারণ কোনও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাড়া নেয়নি এখনও। গরাদবিহীন জানালার সঙ্গে, কাঠের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল রানা। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখার তেমন কোনও আগ্রহ নেই ওর। পকেট থেকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বের করে ইন্টারনেট চালু করল, উল্লেখযোগ্য কোনও খবর আছে কি না জানার জন্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল একটা নিউয পোর্টাল। দেয়ালের একদিকে মোটামুটি বড় একটা ফাটল আছে, সেটা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল শায়লা। তাকাল গুদামটার দিকে। দেখে মনে হচ্ছে না কেউ আছে সেখানে।

পনেরো মিনিট কাটল, তারপর আধ ঘণ্টা, দেখতে দেখতে চলে গেল ঝাড়া পঞ্চাশটা মিনিট। ওয়েব ঘাঁটা শেষ রানার, মোবাইল ফোনটা নামিয়ে রেখেছে পাশে, চোখ বুজে বসে আছে স্থির হয়ে, দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনিট বিশেক পর চোখ খুলল, লম্বা করে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। সিগারেট ধরাবে কি ধরাবে না ভাবতে ভাবতে ধরিয়েই ফেলল একটা

সিগারেট, কিন্তু দু'-তিনবার টান দিয়ে টের পেল স্বাদ পাচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল হঠাৎ। অস্থির বোধ করছে। 'আমাদের এই অবস্থাকে পিওর বাংলায় কী বলে, জানো?' জিজ্ঞেস করল শায়লাকে।

'কী?'

'ঘোড়ার ঘাস কাটা।'

মন্তব্য না করে হাতঘড়ি দেখল শায়লা। রাত ন'টা বাজে। গতরাতে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে, আজ ছোপ ছোপ কালো মেঘ অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়েছে যেন। গুটিকয়েক স্ট্রিটল্যাম্প যে-আলো দিচ্ছে, তা যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।

ছোঁ মেরে আধখাওয়া সিগারেটটা ঠোঁট থেকে খসাল রানা, হতাশ দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে করে ছেড়ে দিল হাত থেকে, পায়ের কাছে পড়ামাত্র পিষে মারল জুতো দিয়ে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার দিকে, কাছে গিয়ে গুদামের দিকে তাকাল।

অন্ধকারে ডুবে আছে সেটা। কিছুক্ষণ পর একটা লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে, সিগারেট ফুঁকছে। দরজা খোলা রেখেই এগিয়ে আসছিল রাস্তার দিকে, কী মনে করে ফিরে গেল কয়েক কদম, লাগিয়ে দিল দরজাটা। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পায়চারি করল কিছুক্ষণ, তারপর পুরো গুদামটা চক্কর দিল একবার, শেষে আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে উধাও হয়ে গেল।

'রুটিন চেক,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'যাক বাবা,' সন্তুষ্টির দম ছাড়ল শায়লা, রানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, 'অন্তত এটা তো জানতে পারলাম, আমাদের কাটা ঘাসগুলো খাওয়ানোর মত ঘোড়া আছে ওই গুদামে।'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক,' শায়লার দিকে তাকিয়ে হাসল রানাও।

‘কেন?’

‘কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের কথা উল্লেখ করেছ এইমাত্র। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।’

‘কী?’

‘খাওয়া। জানালার পাশে একটা টেবিল নিয়ে বসব আমরা, পেট ভরে ধীরেসুস্থে খাবে তুমি, আর খেতে খেতে চোখ রাখবে গুদামের ওপর। সেই ফাঁকে কিছু স্ন্যাক্স বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়ব আমি। কাজ সেরে ফিরে আসব যত জলদি সম্ভব,’ সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল রানা।

‘কাজ সেরে মানে?’ বুঝতে পারেনি শায়লা।

‘সারা রোযডেনের সঙ্গে দেখা করে আসি। বুদ্ধিটা আরও আগে কেন এল না আমার মাথায়, বুঝতে পারছি না।’

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে টিভির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। জুতোর শব্দ করে এগিয়ে আসছে কে যেন, সম্ভবত সারা রোযডেনই--রানা কলিংবেল টেপায় দেখতে আসছে কে এসেছে।

দরজা খুলে তাজ্জব হয়ে গেল মহিলা রানাকে দেখে। ‘আপনি!’

‘হ্যাঁ, আমি।’

‘আবার কোনও সমস্যা?’

‘ভেতরে আসতে বলবেন না?’

‘ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন,’ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সারা। রানা এগিয়ে গিয়ে লিভিংরুমের সোফায় বসে পড়ার পর বলল, ‘কী খাবেন? বিয়ার, নাকি অন্যকিছু?’

‘ধন্যবাদ। মাত্র ডিনার করলাম।’

‘কিছুই খাবেন না?’

‘না...আচ্ছা ঠিক আছে, এক কাপ কফি চলতে পারে।’

চট করে কফি বানিয়ে নিয়ে এল সারা।

ধূমায়িত কাপ হাতে নিয়ে রানা বলল, 'ক্যাভিস হ্যারিংটনকে খুঁজে বের করা দরকার। এবং সে-ব্যাপারেই আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'কী সাহায্য করতে পারি, বলুন?'

'যদি জানা থাকে, তা হলে বলে দিন কোথায় খুঁজব ওকে।'

প্রশ্নটা শুনে একইসঙ্গে হতাশ আর ভীত বলে মনে হলো সারাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমি...আমি জানি না কোথায় থাকে সে। ওকে খুঁজে বের করতে চাচ্ছেন কেন?'

'কারণ ওর সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলা দরকার।'

'সে কি...মানে...সে কি...' আমতা আমতা করে থেমে গেল সারা, প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারল না শেষপর্যন্ত।

'দেখুন, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ক্যাভিস হ্যারিংটনের ভাগ্যে। যদি জিজ্ঞেস করেন সেটা কী, তা-ও বলতে পারব না। কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে কথাটা বার বার মনে হচ্ছে। নিজেকে হঠাৎ করেই গায়েব করে ফেলেছে ও, এবং চরম ভুলটা করেছে সেখানেই। ওর বর্তমান অবস্থা যা-ই হোক না কেন, ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি, কথা বলতে চাই। বলুন, কোথায় পাওয়া যেতে পারে ওকে?'

ইতস্তত করছে সারা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আসলে।

কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আসা কফির কাপে চুমুক দিল রানা। 'আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সারা, দু'হাতে মুখ ঢাকল। ওই অবস্থাতেই বলল, 'ও ভাবে, ও কোথায় থাকে জানে না কেউ। কিন্তু আমি জানি কথাটা। টপলেস-বটমলেস ড্যান্সারদের একটা

কুখ্যাত জায়গা আছে শহরে, নাম ব্লু ড্রিমস, ওখানেই এক ন্যুড ড্যান্সারের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে আপাতত।'

'নাম কী মেয়েটার?'

'জানি না।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না রানার। কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না, কেন বুঝতে পারছেন না আপনি। আমার হাতে সময় খুব কম, এবং সেটা ফুরিয়ে গেলে ক্যাভিস হ্যারিংটনেরই ক্ষতি।'

'মেয়েটার নাম নায়লা মেরিট। সে এত বেশি খোলামেলা যে, যারা ওর ভক্ত তারাও ওকে নটি বলে ডাকে।'

'এই যে, মিস্টার!' ব্লু ড্রিমসের নিয়ন সাইনের দিকে রানাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডাক দিল বাইরে দাঁড়ানো ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার বডিবিল্ডার গার্ড, 'মেম্বারশিপ পাস না থাকলে হাবার মত তাকিয়ে না থেকে মানে মানে কেটে পড়ো। সব খাসা মাল নিয়ে কারবার আমাদের,এখানে টিকেট বেচে শো দেখানো হয় না, বুঝলে?'

'কী কী দেখাও তোমরা?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

ওকে আপাদমস্তক দেখল গার্ড। 'তোমার জেনে লাভ কী?'

'বাহ্, মেম্বারশিপ পাস জোগাড় করব কি না জানতে হবে না?'

'ও আচ্ছা। তোমার মতলব যদি সেটাই হয়, তা হলে জেনে রাখো ঠিক জায়গাতেই হাজির হয়েছ। কলেজের কচি কচি খুকিরা নাচ দেখায় এখানে, বুঝলে? কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে ওরা কলেজে পড়ে না, তা হলে...। থাক, বাকিটা আর বলতে চাই না। আমাদের ইরোটিক লাভ ড্যান্স দেখলে সত্তর বছরের বিপত্নীক বুড়োরও মাথা বিগড়ে যাবে, পাগল হয়ে উঠবে বিয়ে করার জন্য।

আরও একটা শো আছে আমাদের...সেটা অবশ্য বেশি মালদার পার্টির জন্য...আমরা নাম দিয়েছি *লাইভ সেক্সুয়াল পারফর্মেন্স*; একটা মাত্র শো দেখলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবে যে-কোনও পুরুষত্বহীন মড়াও। তোমার কোন্‌টা চাই বলো এখন।'

পকেট থেকে এলএপিডি'র ব্যাজ আর আই.ডি. কার্ড বের করল রানা। 'নটির সঙ্গে দু'-চারটা কথা বলতে চাই।'

গোরস্থানে দোয়া পড়তে গিয়ে বীভৎস লাশের দেখা-পাওয়া চেহারা হলো গার্ডের। চিতিয়ে রাখা বুকটা নিমেষে ইঞ্চি তিনেক দেবে গেল ওর, ছ'ফুটে নেমে এল উচ্চতা। এতক্ষণ রংধনুর সাত রং খেলা করছিল চেহারায়, শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল সেটা। 'পুলিশ?' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো গলা দিয়ে, 'নটির সঙ্গে? কেন?'

'তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'ভেতরে নিয়ে চলো আমাকে।'

রানাকে নিয়ে ক্লাবের ভেতরে ঢুকল বডিবিল্ডার। আলোয় উদ্ভাসিত স্টেজে তখন লাইভ সেক্সুয়াল পারফর্মেন্স চলছে, স্যাটিনের চাদর বিছানো একটা খাটে যৌনসঙ্গমের বিভিন্ন ভঙ্গি অভিনয় করে দেখাচ্ছে সম্পূর্ণ নগ্ন দুই যুবতী। বিড়ালের ম্যাঁও-ম্যাঁও, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, শিয়ালের হুক্কাহুয়া--"বেশি মালদার" দর্শকরা যে যে-ডাক পারে সে সেটাই ছাড়ছে তারস্বরে।

ইঙ্গিতে খাটটা দেখিয়ে দিল গার্ড।

'নটি কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছোট করে কাটা সোনালি চুলের মেয়েটা।'

'যাও, আমার কথা বলো ওকে। বলো, এখনই ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

'আর কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করলে হয় না? শো শেষ হতে বেশি দেরি নেই।'

'তা হলে তোমার হাজতে যেতেও বেশি দেরি থাকবে না।'

'এখনই যাচ্ছি, স্যর,' ছুটে গিয়ে ক্লাব ম্যানেজারকে সব জানাল গার্ড।

ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো স্টেজে, ওপর থেকে একটা মাইক নেমে এল ওর জন্য। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' কোনও নারী দর্শক না থাকার পরও লেডিস শব্দটা উচ্চারণ করল, 'অল্প কিছু সময়ের জন্য সামান্য বিরতিতে যাচ্ছি আমরা। একটু ধৈর্য ধরুন,. আপনাদের মনোরঞ্জনে কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও হাজির হবে মেয়েরা, আগের চেয়েও আকর্ষণীয় শো নিয়ে।'

মাঝপথে বাধা পেয়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে ম্যানেজারের দিকে তাকাল নটি আর ওর সঙ্গিনী, কিন্তু কেউই কিছু বলল না। খাট থেকে নেমে স্টেজ ত্যাগ করল দু'জনেই, গিয়ে হাজির হলো ড্রেসিংরুমে। ততক্ষণে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে রানা।

বলা নেই কওয়া নেই, আপাদমস্তক উলঙ্গ একটা মেয়ে যদি হঠাৎ করে হাজির হয় চোখের সামনে কেমন অস্বস্তি লাগে। নটির নীল দু'চোখের দিকে তাকিয়ে দুধসাদা একটা রোব ছুঁড়ে দিল রানা বিশ-বাইশ বছর বয়সী মেয়েটার দিকে।

একটু আগের বিরক্তি উধাও হয়েছে নটির চোখ থেকে, রোবটা পরেছে সে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। 'আমাকে বলা হয়েছে আপনি একজন পুলিশ অফিসার,' বলল মাপা কণ্ঠে। 'আরও বলা হয়েছে আমার সঙ্গে নাকি জরুরি কথা আছে আপনার।'

'ক্যাভিস হ্যারিংটন কোথায়?' .

প্রশ্নটা শুনেই কয়েক মুহূর্ত দাঁত দিয়ে নখ কাটল নটি। 'ওই নামে কাউকে চিনি না আমি।'

'তা হলে ঝটপট খুলে ফেলো রোবটা, রাস্তায় বের হওয়ার উপযুক্ত কোনও কাপড় যদি থেকে থাকে তোমার, তা হলে পরে

নাও সেটা।'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে তোমাকে।'

'কেন?' একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল নটি, তবে এবার খনখনে গলায়। 'কেউ বলতে পারবে না আইনবিরোধী কোনও কাজ করেছি আমি।'

কিছু না বলে ইঙ্গিতে স্টেজটা দেখিয়ে দিল রানা।

ওর ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে নটি বলল, 'আপনি মনে হয় পুলিশফোর্সে নতুন জয়েন করেছেন, আইনকানুন ঠিকমত জানেন না। ন্যুড ড্যান্সিং ক্লাবের স্টেজে ন্যাংটো হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমার, ঠিক যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার অধিকার আছে যে-কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের।'

'তোমার অধিকারজ্ঞান বেশ টনটনে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। আইন বলেঃ স্টেজে ন্যাংটো হয়ে নাচতে পারো তুমি, এমনকী যৌন-ক্রিয়ার অভিনয়ও করতে পারো, কিন্তু তা শুধু একজন পুরুষের সঙ্গে। তোমার পার্টনার একটা মেয়ে ছিল, নিজচোখে দেখেছি। এবার ঝটপট হাতদুটো আগে বাড়িয়ে দাও, হাতকড়া পরাই।'

ভয়ে চেহারা শুকিয়ে গেল নটির, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'জেলের ভাত কী জিনিস জানো না বোধহয়। যদি জানতে না চাও, ক্যাভিস হ্যারিংটন কোথায় বলো। দু'বার জিজ্ঞেস করেছি, আর জানতে চাইব না।'

'গেল পনেরো-বিশ দিনে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'সে থাকে কোথায়?'

'মনে পড়ছে না।'

'কাপড় পরো!'

'ঠিক আছে, বলছি,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল নটি।

‘চেস্টনাট হিল বলে একটা জায়গায় একটা খুপরি ঘর ভাড়া নিয়েছে সে নিজের জন্য। খুপরি মানে একটা বাড়ির দোতলার সরু করিডোরে টয়লেটে যাওয়ার পথে ছোট্ট একটা ঘর। ওখানে ওর সঙ্গে...ইয়ে...দু’-চার রাত থেকেছি আমি। লোকটার যৌনক্ষুধা সাংঘাতিক।’

‘ফালতু কথা বাদ দাও। ঠিকানাটা বলো।’

‘পারব না...মুখস্থ করিনি তো। ...না, না, ওভাবে তাকাবেন না...আসলেই বলতে পারব না। আমার মত মেয়েদের ঠিকানা দিয়ে কাজ কী, বলুন? আমাদেরকে যদি নরকে নিয়ে গিয়েও ব্যবহার করা হয়, এবং তারপর যদি পাওনাটা ঠিকমত মিটিয়ে দেয়া হয়, তা হলেই খুশি আমরা। কোথায় গেলাম না-গেলাম তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই? ...যতদূর মনে পড়ে, হ্যারিংটনের খুপরিতে যাওয়ার সময় বান স্ট্রিট ধরে গিয়ে রাস্তা পার হতে হয়। আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানে ঘুরলেই দেখা যায় ওর ঘরটা।’

‘ঠিক আছে,’ চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল রানা।

‘একমিনিট, অফিসার, একটা কথা শুনে যান।’

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

‘লোকটার সঙ্গে যদি দেখা হয়, দয়া করে বলবেন, এখনও ওর কাছে পাঁচ শ’ ডলার পাই আমি। টাকাটা যদি তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয় সে, উপকার হয় আমার--হাত একেবারে খালি যাচ্ছে।’

ঘুরল রানা। ‘কথাটা তুমিই জানিয়ে দিয়ো হ্যারিংটনকে। আমি তোমার দালাল না।’

সস্তায় থাকা যায় বলে নিম্ন আয়ের লোকেরা বস্তির মত বানিয়ে ফেলেছে চেস্টনাট হিলকে। নগর পরিকল্পনাকে বুড়ো আঙুল

দেখিয়ে বাড়িওয়ালারা যে যেভাবে পেরেছে ঘর তুলেছে, কর্তৃপক্ষেরও বোধহয় এখানে এসে সরেজমিন দেখার সময় নেই।

ঠিকানা নেই, নটির বর্ণনার সঙ্গে মেলে এ-রকম বাড়ি পাওয়া গেল কম করেও দশটা, একে-ওকে জিজ্ঞেস করে ঠিক জায়গায় হাজির হতে একটু সময়ই লেগে গেল রানার। আশ্চর্য, লিফট আছে বাড়িটাতে, তবে সেটা অনেক পুরনো আমলের। ব্যবহারের দরকার হবে না, কারণ নটি বলেছে দ্বিতীয় তলাতেই থাকে হ্যারিংটন। অন্ধকারে ডুবে থাকা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল রানা। চৌকিতে দাঁড়িয়ে প্রণয়ে ব্যস্ত ছিল একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, রানার উপস্থিতি টের পেয়ে চুপসে গেল।

হ্যারিংটনের দরজায় টোকা দিল রানা। কোনও জবাব নেই। একটু সময় নিয়ে আবারও টোকা দিল রানা। এবারও একই অবস্থা। কান পাতল রানা। ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

টয়লেট পার হয়ে দোতলার আরেকটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। ভেতরে সম্ভবত স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল একটা মহিলা, রানা দরজায় থাবা দেয়ায় তেড়েকুঁদে দেখতে এল কে এসেছে এই সময়ে।

'ক্যাভিস হ্যারিংটনকে খুঁজছি আমি,' কোঁকড়া চুলের মাঝবয়সী মহিলাটা দরজা খোলার পর তাকে বলল রানা। 'দেখেছেন লোকটাকে?'

'ওই নামে কাউকে চিনি না,' রানার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলো মহিলা।

দরজার পাল্লাটা পা দিয়ে আটকে রাখল রানা। 'আপনার প্রতিবেশী, অথচ আপনি নামই শোনেননি?'

জ্বলন্ত চোখে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মহিলা, তারপর হাল ছেড়ে দিল। 'কার কথা বলছেন? ওই শয়তান

পুলিশটার?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কে?'

'ওর বন্ধু।'

'যাক, এতদিনে একজন বন্ধু পাওয়া গেল লোকটার। আমরা তো ভেবেছিলাম ইহজগতে কেউ নেই শয়তানটার। তো এসেছেন যখন, একটা মূল্যবান পরামর্শ শুনে যান। দেরি না করে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন আপনার বন্ধুকে।'

'মানে?'

'লোকটা কানে কম শোনে কি না জানি না, গতরাতে হাই ভলিউমে টিভি দেখছিল। প্রায় সময়ই করে সে কাজটা। রাত জাগতে পারে না আমার স্বামী, ডাক্তারের নিষেধ আছে, তাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস ওর। কিন্তু বিকট শব্দে ঘুম আসছিল না বেচারার। বাধ্য হয়ে উঠে গিয়ে আওয়াজ কমিয়ে টিভি দেখার অনুরোধ করে আপনার বন্ধুকে। কথামত কাজ করে লোকটা, কিন্তু দু'-তিন মিনিটের মাথায় ইয়া বড় এক হ্যাণ্ডগান নিয়ে জোর করে ঢুকে পড়ে আমাদের ঘরে। ঘটনা দেখে আরেকটু হলেই হার্টঅ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল আমার স্বামীর।'

'আপনাদের ঘরে ঢুকে কী করল ক্যাভিংটন?'

'হ্যাণ্ডগানটা ঠেসে ধরল আমার স্বামীর কপালের ঠিক মাঝখানে। কী বলল জানেন? বলল, "কুত্তার বাচ্চা, তোকে এখনই গুলি করে মারতাম, কিন্তু করতে পারছি না কাজটা। কারণ আমার পিস্তলে সাইলেন্সার নেই। ...মাফিয়ার হয়ে কাজ করিস, না? ভেবেছিস কেউ কিছু টের পায় না? যেদিন ধরব তোকে সেদিন এত সীসে গেলাব যে, হজম করতে পারবি না।" '

চুপ করে আছে রানা।

'আপনার বন্ধু একটা উন্মাদ। এ-রকম লোক পুলিশে চাকরি

করে কীভাবে, বুঝি না। ওর কাছে পিস্তল থাকার মানে কী, জানেন? নিরীহ কিছু মানুষকে কফিনে শুয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়া।'

চোদ্দ

সোয়া এগারোটায় শায়লার সঙ্গে দেখা হলো রানার। রেস্টুরেন্টের ওপরতলায়, জানালার পাশে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে মেয়েটা; ঝিমুচ্ছে।

'ঈশ্বর!' মেঝেতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে পিস্তলে হাত চলে গিয়েছিল শায়লার, রানাকে চিনতে পেরে হাতটা সরিয়ে বলল। 'এত দেরি হলো কেন, মাসুদ ভাই?'

জবাবটা এড়িয়ে গেল রানা। 'গুদামের খবর কী?'

'নির্দিষ্ট সময় পর পর বের হয় একজন করে, এদিক-ওদিক দেখে, তারপর আবার ভেতরে ঢুকে আটকে দেয় দরজা। ...মাসুদ ভাই, মিস্টার হেইডন যদি জানতে পারেন আপনি চলে গিয়েছিলেন...'

'বাদ দাও ওর কথা,' হাত নাড়ল রানা, হাই তুলল। ঘুম পাচ্ছে ওর।

'যে-কোনও কাজ সম্পূর্ণ নিজের মত করে করতে পছন্দ করেন আপনি, খেয়াল করেছি।'

'শুধু আমি কেন, বেশিরভাগ মানুষই তা-ই করে। তা ছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের বিচার-বিবেচনায় কোনও ত্রুটি দেখি,

নিজের ওপর আস্থা রাখি। ...এক কাজ করো, একজায়গায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি ততক্ষণ আমার নাকটা কাজে লাগাই।'

'নাকটা কাজে লাগাবেন মানে?'

'কেন, সে-কাজই কি করতে বলেনি হেইডন?'

হেসে ফেলল শায়লা। ফ্লোরের অন্ধকার একটা কোনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় রাস্তার উল্টোদিক থেকে অস্বাভাবিক একটা শব্দ শোনা গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে খুলে যাচ্ছে গুদামের গ্যারেজের স্টীল দরজা।

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বায়ু ত্যাগ করতে শুরু করেছে টার্নার,' চাপা গলায় বলল রানা,. 'গন্ধটা কেমন হয় সেটাই জানার অপেক্ষা এখন।'

আবারও হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল শায়লা, এগিয়ে এল জানালার কাছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা, আরেকপাশে দাঁড়াল ও।

গ্যারেজের দরজা খুলে বের হয়েছে দু'জন লোক। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে নির্জন রাস্তাটা। গ্যারেজের দিকে ফিরে ইশারা করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গর্জন তুলে বেরিয়ে এল দুটো বুইক আর একটা ক্যাডিলাক।

চট করে জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা, পা বাড়াল সিঁড়ির উদ্দেশে। 'শায়লা,' ডাকল জরুরি গলায়, 'ড্রাইভ করতে হবে তোমাকে। ওই গাড়িগুলো কোথায় যাচ্ছে, জানতে চাই। এবার রেস্টুরেন্টের পেছনে পার্ক করেছি আমি।'

চটজলদি গাড়ির কাছে হাজির হলো দু'জনে। উঠে পড়ল ঝটপট।

'হেডলাইট জ্বালাব?' জিজ্ঞেস করল শায়লা।

'এখন না। সময় হলে বলব।'

রেস্টুরেন্টটাকে একটা চক্কর দিয়ে রাস্তায় গাড়ি তুলল শায়লা। গুদামটাকে ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর মোড়ের কাছাকাছি হয়েছে, এমন সময় হেডলাইট জ্বালাতে বলল রানা। ততক্ষণে মোড় ঘুরে চলে যাচ্ছে দ্বিতীয় বুইক, সেটার টেইললাইট দেখা গেল একঝলক।

হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়ে গ্যাসপ্যাডেলে চাপ বাড়াল শায়লা। চাকার বিশ্রী আওয়াজ তুলে মোড় ঘুরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একসঙ্গে দেখা গেল গাড়ি তিনটাকে।

মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে টার্নারের কাফেলা।

নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছে শায়লা।

মেইন স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি তিনটা। পর পর কয়েকটা ট্রাফিক সিগনাল পার হলো। দেখে মনে হচ্ছে কাফেলা এগিয়ে চলেছে হাইওয়ে এণ্ট্রান্সের দিকে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে শায়লা। বেশি কাছেও চলে যাচ্ছে না, আবার এতখানি পিছিয়েও পড়ছে না যাতে নিমেষে উধাও হয়ে যেতে পারে গাড়িগুলো।

বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মত আকৃতিতে ভাগ হয়ে গেল হাইওয়ে, সেই সঙ্গে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল কাফেলাটা। নেতৃত্বে থাকা বুইকটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলে যাচ্ছে সৈকতের দিকে, সম্ভবত বে ব্রিজের দিকে, বাকি দুটো গাড়ির গন্তব্য আপাতত সিলভার গেট ব্রিজ।

'সিক্স ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি,' এলএপিডি'র পক্ষ থেকে রেডিয়ো বসিয়ে দেয়া হয়েছে শায়লার গাড়িতে, ওটা কাজে লাগিয়ে কাছের পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে, 'তিনটা গাড়িকে ফলো করছি আমরা। দুটো একসঙ্গে আছে, আরেকটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে।' মাউথপিসটা নামিয়ে রাখল হাত

থেকে, আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। 'কোন্‌দিকে যাব?'

'একসঙ্গে থাকা দুটো গাড়িকে ফলো করতে থাকো।'

মাউথপিসটা আবার হাতে নিল শায়লা। 'সিক্স ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি। সিলভার গেটের দিকে যাচ্ছি আমরা।'

'রজার,' খড়খড় করে উঠল রেডিয়োর স্পীকার, ও-প্রান্ত থেকে সাড়া দিয়েছে কেউ।

এত রাতে ব্রিজের ওপর ট্রাফিক থাকার কথা নয়, নেইও। স্পিড বাড়াচ্ছে গাড়িদুটো। গতি বাড়াল শায়লাও, লেগে আছে আগের মতই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ওয়ালডো গ্রেড হয়ে মেরিন কাণ্ট্রির দিকে যাচ্ছে গাড়িদুটো। কিন্তু শেষমুহূর্তে যেন মত বদলাল ক্যাডিলাকের ড্রাইভার, ডানে মোচড় নিয়ে এগোচ্ছে সস্যালিটো এক্সিটের দিকে। বুইকটা এখনও আছে ফ্রিওয়েতে।

'এবার?' গতি কিছুটা কমাল শায়লা, গিয়ার বদল করল।

'ক্যাডিলাক।'

ডানে মোড় নিল শায়লা, এক্সিট র‍্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। সামনে আঁকাবাঁকা রাস্তা, বার বার স্টিয়ারিং ঘুরাতে হয়। ক্যাডিলাকের কোনও চিহ্ন নেই, রাস্তা খালি পেয়ে বেশ আগে চলে গেছে গাড়িটা। গতি বাড়াল শায়লা, বিপজ্জনকভাবে পার হলো কয়েকটা মোচড়, তারপর হঠাৎ দেখতে পেল একটা রাস্তার একধারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ক্যাডিলাক।

'খোদা!' ব্রেক করতে গিয়েও করল না শায়লা, তবে গতি কিছুটা কমিয়ে পাশ কাটিয়ে এল ক্যাডিলাকটাকে, আরেকটা মোচড় ঘুরে কিছুদূর এগিয়ে পা রাখল ব্রেকপ্যাডেলে। হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওর গাড়ি, গতিজড়তার কারণে সামনে ঝুঁকতে বাধ্য হলো ওরা দু'জন।

ড্যাশবোর্ডের ওপর জোরে বাড়ি মারল শায়লা, চটে গেছে। 'ওরা বুঝে গেছে ফলো করা হচ্ছে ওদেরকে। কিছুই করার নেই

এখন।'

দূরে কোথাও গর্জে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন, শব্দটা শুনতে অসুবিধা হলো না নিশুতি রাতে। কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা, ব্যাকগিয়ার দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ক্যাডিলাকটা, রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ তুলে বাঁক কাটল হঠাৎ, ক্রমশ ফিকে হতে থাকা ইঞ্জিনের শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে আবার ফ্রিওয়ের দিকে ছুট লাগিয়েছে ওটা।

একঝটকায় দরজা খুলে নামল রানা। 'জলদি নামো! আমি ড্রাইভ করব।'

নামল শায়লা, ঝটপট জায়গা বদল করল রানার সঙ্গে। মেয়েটাকে ঠিকমত বসারও সুযোগ দিল না রানা, তার আগেই গিয়ার বদলে পা রাখল অ্যাক্সিলারেটরে। এবার স্থিতিজড়তার কারণে পিছনে হেলে পড়ল শায়লা, আরেকবার খোদাকে ডেকে কোনওরকমে বন্ধ করল গাড়ির দরজা।

ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটাল রানা। ফ্রিওয়েতে হাজির হতে সময় লাগল না ওর। এত দ্রুত০০ চলে আসবে ওরা, বোধহয় ভাবেনি ক্যাডিলাকের ড্রাইভার, তাই নতুন কোনও চালাকির সুযোগ পেল না। গতি আরও বাড়াল রানা, গাড়ির নাকটাকে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাডিলাকের বাম্পারের কাছাকাছি।

'করছেন কী, মাসুদ ভাই?' নার্ভাস হয়ে পড়েছে শায়লা। 'টার্নার গাড়িতে আছে কি না জানি না আমরা। যদি থেকেও থাকে, ওর জানার কথা নয় আমরা পুলিশের লোক। কোনও কারণে যদি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে লোকটা, তা হলে হয়তো...'

'আমি চাই আতঙ্কিত হোক টার্নার,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'মানে?'

মানেটা বলার জন্য মুখ খুলল রানা, কিন্তু বলতে পারল না। গতি বাড়িয়েছে ক্যাডিলাক, ফ্রিওয়েতে ঝড় তুলে এগিয়ে যাচ্ছে

দক্ষিণ অভিমুখে। তারপর হঠাৎ ঢুকে পড়ল স্লো লেনে, দুটো ইণ্ডিকেটরই জ্বালিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বুঝিয়ে দিচ্ছে সোজা এগোনোর ইচ্ছা আছে ওর, একইসঙ্গে জানালার কাঁচ নামিয়ে হাত বের করে ইঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে যেতে বলছে রানাকে।

'ফাঁদ হতে পারে,' শায়লার কণ্ঠে উদ্বেগ।

কিছু না বলে বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে ডান হাতে শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করল রানা, রাখল দুই উরুর মাঝখানে। একটা শটগান আছে ব্যাকসিটে, ওটা নিতে বলল শায়লাকে।

বিড়বিড় করে ওর ঈশ্বরকে ডাকল শায়লা, তারপর হাত বাড়িয়ে নিল শটগানটা, কক করল।

ক্যাডিলাকের ড্রাইভারের আহ্বান উপেক্ষা করে এতক্ষণ আগের গতিতেই এগোচ্ছিল রানা, এবার গতি বাড়িয়ে পাশাপাশি হলো গাড়িটার।

শর্টি টার্নারকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না।

ড্রাইভার বাদে আরও তিনজন আছে ওর সঙ্গে, প্রত্যেকের চেহারাতেই যেন ভর করেছে রাতের অন্ধকার।

'মাসুদ ভাই,' গলা কাঁপছে শায়লার, 'আরেকটু এগিয়ে গেলে ভালো হয়। ওদের ঠিক পাশেই আছি আমি, ওরা যদি গুলি চালাতে চায় তা হলে আগে আমিই...'

'জানালার কাঁচ নামাও,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কী?'

'কাঁচ নামাও জানালার।'

'ঈশ্বর!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে শায়লার, সুইচ চেপে ধরে কাঁচ নামিয়ে দিল সে। 'কেন এসব করছি বুঝতে পারছি না একটুও।'

স্পিডোমিটারের দিকে একবার তাকাল রানা। ঘণ্টাপ্রতি প্রায়

পঁচাত্তর কিলোমিটার গতিতে চলছে গাড়ি। সামনের রাস্তাটা দেখে নিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল ক্যাডিলাকের ড্রাইভারের দিকে। 'এই যে, ভাই,' হাঁক ছাড়ল, 'একটু সাহায্য করতে পারবে?'

'কী?' থতমত খেয়ে গেছে লোকটা, চেহারা হলিউডি মুভির আদর্শ গুণ্ডার মত, গালে দশ-বারোদিনের না কাটা দাড়ি।

'পথ হারিয়েছি আমি,' আবারও চেঁচাল রানা। 'যাচ্ছিলাম ক্যান সিউন্টিনের দিকে। কিন্তু...রাতকানা রোগে ধরল কি না আমাকে বুঝতে পারছি না...কিছুতেই ঠাহর করতে পারছি না কোন্‌দিকে যেতে হবে। তুমি জানো নাকি?'

বিরক্তিতে বুনো শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করল ক্যাডিলাকের ড্রাইভার। বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে নির্দেশ করল নিজের কাঁধের দিকে। 'পেছনে ফেলে এসেছ। তুমি আসলেই রাতকানা।'

'না, ঠিক তা না,' দাঁত বের করল রানা। 'মাঝেমধ্যে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায় সব। তবে যা-ই হোক, সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।' গতি বাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে এল ও ক্যাডিলাকটাকে। দুই উরুর মাঝখান থেকে ওয়ালথারটা বের করে ঢুকিয়ে রাখল শোল্ডার হোলস্টারে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল শায়লা। 'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'একই অবস্থা হয়েছে টার্নারেরও।'

'তাতে লাভ কী হয়েছে আমাদের?'

'এত রাতে কে কেন ফলো করল ওকে, জানার চেষ্টা করবেই সে। হয়তো জানতে পারবে, এলএপিডি হোমিসাইড নতুন করে হাত বাড়িয়েছে ওর দিকে। এতদিন ঢিলেঢালা ভাব ছিল ওর মধ্যে, এবার সতর্ক হয়ে উঠবে নির্ঘাত।'

'তো?'

'ভুলটা করবে তখনই।'

'তো?'

'আশা করছি তখন ওর ওপর একটা অ্যাটেম্পট নেবে আমাদের সিরিয়াল কিলার।'

'তাতে আমাদের কী?'

শায়লার দিকে একবার তাকিয়ে রাস্তার ওপর মনোযোগ দিল রানা। 'যেহেতু আমাদের নজরদারিতে আছে টার্নার, আশা করছি কোনও না কোনও লিড পেয়ে যাব আমরা।'

পনেরো

জায়গাটার নাম টেলিগ্রাফ হিল, ঢাকা পড়েছে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার যে-ফ্ল্যাটে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লী ডেডরিক, খাঁ খাঁ করছে সেটা--বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মালসামান নিয়ে বিদায় নিয়েছে আগের ভাড়াটে, নতুন কেউ আসেনি এখনও। শক্তিশালী একটা বিনকিউলার সেট করার চেষ্টা করছে লী। কাছেই, একটা ফোল্ডিং চেয়ারে শরীরটা লম্বা করে দিয়েছে ওর পার্টনার চার্লি হ্যালেক; তেমন কিছু করার নেই বলে হাই তুলছে একটু পর পর। গত প্রায় আঠারো ঘণ্টা ধরে এই ফ্ল্যাটে আছে দু'জনে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই, খিটখিটে হয়ে উঠেছে মেজাজ। বাসি পত্রিকা, হলিউডি খ্যাত-অখ্যাত অভিনেত্রীদের অর্ধনগ্ন ছবিওয়ালা চটি ম্যাগাযিন, সিগারেটের টুকরো আর প্লাস্টিকের কফির-কাপ পড়ে আছে

মেঝের এখানে-সেখানে। একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেলিস্কোপিক সাইটওয়ালা দুটো পয়েন্ট থ্রি যিরো এইট নর্মা ম্যাগনাম রাইফেল।

বিনকিউলারটা সেট করতে পারল লী, তাকাল রাস্তার উল্টোদিকের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টটার দিকে, তারপর সেটার সদর-দরজার দিকে। দশাসই এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, চেহারানকশায় বডিগার্ড বডিগার্ড ভাব। লোকটাকে দেখল কিছুক্ষণ লী, বিড়বিড় করে গালি দিল একটা, তারপর তাকাল ওই বিল্ডিং-এরই একটা পেন্টহাউস ফ্ল্যাটের দিকে। সবগুলো জানালায় পর্দা ঝুলছে, ভিতরে কী হচ্ছে বুঝবার উপায় নেই, তবে ভিতরকার উজ্জ্বল আলোর কারণে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা যাচ্ছে সময়ে সময়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে।

'কুত্তার বাচ্চা!' গালিটা এবার জোরেই দিল লী, রাগ কমাতে দম নিল লম্বা করে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল চার্লির দিকে। 'আজ সারাটাদিন ঘরেই কাটিয়ে দিল ক্যাভেনডিশ। একটাবারের জন্যও বাইরে কোথাও যায়নি।'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা চটি ম্যাগাযিন হাতে তুলে নিল চার্লি উবু হয়ে, প্রমাণ করে দিল অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। 'করছেটা কী সে?'

জানালা দিয়ে থু করে রাস্তায় থুতু ফেলল লী। 'কী আবার? হয়তো অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করছে শরীরের।'

আবারও হাই তুলল চার্লি, ম্যাগাযিনের পাতা উল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওর একটা হাত।

একটা বাথরুমের বর্ণনা দিতে গিয়ে *জমকাল* বিশেষণটা ব্যবহার করে না সাধারণত কেউ। কিন্তু ক্যাভেনডিশ যে-ঘরটাকে গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করে, সেটাকে জমকাল না বলেও

উপায় নেই। দেয়ালের টাইলস-এ শোভা পাচ্ছে সতেরো শতকের ইউরোপিয়ান অলঙ্করণরীতি, এ-রীতির কারিগরদের দেখা সহজে মেলে না বলে এর প্রয়োগে গুনতে হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। মেঝের নিখুঁত বর্গাকৃতির সোনালি বর্ডারওয়ালা দুধসাদা মার্বেলগুলোকে কেউ যদি বলে ইটালিয়ান নয়, তা হলে তার নামে মানহানির মামলা ঠোকা যেতে পারে। আর স্যানিটারি ফিটিংস? হাল আমলের সবচেয়ে ভালোটা, সবচেয়ে দামিটা জোগাড় করার চেষ্টা করেছে ক্যাভেনডিশ; এবং সে-চেষ্টায় যে কমবেশি সফলও হয়েছে তা বলা বাহুল্য।

আসলে বিলাসিতা আর আলবার্ট ক্যাভেনডিশ যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। হবে না-ই বা কেন? মানুষ মেরে কামানো টাকা জমিয়েছে সে ব্যাংকে ব্যাংকে, সুদে-আসলে সে-টাকা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে কবে জানে না নিজেও। ক্যাভেনডিশ জানে, খুব ভালোমত জানে, শয়তান যাদের মাথা খেয়েছে, সময় কাটানোর জন্য তাদের মাদক আর বেশ্যা চাই-ই চাই; তাই ওর শরীরে বিলাসিতার চর্বি জমতে শুরু করামাত্র মোটা টাকা খাটিয়েছে ওই দুই খাতে, এবং একইসঙ্গে অস্ত্রের ঝনঝনানি দিয়ে সুরক্ষিত করেছে নিজের বিনিয়োগ। আজ তাই টেলিগ্রাফ হিলের মত জায়গায় ফ্ল্যাট কিনতে, বহুমূল্য টাইলস আর ইটালিয়ান মার্বেল দিয়ে সে-ফ্ল্যাটের বাথরুম সাজাতে গায়ে লাগে না তার। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর জন্য আফসোস হয় তার-- স্নাতকোত্তর শেষ করতে না পারার জন্যে নয়, আরও আগে কেন জড়িয়ে পড়ল না আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে, সেজন্যে।

বেজির চামড়া দিয়ে বানানো কার্পেটে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে এখন বাথরুমে, প্রমাণ সাইজের একটা আয়নায় দেখছে নিজেকে। যখনই কাজটা করে সে, বিশেষভাবে বানানো মৃদু আলো জ্বালিয়ে দেয় বাথরুমে; সে-আলোয় ওর প্রতিবিম্বের

চেহারাটা কমবয়সী মনে হয়। ক্যাভেনডিশের খুব রাগ হয় যখন কেউ ওকে বলে, বয়স বাড়ছে আপনার। আর দশজনের কাছে যা মৃত্যুভয়, ক্যাভি দ্য বুল'স আইয়ের কাছে তা দম বন্ধ করা আতঙ্ক, বুকে ধড়ফড়ানি জাগানো অনুভূতি। আরও অনেক, অনেক বছর বাঁচতে চায় সে। প্রাণ ভরে ভোগ-উপভোগ করতে চায় জীবনটা। লালসার দাঁড়িপাল্লায় যখন মাপে নিজের অতীত-বর্তমান, চাওয়ার পাল্লা স্বাভাবিকভাবেই পাওয়ার পাল্লার চেয়ে অনেক ভারী হয়।

ওর চাঁদির পেছনদিকে কয়েকগাছি চুল লেপ্টে আছে কোনওরকমে; বাচ্চার মাথায় যেভাবে সস্নেহে হাত বুলায় বাবা, চুলগুলোকে সেভাবে আদর করল ক্যাভেনডিশ, টের পেল বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছে মনটা। হাত বাড়িয়ে খুলল মেডিসিন কেবিনেট, কোলনের বোতলটা নিয়ে ঢালল হাতে, ছিটা মারল চেহারায়। এবার বিশেষ অ্যাঙ্গেলে তাকাল আয়নার দিকে, ওর ধারণা এভাবে তেরছা ভঙ্গিতে তাকালে বেশ সুন্দর লাগে ওকে। একটুখানি হাসল। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না হাসিটা-- কুঁতকুঁতে ভাবলেশহীন চোখ, থলথলে গাল, মোটা মোটা ঠোঁটওয়ালা বিকট মুখ আর বাঁকানো নাকের প্রতিবিম্বটা দেখে মনে হচ্ছে, সেখান থেকে প্রেতাত্মা ছাড়া অন্যকিছুর জন্ম নেয়া সম্ভব না ক্যাভেনডিশের মৃত্যুর পরে।

নিজের অজান্তেই খানিকটা ঝুঁকে পড়েছিল সে আয়নার দিকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিঠ সোজা করল। তাল তাল চর্বি নিয়ে কোলবালিশের আকার ধারণ করেছে এককালের বলিষ্ঠ দেহটা, বডিবিল্ডারদের মত শরীর শক্ত করে পেশি দেখার চেষ্টা করল ক্যাভেনডিশ, ব্যর্থ হয়ে থু করে থুতু দিল আয়নায়--যেন সব দোষ ওটার। মনে পড়ে গেল অকাজে নষ্ট হচ্ছে সময়, তাই তাড়াহুড়ো করে দাঁত ব্রাশ করল, তারপর লাইট নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল

বাথরুম থেকে।

হলওয়ে ধরে সোজা হাজির হলো বিশাল বেডরুমে। যার বাথরুম জমকাল, তার শয়নকক্ষের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা বাতুলতা। অভ্যাসের বশে এদিক-ওদিক তাকাল ক্যাভেনডিশ, তারপর নজর দিল কিং সাইজ ওয়াটার বেডের ওপর। সম্পূর্ণ নগ্ন একজোড়া কপোত-কপোতী তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে বিছানায়, লম্বা সময় ধরে অপেক্ষা করছে ওরা ক্যাভেনডিশের জন্য।

শরীরের সব শক্তি দিয়ে টানলেও মেয়েটার বয়স বিশ থেকে একুশে নেয়া যাবে না, বরং আরও অল্পবয়সী হতে পারে সে। মেয়েটিকে নিজের বাথরুমের মতই জমকাল মনে হয় ক্যাভেনডিশের। লম্বা চকচকে সোনালি চুল, দাগহীন চাঁদপানা চেহারা, বড় বড় নীল চোখ, এক শ'তে চোখ বন্ধ করে নিরানব্বই দেয়ার মত উরু, সবশেষে নধরকান্তি দেহ।

ছেলেটাও টিনএজ ছাড়িয়েছে বেশিদিন হয়নি, কিন্তু নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি কোনও মনোযোগ নেই ওর। লাফাতে লাফাতে হঠাৎ বসে পড়ল সে, বেডসাইড টেবিলের ওপর একটা চামচে রাখা কোকেইন টেনে নিল লম্বা শ্বাসের সঙ্গে। ওর দেখাদেখি মেয়েটাও, তবে মেয়েটা ওর নাকের দুই ফুটো দিয়েই করল কোকেইন গ্রহণের কাজটা। তারপর ঝিম মেরে থাকল কিছুক্ষণ, ওর দিকে তখন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। কিছুক্ষণ পর খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, লোকে যেভাবে পাউরুটির গায়ে জেলি লাগায় সে-ভঙ্গিতে আদর করছে ওয়াটার বেডটাকে--কী ভেবে কে জানে!

'সাবধান!' চাপা গলায় মেয়েটাকে সতর্ক করার চেষ্টা করল ছেলেটা, ঘোরলাগা চোখে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখছে চামচের কোকেইন আছে, নাকি পড়ে গেছে। 'লোকটা মাগনা দিচ্ছে বটে, কিন্তু মালের অপচয় হলে আমাদের কপালে খারাবি আছে বলে দিয়েছে

আগেই।'

আবারও খিলখিল করে হাসল মেয়েটা, ক্যাভেনডিশ যে দাঁড়িয়ে আছে বেডরুমের গোবরাটে টের পায়নি। 'ওই বুড়োকে গনায় ধরে কে? ওর কথা বাদ দাও।'

প্যান্টের বেল্ট খুলতে খুলতে বিছানার দিকে এগোচ্ছিল ক্যাভেনডিশ, কথাটা শুনে থমকে গেল। হঠাৎ রাগে ব্রহ্মতালু যেন জ্বলে উঠল ওর, রক্তের ছুটে চলা টের পাচ্ছে সে শিরা-উপশিরায়। 'মুখ সামলে কথা বল্, ছুকরি!' ধমক দিল প্রচণ্ড জোরে। 'যে মাল দিয়েছি তোদেরকে, সেটার এক আউন্সের দাম কত জানিস?'

ওর দিকে তাকিয়ে বার কয়েক চোখ পিটপিট করল মেয়েটা, ক্ষমা প্রার্থনার ঢঙে কী যেন বলল বিড়বিড় করে। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এত রাগ কোরো না, লক্ষীটি!' কথাটা শেষ করেই হেসে ফেলল খিলখিল করে।

'কেউ বুড়ো বলার সাহস পায় না আমাকে!' আরেকবার গর্জন করল ক্যাভেনডিশ। 'কেউ না!'

আবারও চোখ পিটপিট করল মেয়েটা, এতক্ষণে বুঝতে পারছে রেগে গেছে ওদের "অন্নদাতা"। দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি দুঃখিত। ভুলটা আর করব না কখনও।'

ফোঁস ফোঁস করে দম ছাড়ছে ক্যাভেনডিশ, জোর করে শান্ত করার চেষ্টা করছে নিজেকে। যেভাবে টেনেহিঁচড়ে চালের বস্তা খোলে গুদামের শ্রমিক, সেভাবে নিজের প্যান্ট খুলে উলঙ্গ হয়ে গেল সে। নিভিয়ে দিল ঘরের উজ্জ্বল বাতিটা, ড্রেসিংটেবিলের ওপর রাখা মোমবাতিই আলোর উৎস এখন।

বাইসেক্সুয়াল লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়াটার বেডের দিকে, সেখানে ওর বিকৃত যৌনচাহিদা পূরণ করবে

একজোড়া কচি কপোত-কপোতী, নয়শো ডলার দিয়ে কেনা সুপারফাইন কোকেইনের বিনিময়ে।

জানালার পাশে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কখন বসে পড়েছে লী, জানে না। হাত থেকে মেঝেতে কখন পড়ে গেছে বিনকিউলার, বলতে পারবে না। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ খুলে প্রথমেই তাকাল সে চার্লির দিকে; অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে।

ঘুমটা ভাঙল কেন?

পরিচিত একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে রাস্তা থেকে। ভট ভট ভট...একটানা গর্জন করছে ইঞ্জিনটা।

একটা মোটরসাইকেল--সম্ভবত যে-রকম ব্যবহার করে এলএপিডি'র ট্রাফিক পুলিশ অফিসাররা।

একলাফে উঠে দাঁড়াল লী, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ফোল্ডিং চেয়ারটা যেদিকে আছে সেদিকে, ডেকে তুলতে হবে চার্লিকে। কিন্তু রাইফেলদুটো যেখানে আছে সেখান থেকে আওয়াজ দিল চার্লি, 'আমি ঘুমাইনি। রাইফেল রেডি। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াও, বিনকিউলারে দেখো লোকটা কে।'

উল্টো ঘুরল লী, জায়গামত গিয়ে কাজে লাগাল বিনকিউলারটা। কিছুক্ষণ পর মৃদু গলায় বলল, 'রাইফেল রেখে দাও, চার্লি। আসলেই একজন পুলিশ অফিসার এসেছে নীচে। এবং লোকটাকে চিনতে পেরেছি আমি।'

জানালার কাছে এগিয়ে এল চার্লি। ধীর কিন্তু নিশ্চিত পায়ে ক্যাভেনডিশের অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এর গ্যারেজের দিকে এগোচ্ছে একজন পুলিশ অফিসার। লোকটার চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে একটু একটু করে সরছে লী'র চোখে ধরা বিনকিউলার।

'কে সে?' জিজ্ঞেস করল চার্লি।

'ক্যাভিস হ্যারিংটন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লী।

ক্যাভেনডিশের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর এককোনায়, দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পরনে ট্রাফিক পুলিশের উর্দি, হাতে কালো গ্লাভস। রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে একজোড়া বড় সোয়েট সক্স বের করল সে, বুটের ওপর পরল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চটপট দেখে নিল চারদিক, তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দেয়াল টপকে ঢুকে পড়ল ভেতরে, দারোয়ান কিছু বুঝবার আগে ছুট লাগাল লোহার ফায়ার এক্সিটের দিকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়ে প্রায় নিঃশব্দে পৌঁছে গেল ক্যাভেনডিশের পেন্টহাউস ফ্ল্যাটটা যে-তলায় আছে সেখানে, পকেট থেকে বের করল এক ডজন স্কেলিটন কী-র একটা সেট। ঘোলাটে চাঁদের-আলোয় একঝলক দেখল দরজার লকটা, কোন্ চাবি কাজে লাগতে পারে অনুমান করে নিয়ে একটা ঢোকাল সেটাতে। কিন্তু কাজ হলো না। অধৈর্য না হয়ে আরেকটা চাবি কাজে লাগাল সে, ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে গেল এবার, মৃদু ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল লক। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে হালকা ধাক্কা দিল দরজায়।

যেহেতু ফ্ল্যাটের ভেতরে কপোত-কপোতীর সঙ্গে "গুরুত্বপূর্ণ" কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ক্যাভেনডিশ, ওর খাস বডিগার্ড দাঁড়িয়ে আছে সদর-দরজার বাইরে; ফায়ার এক্সিটের দরজার লক বিনা নোটিসে ক্লিক করে ওঠায় সতর্ক হলো লোকটা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিঃশব্দে বের করল সে নিজের ল্যুগার, পিঠটা দেয়ালে ঠেসে ধরে শরীরটাও মিশিয়ে দিতে চাইল দেয়ালের সঙ্গে। জানে, এই সময়ে ফায়ার এক্সিট ধরে আসার কথা না জ্যানিটরের। কোনও কাজ থাকলে মূল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে অসুবিধা কী লোকটার?

দরজাটা খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, একটু একটু করে উপরে

উঠছে বডিগার্ডের ল্যুগার। একটা লোক যখন চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে, ঘোলাটে চাঁদের-আলোয় ভরা আকাশের পটভূমিতে লোকটার ছায়ামূর্তি দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারল না বডিগার্ড।

উর্দিপরা এক পুলিশ অফিসার ঢুকছে, হাতে ইয়া বড় এক হ্যাণ্ডগান, সম্ভবত সাইলেন্সার লাগানো হয়েছে নলে।

ব্যাপার কী বুঝবার জন্য কয়েকটা মুহূর্ত খরচ করে ফেলল বডিগার্ড, তারপর নিজের ল্যুগার নামিয়ে শক্ত সোলের শু'র খটাখট শব্দ তুলে রওয়ানা হলো উর্দিধারীর দিকে। 'কোনও সমস্যা, অফিসার?'

দেখে মনে হলো একটু যেন চমকে উঠল অফিসার, হয়তো আশা করেনি কেউ দেখে ফেলতে পারে ওকে। কিন্তু সে নয়, বডিগার্ডের প্রশ্নটার জবাব দিল ওর হাতের হ্যাণ্ডগান--অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে, পর পর তিনবার।

অফিসারকে নড়ে উঠতে দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল বডিগার্ড, বিস্মিত চেহারাটা স্বাভাবিক হওয়ার আগেই প্রথম গুলিটা খেল সে। পরমুহূর্তে খেল আরও দুটো। বসে পড়ল বডিগার্ড, তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে আগেই। ওর দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না অফিসার, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে লাশটা টপকাল, প্রশস্ত হলওয়ে পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ক্যাভেনডিশের পেন্টহাউসের সদর-দরজায়। পকেট থেকে আবার বের করল স্কেলিটন কী-র সেটটা।

এবার একটা-দুটো করে পাঁচটা চাবি ব্যবহার করতে হলো তাকে, তারপর শুনতে পেল কাঙ্ক্ষিত ক্লিক শব্দটা। চাবিগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রেখে চেপে ধরল হ্যাণ্ডগানের হাতল, দরজা ঠেলে পা রাখল ফ্ল্যাটের ভেতরে।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ক্যাভেনডিশ আছে তো? ভেস্টিবিউলে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল অফিসার, কিছুটা

হলেও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে, সেখানে মাথার উপরে জ্বলছে একটা অনুজ্জ্বল লাল বাতি, অদ্ভুত আলো-আঁধারি পরিবেশ। জ্যাকেটের পকেট থেকে বুলেট বের করে হ্যাণ্ডগানের খালি চেম্বারগুলো পূরণ করল অফিসার, তারপর এগোতে শুরু করল পায়ে পায়ে, দামি আসবাবে ঠাসা সুসজ্জিত লিভিংরুম পার হয়ে হাজির হলো হলওয়েতে। হ্যাঁ, এবার মনে হচ্ছে কেউ না কেউ আছে ফ্ল্যাটে--একটা মেয়ের খিলখিল হাসির শব্দ কানে এল।

বেডরুমের আধখোলা দরজার গোবরাটে গিয়ে দাঁড়াল অফিসার।

ছি, কী বাজে একটা দৃশ্য--রুচি আছে এ-রকম যে দেখবে তারই গা গুলাবে। একইসঙ্গে একবার একটা ছেলে, একটু পর একটা মেয়ের সঙ্গে...। দাঁতে দাঁত চাপল অফিসার, হ্যাণ্ডগানটার অস্তিত্ব অনুভব করল। যৌনতায় অরুচি নেই ওর, অরুচি আছে মেয়েদের ওপর, যাদেরকে সে বিশ্বাসঘাতিনী ছাড়া আর কিছু মনে করেনি বালেগ হওয়ার পর থেকে।

ওয়াটার বেডের ওপর হঠাৎ নড়ে উঠল ক্যাভেনডিশ, জড়িয়ে ধরে ছিল মেয়েটাকে, একধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে। বছরের পর বছর ধরে হিটম্যানের ভূমিকা পালন করায় ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা বোধহয় আর দশজনের চেয়ে একটু বেশিই প্রখর, তাই টের পাচ্ছে কোনও একটা গণ্ডগোল হয়েছে কোথাও। মোমবাতির অনুজ্জ্বল আলোয় অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, তাই ওর অস্বস্তিটা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে ভয়ে, চেহারায় সে-অনুভূতির স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। পরিশ্রমের না, আতঙ্কের ঘামে মুহূর্তের মধ্যে ভিজে গেছে কপাল; ভ্রূ আর জুলফি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় নামছে নীচে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

ওকে আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে এমন সময় বেজে উঠল ওর

মোবাইল ফোন। বাজছে ফোনটা, বেজেই চলেছে ক্যাভেনডিশের খুলে রাখা প্যান্টের পকেটের ভেতরে, কিন্তু বিছানা থেকে নেমে গিয়ে কলটা রিসিভ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে। ভাবছে, মেঝেতে পা দেয়ামাত্র অশুভ কিছু একটা ঘটবে।

"অন্নদাতার" এই হঠাৎ পরিবর্তন নজর এড়ায়নি ছেলেটার, কম মাত্রায় গ্রহণ করায় কোকেইনের নেশা পুরোপুরি পেয়ে বসেনি ওকে এখনও। জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'কী...হয়েছে?'

অকারণেই খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, ভাবল নতুন কোনও ভঙ্গিতে ওকে জড়িয়ে ধরার আগে কিছুক্ষণের "বিচ্ছেদ" নিতে চাইছে বুড়োটা। আদর পাওয়া বিড়ালের মত শব্দ করল সে, পিঠের নীচে চাপা পড়ায় টেনে সরাল লম্বা চুলগুলো, চোখ বন্ধ করল। যখন খুলল, ততক্ষণে দুটো ঘটনা ঘটে গেছে একসঙ্গে-- মোবাইল ফোনের বিরক্তিকর আওয়াজটা যাতে শুনতে না হয় সেজন্য সেটটার সুইচ অফ করতে বিছানা ছেড়ে শেষপর্যন্ত নেমেছে ক্যাভেনডিশ, ওদিকে ভয়ালদর্শন একটা হ্যাণ্ডগান হাতে নিয়ে ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে এক পুলিশ অফিসার।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

প্যান্টের দিকে হাত বাড়িয়েছিল ক্যাভেনডিশ, ওই অবস্থাতেই স্থির হয়ে গেল মূর্তির মত, পরমুহূর্তে লাফ দিল ড্রেসিংটেবিলের দিকে--সেটার নীচের ড্রয়ারে ওর নাইন মিলিমিটারটা আছে।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকা ছেলেটা বুঝতে পারছে না, এত জোরে চেঁচানোর মত কী হয়েছে ওর সঙ্গিনীর।

আকাশের বিদ্যুচ্চমকের মত আগুনের ঝলকানি দেখা দিচ্ছে অফিসারের সাইলেন্সারের নলে, এত দক্ষ আর নিখুঁত নিশানার গুলির বর্ণনা পাওয়া যায় শুধু বুনো পশ্চিমের কিংবদন্তির বন্দুকবাজদের বর্ণনায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ক্যাভেনডিশ, বুলেট ওর একদিকের

পাঁজরের ফাঁক দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেছে আরেকদিকের পাঁজরটাকে ভেঙে দিয়ে।

পিঠে অসম্ভব ব্যথা নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল ছেলেটা, কী হচ্ছে বুঝবার আগেই টের পেল রক্ত উঠে আসছে ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে।

মৃত্যুভয়ে কোকেইনের নেশা কেটে গেছে মেয়েটার, একলাফে বিছানা থেকে নেমেই জানালার দিকে দৌড় দিয়েছে সে। ইচ্ছা আছে লাফিয়ে পড়বে জানালার ওপর, কাঁচ ভেঙে নীচে পড়লে মরতেও পারে, আবার বাঁচতেও পারে; কিন্তু ক্যাভেনডিশের বেডরুমে থাকলে অস্ত্রধারীর হাতে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে। লাফ দিল মেয়েটা, কিন্তু উড়ন্ত শরীরটা শূন্যে থাকা অবস্থাতেই ওর খুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেল অফিসারের দুটো বুলেট, তাই ভাঙা কাঁচসহ নীচের রাস্তায় আছড়ে পড়ল মেয়েটার নগ্ন লাশ।

বুলেটের আঘাতে জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেছে ওয়াটার বেড, শোনা যায় কি যায় না এমন আওয়াজে বেরিয়ে আসছে পানি, ভারী হয়ে যাচ্ছে বেডরুমের বহুমূল্য দুধসাদা কার্পেট। ধীরে ধীরে চুপসে যাচ্ছে বিছানাটা, সেটার ওপর সিজদা দেয়ার ভঙ্গিতে পড়ে আছে ছেলেটা, আর কোনওদিন গ্রহণ করতে পারবে না কোকেইনের স্বাদ। আর কোনওদিন সামান্য কোকেইনের বিনিময়ে বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে না ক্যাভি দ্য বুল'স আইও, ওর ব্যথায়-বিকৃত চেহারাই নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে সে-কথা।

শু'র ওপর পরা মোজা দুই টানে খুলে ফেলল অফিসার, তারপর ছুট লাগাল। ফায়ার এক্সিটের দরজার কাছে পৌঁছাতে চায় যত জলদি সম্ভব।

নগ্ন মেয়েটাকে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়তে দেখল ক্যাভেনডিশের

দ্বিতীয় বডিগার্ড, এবং মেয়েটা কে বুঝতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না লোকটার। একথাবায় শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে, একদৌড়ে ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর ভেতর, সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে উঠছে উপরে, অতি উত্তেজনায় ভুলেই গেছে লিফটের কথা। তাই যতক্ষণে সে হাজির হলো ক্যাভেনডিশের পেন্টহাউসে, ততক্ষণে ফায়ার এক্সিটের দরজা আটকে দিয়ে ধীরেসুস্থে নীচে নামছে সেই পুলিশ অফিসার।

ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে দেখল দ্বিতীয় বডিগার্ড, এতদিন যার নুন খেয়েছে, সে-লোকের উলঙ্গ লাশ পড়ে আছে বেডরুমের মেঝেতে। দেহরক্ষা-পেশায় যে-লোকের দেহ রক্ষা করতে হয় সে পটল তোলামাত্র চাকরি শেষ, আর বুদ্ধিমান যে-কোনও দেহরক্ষী চাকরি যাওয়ামাত্র হাওয়া হয়ে যেতে একমুহূর্ত দেরি করে না।

ক্যাভেনডিশের লাশ দেখার পর আবার ছুট লাগাল দ্বিতীয় বডিগার্ড, আইনি ঝামেলা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে বলে লিফটের কথাটা এসে গেছে ওর মাথায় এবার।

জানালা ভেঙে মেয়েটাকে রাস্তায় পড়তে দেখল লী, মুখটা হাঁ হয়ে গেল ওর। পাশে দাঁড়ানো চার্লিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য। তারপর দু'জনই ছুট লাগাল যার যার রাইফেলের উদ্দেশে, ওগুলো হাতে নিয়ে নেমে এল রাস্তায়। ছুটন্ত গাড়ির স্রোত এড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছুতে হবে ওপারের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ।

গ্যারেজের সঙ্গে একটা টয়লেট আছে, সেটার দরজার লক কাজ করে না ঠিকমত। তাই দরজাটা খুলতে গিয়ে গায়ের জোর খাটাতে হলো ক্যাভিস হ্যারিংটনকে। আচমকা খুলে গিয়ে পাশের দেয়ালে দড়াম করে বাড়ি খেল সেটা। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর

মালিক সমিতিকে বিড়বিড় করে গালি দিল হ্যারিংটন, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাঁ হাতটা মুছে ফেলল প্যান্টের পাছায়--প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় ওটা ব্যবহার করেছে। কী ঘটছে এই ভবনে অথবা এর আশপাশে, সে-ব্যাপারে কিছুই জানা নেই তার; তাই ধীর পায়ে এগোল পার্ক করে রাখা মোটরসাইকেলের উদ্দেশে।

হঠাৎ শুনতে পেল, ফায়ার এক্সিটের লোহার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে নেমে আসছে কে যেন; শুনলে মনে হয় যারপরনাই তাড়া আছে লোকটার, অথচ হ্যারিংটন নিশ্চিত আগুন লাগেনি বিল্ডিং-এর কোনও ফ্ল্যাটে। অস্বাভাবিকতা টের পেল সে, কোমরে ঝোলানো হোলস্টারের দিকে বাড়াল হাত, খানিকটা ঝুঁকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ফায়ার এক্সিটের দিকে। অনতিদূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে একটা সেডান, সেটার আড়ালে পজিশন নিল। পুলিশ সার্ভিস রিভলভারটা টেনে বের করল হোলস্টার থেকে, হ্যাণ্ডগানটা দক্ষ হাতে ধরে তাক করল লোহার সিঁড়ির দিকে।

ততক্ষণে সিঁড়ির শেষধাপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অন্য লোকটা।

'হোল্ড ইট!' হুঙ্কার ছাড়ল হ্যারিংটন। 'পুলিশ!'

ধীর হলো লোকটার গতি, কিন্তু পুলিশ শব্দটা শোনামাত্র মাথার ওপর হাত তুলল না সে।

হ্যারিংটনের দিকে ঘুরতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগছে না ওর?

যখন ঘুরল সে, তখন ঘোলাটে চাঁদের আলোয় চেহারাটা দেখে থতমত খেয়ে গেল হ্যারিংটন। 'তুমি!' উর্দিপরা পরিচিত কলিগকে দেখে সতর্কতায় ঢিল পড়েছে ওর, বেরিয়ে এসেছে গাড়ির আড়াল ছেড়ে, আপনাআপনি নেমে গেছে রিভলভার ধরা হাত। 'তুমি এখানে কী করছ?'

জবাবে মুখোমুখি দাঁড়ানো অফিসারের হাতেধরা ম্যাগনাম খুক খুক আওয়াজ করল পর পর তিনবার, তিনটে বুলেটই ছিদ্র করল হ্যারিংটনের হৃৎপিণ্ড। তৃতীয় বুলেট জায়গামত পৌঁছুনোর আগেই মারা গেছে হ্যারিংটন, লাশটা আছড়ে পড়ল সশব্দে, বিস্ময়ের ছাপ তখনও লেপ্টে আছে ওর চোখেমুখে। রাস্তায় খটাখট আওয়াজ তুলে বেশ কিছুদূর গিয়ে থামল হাত থেকে খসে পড়া অস্ত্রটা।

লিফটটা মসৃণ গতিতে নেমে এল নীচতলায়, টুং করে আওয়াজ হলো, খুলে গেল দরজা। ভূতের তাড়া খাওয়া আতঙ্কিত লোকের মত ছিটকে বের হলো দ্বিতীয় বডিগার্ড, দৌড়ে বের হলো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে। পার্ক করে রাখা নিজের সেডানটাই লক্ষ্য ওর, সটকে পড়তে হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

কিন্তু এ কী! বুনো পশ্চিমের সিনেমার শুটিং চলছে নাকি সেডানটার কাছে? উর্দিপরা দুই পুলিশ অফিসারের মধ্যে নায়ক কে, খলনায়কই বা কে? যেহেতু একজন গুলি করছে, আরেকজন লুটিয়ে পড়ছে, সেহেতু যে-অফিসার ম্যাগনামের ট্রিগার টানছে সে-ই নিশ্চয় হিরো?

'কী ব্যাপার, অফিসার?' শোল্ডার হোলস্টারের কাছে হাত চলে গেছে দ্বিতীয় বডিগার্ডের। 'কোনও সমস্যা?'

জবাবে লোকটার দিকে পাঁই করে ঘুরল অফিসার, ম্যাগনামের চেম্বারের বাকি তিনটা বুলেটের দুটো ঢোকাল লোকটার হৃৎপিণ্ডে, তিন নম্বরটা দুই চোখের ঠিক মাঝখানে।

একটা মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল আততায়ী, একরাতে ছ'জন মানুষকে পরলোকে পাঠাতে পারার আনন্দে উড়তে ইচ্ছা করছে তার। লম্বা করে দম নিয়ে মন নিয়ন্ত্রণ করল সে, ধোঁয়াওঠা ম্যাগনামটা ঢোকাল হোলস্টারে, সরে যাওয়া হেলমেটটা ঠিকঠাক করে নিল।

পালানোর সুযোগ আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিল, পালাবে না সে। পড়ে থাকা মিষ্টির টুকরো ছেঁকে ধরা পিঁপড়ার মত হাজির হবে উৎসুক জনতা একটু পরই, ওদের মুখোমুখি হবে। দেরি হয়ে গেছে, তাই পালাতে গিয়ে কারও চোখে পড়ে যাওয়ার চেয়ে, না পালিয়ে দায়িত্ব পালন করার নাটকে ঝুঁকি কম হবে।

চার্লিকে নিয়ে লী যতক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছাল গ্যারেজের কাছে, ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে। নগ্ন যুবতীকে নিয়েই আগ্রহ বেশিরভাগ কৌতূহলীর, তাই ওকে ঘিরে থাকা লোকের সংখ্যা বেশি। ওদের কেউ কেউ পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে ছবি তুলছে, পরে লাইক পাওয়ার জন্য পোস্ট দিতে পারে ফেইসবুকে। একটু বয়স্ক দু'-চারজনকে দেখা যাচ্ছে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হ্যারিংটনের দিকে। ওরা হতাশ, কারণ ওদের চোখে একটাই প্রশ্ন--একজন পুলিশ অফিসার যদি এতটা নৃশংসভাবে খুন হতে পারে, তা হলে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের কী হবে?

দ্বিতীয় বডিগার্ডের দিকে তাকানোর মত কেউ নেই।

মানবিকতা দেখাল চার্লি এমন সময়, নিজের জ্যাকেট খুলে ঢেকে দিল যুবতীর বুক থেকে কোমরের নীচ পর্যন্ত।

দেখার মত আর কিছু নেই, তাই কৌতূহলী জনতা সরে যাচ্ছে অনিচ্ছুক পায়ে। ফেইসবুক ম্যানিয়াকরা মোবাইল হাতে এগোচ্ছে বাকি লাশদুটোর দিকে, ওগুলোরও ছবি তুলে রাখাটা দরকার মনে করছে।

উৎসুক জনতাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে, আই.ডি. কার্ড আর আইনের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিল লী আর চার্লি। পকেট থেকে মোবাইল বের করে কাছের স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করল লী, সাহায্য চাইল। কথা শেষ করে মোবাইলটা যখন পকেটে ঢুকিয়ে

রাখছে সে, তখন ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসার।

লোকটাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল লী'র।

'কয়েক ব্লক দূরে ডিউটিতে ছিলাম,' লী'র জানতে না চাওয়া প্রশ্নটার জবাব দিল অফিসার, 'তাড়াহুড়ো করে আমাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় একজন বলল, গোলাগুলি চলছে এখানে। ব্যাপার কী দেখার জন্য চলে এলাম।'

লোকটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে হ্যারিংটনের দিকে তাকাল লী, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ব্যাপার তো...সাংঘাতিক।'

'তা-ই তো দেখছি,' একমত হলো অফিসার। 'এবার...একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করা হয়েছে।'

লোকটার বুকে সাঁটা নেমপ্লেট পড়ার চেষ্টা করল লী। 'তোমার নাম...'

'ডানহিল, স্যর,' সম্মান জানানোর জন্য বুক চিতিয়ে দাঁড়াল অফিসার, 'সানি ডানহিল।'

ষোলো

পরদিন সকাল।

পিঠটা সোজা করে নিজের অফিস ডেস্কের পেছনে বসে আছে হেইডন, একহাতে আঁকড়ে ধরে আছে টেলিফোনের রিসিভার। উদ্বিগ্ন আর ক্লান্ত চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে টানা কয়েক রাত ঘুমাতে পারছে না বেচারা। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা না।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে আছেন ক্যাপ্টেন ডোনাল্ড পিয়ার্স, মুখে যা আসছে তা-ই শোনাচ্ছেন তিনি হেইডনকে। 'সামলাতে না পারলে রিযাইন করছ না কেন,' 'তোমার মত অপদার্থকে চাকরি দিল কোন্ ছাগলের বাচ্চা,' 'হ্যারিংটনকে না মেরে তোমাকে শেষ করে দিলেই ভালো হতো,' ইত্যাদি একের পর এক গা-জ্বালানো মন্তব্য আর সহ্য করতে পারছে না হেইডন। কিন্তু কোনও প্রতিবাদও করতে পারছে না, কারণ কাজটা করতে গেলেই হিতে বিপরীত হবে। তাই পিয়ার্সের প্রতিটা মন্তব্যের জবাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'জী, স্যর,' বলতে হচ্ছে ওকে। পুলিশের চাকরিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যখন ধমকান, তখন দুই শব্দের ওই বাক্য বলাই অলিখিত নিয়ম। তাই পিয়ার্স যখন বললেন, 'তুমি পুরুষ নাকি হিজড়া তা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে আমার ইদানীং,' তখনও 'জী, স্যর,' বলতে হলো হেইডনকে।

'আমার কথা কানে ঢুকছে তো তোমার?' আরেক দফা হুঙ্কার ছাড়লেন পিয়ার্স। 'নাকি বুঝবার সামর্থ্য হারিয়েছে তোমার মগজ? সে-রকম হয়ে থাকলে বলো, তোমার ডিমোশনের ব্যবস্থা করি।'

'স্যর, আপনার সব কথা বুঝতে পারছি আমি।'

'লোকটা এবার এক রাতে খুন করেছে ছ'জনকে। তাদের মধ্যে একজন আমাদেরই কলিগ, আর তোমার অকেজো হোমিসাইডের প্রাইম সাসপেক্টদের একজন। কী পরিমাণ চাপ আসছে আমার ওপর, বোঝা গেছে?'

'জী, স্যর।'

'কচুটা বুঝেছ! নজরদারি করার জন্য তোমার মতই দুই ছাগলকে না পাঠিয়েছিলে টেলিগ্রাফ হিলে? ওরা করছিলটা কী?'

'নজরদারিই তো করছিল। কিন্তু...'

'চুপ করো! হোমিসাইডের সবার পার্সোনাল ফাইল পাঠাবে আমার কাছে। কার চাকরির বয়স কতদিন, কে যোগ্য আর কে

নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়--সব দেখব আমি। আগুন লেগে গেছে আমার গদিতে, তোমাদের দু'-চারটাকে পানিশমেন্ট ট্রান্সফার না দিলে সে-আগুন নিভবে না।'

'জী, স্যর।'

'অনারারি অফিসার বানিয়ে মাসুদ রানাকে যে আনলে, ওকে দিয়ে কোন্ ঘোড়ার ঘাস কাটাচ্ছ বলো।'

'স্যর, আমি কিন্তু মাসুদ রানাকে অনারারি অফিসার বানাইনি, বানানোর প্রস্তাবও দিইনি কারও কাছে। আপনি জানেন, তারপরও বলছি, প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কি আর ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড আড়ালে থেকে কলকাঠি নেড়েছেন। যা-হোক, ওই লোককেও নজরদারির...'

'কোন্ অশ্বডিম্ব প্রসব করতে পেরেছে লোকটা, জানতে পারি?'

'না, এখন পর্যন্ত পযিটিভ কোনও ডেভেলপমেন্ট নেই, তবে আশা করছি...'

'আশা করা পর্যন্তই তোমার দৌড়, হেইডন। পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্যতা অনেক আগেই হারিয়েছ তুমি। বাকিদের সঙ্গে তোমার ফাইলও ঘেঁটে দেখতে হবে আমাকে। মোটামুটি নিশ্চিত থাকো এলএপিডি ছাড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে তোমার।'

'জী, স্যর।'

'একটু স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দাও মাসুদ রানাকে। ওর সিদ্ধান্ত আর মতামতের দাম দাও। আশা করতে পারো ঠকবে না। প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কি আর ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড নিশ্চয়ই শুধু শুধু এত ভরসা করছেন না লোকটার ওপর?'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর।'

'তোমাদের মিডিয়া উইং-এর কী খবর? শুনলাম ডিপার্টমেন্টের সব হাবাকে নাকি গলায় মালা পরিয়ে বসিয়ে

রেখেছ সেখানে, ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন দেখামাত্র গড়গড় করে বলে দিচ্ছে ওরা তোমাদের ব্যর্থতার কাহিনি? ...চমৎকার, হেইডন, তোমার তুলনা হয় না!'

'স্যর, কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে ও-রকম হবে না আর। বিষয়টা ব্যক্তিগতভাবে দেখব আমি।'

'হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবেই দেখো। তা না হলে তোমার শরীরের বিশেষ একটা জায়গা দিয়ে ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন ঢুকে যাবে, আমিও কথা দিচ্ছি,' লাইন কেটে দিলেন পিয়ার্স।

রিসিভার নামিয়ে রাখল হেইডন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিল চেয়ারে। টের পেল লাল হয়ে আছে ওর মুখটা, গরম হয়ে গেছে দু'কান।

এমন সময় ওর ডেস্কের সামনে হাজির হলো রানা, সঙ্গে শায়লা মারিয়া।

ওদের দিকে দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল হেইডন, তারপর দুম করে এক কিল বসিয়ে দিল ডেস্কে, একলাফে উঠে দাঁড়াল স্প্রিং-এর মত। 'কোন্ শালা তোমাকে অনারারি অফিসার বানিয়েছে?' গলা ফাটিয়ে বলল, একটু আগে শোনা বকুনিগুলোর শোধ তুলবার মত লোক পেয়ে গেছে। 'পুলিশের চাকরি কী, জানো?'

'কেন, কী হয়েছে?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'কী হয়েছে?' হুঙ্কার ছাড়ল হেইডন। 'তুমি জানো না কী হয়েছে? তোমার কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে আমাদের তদন্ত।'

'কীভাবে?'

'ন্যাকা সেজো না, বুঝলে? ন্যাকামো আমার একদম পছন্দ না। কাল রাতে কী করেছ, মনে নেই? শর্টি টার্নারকে ফলো করার কী দরকার ছিল?'

'কেন, তুমিই তো বলেছিলে আমার নাকটা ওর...'

'চুপ করো! কী বলেছিলাম তা শোনাতে এসো না আমাকে। কড়া নজরদারিতে রাখতে বলেছিলাম ওকে, কাজটা করতে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে এসেছ পুলিশের চোখ পড়েছে ওর ওপর। এসবের মানে কী?'

'কিছু না।'

রাগে লাল হয়ে গেল হেইডনের চেহারা, নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। 'তোমার এই কথাটাই কি জানাব আমি মিস্টার পিয়ার্সকে?'

'কী জানাবে তা নিয়ে দেখছি টেনশনে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমার। ঠিক আছে, বলে দিয়ো, শর্টি টার্নার নির্দোষ।'

'মানে?'

'মানেটা সহজ, হেইডন। সিরিয়াল কিলিংগুলোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই টার্নারের। তাই আবারও বলছি, ফালতু কাজে সময় নষ্ট করা বন্ধ করো, তদন্তের দিক বদলাও।'

'রানা, আমি...'

'আমরা যাকে খুঁজছি,' হেইডনকে বলার সুযোগ দিল না রানা, 'সে তোমাদের তালিকাভুক্ত কোনও ক্রিমিনাল নয়, সে একজন ট্রাফিক অফিসার।'

মনে হচ্ছে বম ফাটিয়েছে রানা, কারণ বিস্ফোরণের পর যে-রকম নিস্তব্ধতা নেমে আসে হঠাৎ করে, ঠিক সে-রকম অবস্থা এখন হেইডনের অফিসে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে হেইডন আর শায়লা দু'জনই, অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'অফিসার!' কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল হেইডন। 'একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসার? তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে, রানা? যতরকমের অপরাধী আর সমাজবিরোধী আছে, তাদেরকে নিজহাতে খুন করে এই শহরটাকে জঞ্জালমুক্ত করছে একজন পুলিশ--কথাটা বিশ্বাস করতে বলছ আমাকে?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'ঠিক আছে, তা হলে অফিসারটার নামও শোনাও আমাকে।'

'এখনও ঠিক জানি না। তবে সন্দেহের তালিকায় রয়েছে ক্যাভিস হ্যারিংটন।'

পাগল দেখলে লোকের চোখে যে-দৃষ্টি ফুটে ওঠে, হেইডনের চোখে এখন ঠিক সে-দৃষ্টি। কয়েকটা সেকেণ্ড নির্নিমেষ দেখল সে রানাকে, তারপর আচমকা নাড়াতে শুরু করল ঠোঁটদুটো--মুখের ভেতরে জমা হওয়া তেতো থুতুগুলো গিলছে। ঢোক গিলে বলল, 'রানা, দোষ আসলে তোমার না। দোষ কাদের, জানো? যারা তোমাকে মহাপুরুষ বা জাদুকর হুডিনি মনে করে নিয়োগ দিয়েছে এলএপিডিতে, তাদের।'

'কেন?'

আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল হেইডন। 'কেন? কাল রাতে ক্যাভেনডিশের গ্যারেজের কাছে মারা পড়েছে একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসার। আমি বলে না দিলেও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ কে সে?'

চুপ হয়ে গেছে রানা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেইডনের দিকে, মেঘ জমছে চেহারায়।

'ক্যাভিস হ্যারিংটন?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই ফেলল শায়লা।

'ইয়েস, মাই লেডি,' হেইডনের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ, 'ওর নাম ক্যাভিস হ্যারিংটন। আশা করি আপনাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে লজ্জায় এতক্ষণে লোকটাকে স্বর্গে ঠাঁই দিয়েছেন ঈশ্বর।'

কী বলা যেতে পারে ভেবে পেল না শায়লা।

'ঘটনাটা রিপোর্ট করেছে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদেরই এক পেট্রলম্যান।'

'নাম কী লোকটার?'

'সানি ডানহিল।'

'সানি! কিন্তু ক্যাভেনডিশের ওখানে তো...'

'চার্লি হ্যালেক আর লী ডেডরিক নামের দুই রামছাগলের থাকার কথা ছিল, তা-ই না? রাস্তা পার হতে গিয়েই ওই দু'জনের সময় শেষ, হ্যারিংটনকে বাঁচাবে কখন? ঘটনাচক্রে কাছাকাছি ছিল সানি, সম্ভবত গুলির আওয়াজ শুনে দেখতে যায় ব্যাপার কী, কিন্তু ততক্ষণে হ্যারিংটনের জন্য কিছুই করার নেই।'

'কে গুলি করেছে হ্যারিংটনকে, দেখেছে কেউ?'

'না। রাতের আঁধারে হঠাৎ ঘটে গেছে ঘটনাটা, কেউ ভাবতেও পারেনি।'

'তুমি শিয়োর?'

'ভালোমত খোঁজখবর করেছি আমরা, রানা। কোনও সাক্ষী পাইনি।'

'হ্যারিংটনের স্ত্রী...সারা রোযডেনকে জানানো হয়েছে ঘটনাটা?'

'না, জানানো হয়নি। কারণ আমার ঠেকা পড়েনি। একটা পাগল কোন্ জায়গায় গিয়ে মারা পড়ল, সেটা তার পরিবারকে জানানোর দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে কেন? তোমার দরদ লাগলে তুমি গিয়ে জানাও।'

কড়া কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা, ঘুরে হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে।

ওকে পিছু ডাকল হেইডন। 'শোনো, আমার কথা শুনে আবার ভেবো না হ্যারিংটন মরেছে বলে খুশিতে আটখানা হয়ে গেছি আমি। লোকটার জন্যে আসলে খারাপই লাগছে আমার। হাজার হোক, আমাদের কলিগ ছিল সে। কিন্তু...কী আর করা--নিয়তি যার মরণ যেভাবে লিখে রেখেছে তাকে সেভাবে মরতেই হবে। ...আগেও বলেছি, আবারও বলছি, সব দোষ শর্টি টার্নারের। সে-ই করাচ্ছে খুনগুলো। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর নামে

ওয়ার‍্যান্ট ইস্যু করাচ্ছি আমি। তারপর যদি না বুঝিয়েছি লোকটাকে কত ধানে কত চাল, তো আমার নাম হেইডন না।'

ঘাড় ঘুরাল রানা, কিছু একটা বলতে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদলে চলে গেল বাইরে। হেইডনের দিকে একবার তাকিয়ে শায়লাও বেরিয়ে গেল।

করিডোর ধরে নিঃশব্দে হেঁটে লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

নীচে নামার বাটনে চাপ দিয়ে শায়লা বলল, 'মিস্টার হ্যারিংটনের যে এ-রকম কিছু একটা হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি। আমি...'

কথা শেষ করতে পারল না সে--খুলে গেছে লিফটের দরজা, বেরিয়ে এল উর্দিপরা সানি ডানহিল।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

লিফটের বাইরে এসে দাঁড়াল সানি, ওকে রানা নিষ্পলক দেখছে বুঝতে পেরে গোলাপি আভা পড়েছে ওর দু'গালে। নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য ঢোক গিলল সে। নিচু গলায়, অপরাধ স্বীকার করার ঢঙে বলল, 'সবাই এ-রকমই করছে আমার সঙ্গে। আমাকেই দোষ দিচ্ছে সবাই। আরেকটু আগে যদি যেতে পারতাম সেখানে...তা হলে...তা হলে হয়তো মিস্টার হ্যারিংটনকে ওভাবে...। লোকটাকে সন্দেহের চোখে দেখত অনেকেই, কিন্তু কেউই চায়নি এভাবে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল। অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না--ওকে এখনও দেখছে রানা। 'আপনিই বলুন কিছু করার ছিল কি না আমার। আমি জানতাম না নজরবন্দি করা হয়েছে মিস্টার ক্যাভেনডিশকে, জানতাম না সেখানে এলএপিডি'র দু'জন অফিসার আছেন। আর কোন্ ফাঁকে যে...'

বাটন চেপে এতক্ষণ লিফটের দরজা খুলে রেখেছিল রানা,

এবার ভেতরে ঢুকে পড়ল, কথা শেষ করার সুযোগ পেল না সানি। শায়লাও ঢুকল।

ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজাটা। আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যাচ্ছে সানির চেহারা। অপ্রস্তুত ভাব...অথবা হয়তো অপরাধবোধ আছে সে-চেহারায়, কিন্তু দু'চোখে আশ্চর্য দ্যুতি। চোখদুটো যাতে দেখা না যায় সেজন্য মাথা নিচু করল সে। তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল হেইডনের ডেস্কের দিকে।

সাবলীল গতিতে নীচে নামছে লিফট।

রানার দিকে তাকাল শায়লা। 'ব্যাপারটা কী হলো তা হলে, মাসুদ ভাই?'

'পুলিশ অফিসার,' অ্যালুমিনিয়াম দরজায় নিজের অস্পষ্ট প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে বলল রানা।

সতেরো

প্লেনের কার্গোতে হ্যারিংটনের কফিন তুলছে যে-ফর্কলিফট, জেট ইঞ্জিনের গর্জনের নীচে চাপা পড়ে গেছে সেটার আওয়াজ। কার্গোর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক, কফিনসহ বাকি মালসামান ওদের সমান্তরালে পৌঁছানোর পর সেগুলো টেনে ভেতরে নিল ওরা। দু'-চারজন যাত্রীকে দেখা যাচ্ছে অলস পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে প্লেনে। কেউ কেউ ইতোমধ্যেই উঠে গেছে, বসে পড়েছে যার যার সিটে। যারা উঠি উঠি করছে, তারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বোর্ডিং গেটের কাছে দাঁড়ানো

তিন বাচ্চাসহ এক মহিলা আর এক এশিয়ান লোকের দিকে।

মহিলাটির, মানে, সারা রোযডেনের পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক। দেখে মনে হচ্ছে শোক সামলে উঠতে পেরেছে, কিন্তু আসলে পারেনি--ওর চেহারায় এখনও লেপ্টে আছে বিষাদ। ওর পাশের লোকটি মাসুদ রানা, একটা পাতলা কালচে সামার স্যুট পরে আছে ও, চোখমুখ গম্ভীর।

'আপনাকে ধন্যবাদ,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল সারা।

ওর দিকে তাকাল রানা, কিছুটা হলেও আশ্চর্য হয়েছে। 'কেন?'

'এখানে না এলেও কেউ কিছু বলত না আপনাকে। তারপরও এসেছেন।'

'ডিসকাউন্ট স্টোরের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে চলেই যাচ্ছেন...'

'উপায় নেই। মন মানানোর চেষ্টা করেছি, পারলাম না। নিউ অরলিন্সে এখনও বেঁচে আছেন আমার বাপ-মা, তাঁদের ইচ্ছা তাঁদের পুরনো খামারবাড়িতেই দাফন হোক ক্যাভিসের, ইচ্ছাটা পূরণ করি আপাতত।'

'তারপর?'

'জানি না। পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

'তা হয়তো যাবে, কিন্তু আপনার বাসায় গিয়ে চমৎকার ঘরে বানানো বিস্কিট খাওয়ার সৌভাগ্য আর হয়তো কখনও হবে না আমার।'

'বেশি ইচ্ছে হলে,' হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল সারা, চট্ করে হাত তুলে মুছল চোখের কোনা, 'চলে আসবেন নিউ অরলিন্সে।' আরও কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ ফোঁপানি শুরু হওয়ায় বলতে পারল না।

'চলুন, এগিয়ে দিই আপনাকে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বোর্ডিং গেটে এমন সময় হাজির হলো সানি ডানহিল; একহাতে ধরল সারার মেয়েটার হাত, অন্য হাতে সামলাচ্ছে ছোট দুই ছেলেকে--ওদেরকে নিয়ে এগিয়ে আসছে প্লেনের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদেরকে দেখে নিজেকে সামলে নিল সারা, চট করে দু'চোখ মুছল আবারও, রুমাল বের করে নাক মুছল। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লেনের টিকেট কেটে দেয়া, টুকটাক মাল গোছানো, যেসব জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না সেগুলো চটজলদি বিক্রির ব্যবস্থা করা, এমনকী ব্যাংকে জমানো টাকাগুলো ঠিকঠাক তুলে আনা--সানি যেচে পড়ে অনেককিছু করছে আমাদের জন্য।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ছোট করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আসি তা হলে,' প্লেনের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সারা।

'গুডবাই।'

সারার ছেলেমেয়েদেরকে ওর কাছে হস্তান্তর করল সানি। ওদেরকে নিয়ে দ্রুত পায়ে প্লেনের দিকে এগোল সারা, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সারা ঘুরল হঠাৎ, রানা আর সানির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে, দু'চোখে অশ্রুর বন্যা।

ঘুরল বাচ্চাগুলোও, মা'র দেখাদেখি হাত নাড়ছে ওরাও।

সারাকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য চেঁচিয়ে কিছু একটা বলল সানি, কিন্তু ইঞ্জিনের গর্জনের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ায় কথাটা শুনতে পেল না সারা।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা, একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ওর বুকের ভিতরে খুব কষ্ট হচ্ছে। এয়ারপোর্টটাকে, আশপাশের সমস্ত প্রকৃতিকে আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার। অতি উজ্জ্বল ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলে উঠছে

একটা-দুটো করে।

সানির দিকে তাকাল রানা। 'পরিবারটার জন্যে অনেক করলে তুমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল সানি, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার কারণেই মরতে হয়েছে মিস্টার হ্যারিংটনকে। যদি আরেকটু আগে যেতে পারতাম...। পরিবারটার জন্য যা করেছি, একরকমের অপরাধবোধে ভুগছি বলেই করেছি। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও একই কাজ করত।'

সানির দিকে তাকাল রানা, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

সে-দৃষ্টির মানে বুঝল না সানি, বুঝতে পারা কঠিন।

সিগারেট ফুঁকতে পারে বটে সানি।

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে একের পর এক সিগারেট টেনে চলেছে সে, এবং প্রথমটা বাদে নতুন কোনওটা ধরানোর জন্য লাইটারের দরকার পড়েনি--ফুরিয়ে আসা আগেরটা দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। তাই ওর প্যাকেট খালি হতে বেশি সময় লাগল না। গাড়ি চালাচ্ছে রানা, শেষ সিগারেটটা শেষ হওয়ার পর ওর দিকে তাকিয়ে সানি বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, হাইওয়েতে থামতে পারবেন একটু? নতুন একটা প্যাকেট কেনা দরকার।'

এখনও বিষণ্ন হয়ে আছে রানা, সানিকে একের পর এক সিগারেট টানতে দেখে নিজের "ধোঁয়াক্ষুধা" লাগার পরও ধরায়নি একটাও। একইসঙ্গে তাড়না অনুভব করছে মনে--তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে পুলিশ বিল্ডিং-এর টার্গেট রেঞ্জে, অ্যানুয়াল শুটিং কমপিটিশনের জন্য আরেকবার ঝালাই করে নিতে হবে নিজেকে। এ-ক'দিন দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত থাকায় সময় করতে পারেনি, অথচ আজ রাত গড়ালে আগামীকাল সকালেই প্রতিযোগিতা। তাই সানির অনুরোধের জবাবে গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, 'ঠিক আছে,

কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে।'

বাঁয়ের ইণ্ডিকেটরটা জ্বেলে দিয়ে আস্তে আস্তে সরে এল ও মেইন লেন থেকে, একটা এক্সিটের দিকে এগোচ্ছে। এখান দিয়ে কিছুদূর গেলে মোটামুটি পরিচিত একটা বৌলিং ক্লাব আছে, সেখানে সিগারেট মেশিন আছে--নির্দিষ্ট ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের স্লটে নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়েন ফেললে টুপ করে বেরিয়ে আসে একটা প্যাকেট।

জায়গামত পৌঁছানোর পর গাড়ি থামাল রানা, ইঞ্জিন বন্ধ করল।

দরজা খুলে বের হতে গিয়েও থেমে গেল সানি, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'একটু বিয়ার হয়ে যাবে নাকি, স্যর? সেই তখন থেকে দেখছি মনমরা হয়ে আছেন আপনি।'

রাজি হয়ে গেল রানা। 'ঠিক আছে, চলো।'

নামল দু'জনে, বৌলিং ক্লাবটার দিকে এগোচ্ছে।

দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ জমে উঠেছে জায়গাটা। একতলা ভবনের ভেতরে প্রথমে বেশ বড় একটা ক্যাফে, তারপর রেলিংদেয়া বৌলিং এরিয়া। একটা লেনও খালি নেই, এবং সবগুলোতেই ভিড় জমিয়েছে টিনএজাররা। ধাতব হাতলওয়ালা কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই কানে বাড়ি মারল একটানা ঘড়ঘড় শব্দ--পলিশ করা তেলমাখানো কাঠের মেঝে দিয়ে গড়িয়ে চলেছে একের পর এক বৌলিং বল। কেউ নিশানায় পাকা, আবার কেউ আনাড়ি; তাই কাঠ কুঁদে বানানো পিনগুলোর পতনের শব্দ নিয়মিত না। দেখা গেল সবরকমের খেলাই হচ্ছে--টেন-পিন, নাইন-পিন, ক্যাণ্ডেলপিন, ডাকপিন, ফাইভ-পিন।

রানাদের দিকে এগিয়ে আসছে চারটে ছেলেমেয়ের একটা দল--বোধহয় খেলা শেষ ওদের, বেরিয়ে যাবে এখন। দলে দুটো

মেয়ে আছে। একজন ধবধবে ফরসা, আরেকজন রৌদ্রস্নান করে বাদামি বানিয়েছে গায়ের রঙ। কারও বয়সই আঠারোর বেশি না। দু'জন আলাদা আলাদাভাবে চুম্বকের মত সেঁটে আছে দুটো ছেলের সঙ্গে, এদের বয়স মেয়েদুটোর চেয়ে কিছু বেশি। একটা ছেলে হ্যাংলাপাতলা, দেখলে কেমন দুর্বলদেহী মনে হয়, কিন্তু বেশ সুদর্শন। অন্য ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো, কিন্তু চেহারা ভালো না।

'টিনএজারদের স্বর্গরাজ্য,' এদিক-ওদিক তাকিয়ে মন্তব্য করল রানা।

জবাবে কিছু একটা বলতে চেয়েও বলল না সানি—চেহারা পাল্টে গেছে ওর। কারণ ধবধবে ফরসা মেয়েটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছা করে হোক বা অনিচ্ছায়, আলতো ধাক্কা দিয়েছে ওর কাঁধে; ফলে সানিও ইচ্ছা করে হোক অথবা অনিচ্ছায়, ঘুরে তাকিয়েছে মেয়েটার দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, টাইট জিন্সপরা মেয়েটা নিতম্বে অনিন্দ্য নাচন তুলে চলে যাচ্ছে।

বেখেয়াল হয়ে পড়ায় পরেরবারের ধাক্কাটা সামলাতে পারল না সে, আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল।

এবার ধাক্কা মেরেছে এক জোয়ান মর্দ, বৌলিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আরেক মর্দের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। ওদের একজন বিশালদেহী, গালে বিচ্ছিরি কাটা দাগ। আরেকজন তুলনামূলকভাবে বেঁটেখাট কিন্তু গাট্টাগোট্টা, ইচ্ছামত জেল দিয়ে চুপচুপে করে রেখেছে চুলগুলো। দু'জনের পরনেই ধূসর ওয়ার্কক্লথ, ওদের জ্যাকেটের পিঠে বড় বড় করে লেখা: পার্শিয়ান কার্পেট।

দু'হাত মেঝেতে ঠেকিয়ে পতন সামলাল সানি, অলক্ষুণে কিছু একটা টের পেয়েছে লম্বু-বাঁটকুর হাবভাবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে

ওই দু'জনের পিছু নিল সে। ততক্ষণে বৌলিং এরিয়াটাকে হাতের ডানে রেখে ক্যাফের দিকে মোড় নিয়েছে রানা, ধরেই নিয়েছে ওর পিছন পিছন আসছে সানি।

রাস্তায় বেরিয়ে এল সানি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বৌলিং ক্লাবের একটা কোনা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বাঁটকু, লম্বু উধাও হয়েছে আগেই। ছুট লাগল সানি। কোনাটা ঘুরে দৌড়ের গতি বাড়াল, টের পেল ক্লাবের পাশের ব্লকের গলির দিকে যাচ্ছে। গলির প্রবেশপথের কাছাকাছি হয়েছে, এমন সময় কানে এল ধস্তাধস্তির আওয়াজ--মনে হচ্ছে বড় রাস্তার পার্কিংলটের কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে আসছে।

সানিকে চমকে দিয়ে 'বাঁচাও, বাঁচাও,' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বেরিয়ে এল গলির ভেতর থেকে, ওদেরকে দেখে ইচ্ছা না থাকার পরও ধীর হলো সানির দৌড়ানোর গতি। সেই সুদর্শন ছেলেটা আর ওর ধবধবে ফরসা বান্ধবী। দু'জনের চেহারাতেই নগ্ন আতঙ্ক। সানিকে দেখামাত্র চেঁচিয়ে কিছু একটা বলল ছেলেটা, কিন্তু একটা বর্ণও বোঝা গেল না--গলির ওমাথা দিয়ে বড় রাস্তা ধরে বিকট গর্জন করতে করতে চলে যাচ্ছে একটা ট্রাক। হাঁপাতে হাঁপাতে, হাউমাউ করে কথাগুলো আবার যখন বলল ছেলেটা, শুধু শেষের কয়েকটা শব্দ বুঝতে পারল সানি, 'ওরা মেরে ফেলছে আমার বন্ধুকে।'

তীরবেগে ছুট লাগাল সানি, একদৌড়ে হাজির হলো পার্কিংলটের কাছে। পার্শিয়ান কার্পেটের লম্বু-বাঁটকু মিলে মারতে মারতে রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছে ভালো স্বাস্থ্যের ছেলেটাকে, নাকমুখ দিয়ে সমানে রক্ত পড়ছে বেচারার, দম নেয়ার জন্য ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে সে।

ট্রাফিক পুলিশের উর্দিপরা সানির উপস্থিতি হঠাৎ করেই টের পেল লম্বু, কোমরে গুঁজে রাখা কার্পেট-কাটার বড় একটা ছুরি বের

করল ধীরেসুস্থে। দৌড়ানোর গতি কমাল না সানি, আগের মতই ছুটে গিয়ে উড়াল দিল হঠাৎ, লম্বুকে ছুরি চালানোর কোনও সুযোগ না দিয়ে প্রচণ্ড এক ফ্লায়িংকিক মারল লোকটার নাকে-মুখে।

ঘটনাটার জন্য প্রস্তুত ছিল না লম্বু, ওর শরীরটা ঘুরে গেল একদিকে, ব্যালেন্স হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে গলিতে, হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেছে ছুরিটা।

ওর স্যাঙাৎ বাঁটকু ওরফে গাট্টাগোট্টা দেখল অবস্থা বেগতিক, কারণ পুলিশ এসে গেছে; তাই ছুট লাগাল রক্তাক্ত ছেলেটাকে ফেলে রেখে। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল সে, ছুটন্ত গাড়িগুলোর তোয়াক্কা না করে জানবাজি রেখে দৌড়াচ্ছে এঁকেবেঁকে।

ওর পিছু পিছু ছুটছে সানিও, মাথায় রক্ত উঠে গেছে ওর। গুণ্ডামার্কা একটা লোকের পিছু ধাওয়া করছে একজন ট্রাফিক পুলিশ--নাটকটা দেখার জন্য হোক অথবা পুলিশের কাজে সাহায্য করার জন্য হোক, গাড়ির গতি কমিয়েছে বা কমাচ্ছে অনেক ড্রাইভারই, আচমকা ব্রেক চাপায় রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের বিচ্ছিরি শব্দ শোনা যাচ্ছে একটু পর পর, থেকে থেকে বেজে উঠছে হর্ন।

আরেকটু হলেই সানিকে চাপা দিয়েছিল একটা ট্যাক্সি, শেষমুহূর্তে ব্রেক করতে পারায় চেপে রাখা দম সশব্দে ছাড়ল ড্রাইভার, বিড়বিড় করে ডাকল মাতা মেরিকে। লোকটাকে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে বাঁটকুর দিকে নজর দিল সানি। অনতিদূরে ব্রেক করতে গিয়ে পিছলে গেছে একটা গাড়ির চাকা, হেঁচড়ে গিয়ে বাঁটকুর দৌড়ানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে সেটা, লোকটার পেছনে এইমাত্র ব্রেক করল আরেকটা গাড়ি, সুতরাং পালানোর পথ আপাতত বন্ধ।

সামনে একটা ট্র্যাশক্যান দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে

সজোরে ছুঁড়ে মারল সানি বাঁটকুর দিকে। আবর্জনাগুলো ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ল রাস্তায়, কিন্তু ট্র্যাশক্যানটা উড়ে গিয়ে ঠিকই আছড়ে পড়ল বাঁটকুর মাথায়। আবার ছুটতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলল সে, হোঁচট খেল দু'-তিনবার, শেষে সময়মত ব্রেক করতে না পারা এক মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খেল। সামলে ওঠার আগেই ওর কাছে হাজির হয়ে গেল সানি।

অন্য কেউ হলে প্রথমেই ঘুসি মারত নাকেমুখে, কিন্তু আনআর্মড কমব্যাটে ট্রেনিং আছে সানির, তাই জোরে ঘুসি মারল সে, মারল বাঁটকুর গলায়--কণ্ঠার হাড় থেকে ইঞ্চি দু'-এক পাশে। আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল লোকটার মুখ, আচমকা দম আটকে যাওয়ায় আকুলিবিকুলি করছে ওর ফুসফুস। ওকে সামলে ওঠার সুযোগ দিল না সানি, দু'হাতে জ্যাকেটের কলার ধরে হেঁচড়ে নিয়ে গেল সবচেয়ে কাছের গাড়িটার দিকে, প্রচণ্ড জোরে মাথাটা ঠুকে দিল একদিকের কাঁচে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল, একইসঙ্গে কেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল বাঁটকুর চেহারা। এতক্ষণে সশব্দে দম নিতে পারছে সে, কিন্তু আওয়াজটা শোনাচ্ছে গোঙানির মত। ওকে বেশিক্ষণ গোঙানোর সুযোগ দিল না সানি, কলার ধরে টেনে বের করল, তারপর সর্বশক্তিতে আছড়ে ফেলল রাস্তার পাশের স্টীল রেলিং-এর ওপর। প্রচণ্ড ব্যথায় গগনবিদারী চিৎকার ছাড়ল বাঁটকু।

গলির ভেতরে এতক্ষণে সামলে নিয়েছে লম্বু, আছড়েপাছড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে নিয়েছে ছুরিটা, এলোমেলো পদক্ষেপে হেঁটে বেরিয়ে এসেছে বড় রাস্তায়। খুনের নেশা পেয়ে বসেছে ওকেও, টার্গেট সানি ছাড়া আর কেউ না।

টের পায়নি, ওর ঠিক পেছনেই নিঃশব্দে হাজির হয়েছে রানা, হাতে বিয়ারের বোতল।

ঘটনা আঁচ করে নিয়েছে রানা, লম্বুকে দৌড় দিতে দেখে

একটা পা বাড়িয়ে দিল তাই, ল্যাং খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। কিন্তু তার আগেই হাতেধরা বিয়ারের বোতল ফাটিয়েছে রানা লোকটার মাথায়। শত টুকরো হয়ে বোতলটা পড়েছে রাস্তায়, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠতে গিয়ে ভাঙা কাঁচে হাত কাটল লোকটার, একহাতের তালু ভেদ করে কাঁচের টুকরো ঢুকে যাওয়ায় ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। দু'পা সরে গিয়ে পজিশন নিল রানা, লম্বুর থুঁতনিটাকে ফুটবল মনে করে ডান পায়ে জুতোর ডগা দিয়ে কিক মারল গোলকিপারদের মত, হাড় ভাঙার বীভৎস আওয়াজ কানে আসায় বুঝল লাথিটা জুৎসই হয়েছে।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লম্বু রাস্তায়, রানা জানে অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। জ্যাকেটের কলার ধরে হেঁচড়ে ওকে রেলিং-এর কাছে নিয়ে গেল রানা, হ্যাণ্ডকাফ বের করে একটা এককব্জিতে পরিয়ে অন্যটা আটকে দিল রেলিং-এর সঙ্গে। লাথি মেরে খানিকটা দূরে সরিয়ে দিল পড়ে থাকা ছুরি।

সানির দিকে তাকাল ও। পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে সানি, কাজেই সাহায্যের দরকার হবে না ওর। ঘুরে ছুট লাগাল রানা গলিটার দিকে, ছেলেটা যেখানে পড়ে আছে।

কিন্তু নাম না জানা ছেলেটার নিথর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই মনের ভিতরটা কু ডাকল রানার। কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, একহাতে ছেলেটার থুঁতনি আলতো করে নাড়া দিল। মরা মানুষের মত নড়ছে মাথাটা, শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উবু হয়ে ছেলেটার বুকে কান চেপে ধরল রানা। কোনও আওয়াজ নেই। লাভ নেই জেনেও নাড়ি পরীক্ষা করল করল। পালস নেই।

মারা গেছে ছেলেটা।

হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন খুন

করল লোকগুলো এই ছেলেটাকে? ধীর পায়ে হেঁটে আবার বড় রাস্তায় হাজির হলো রানা। আশ্চর্য, রাগ এখনও কমেনি সানির, বাঁটকুকে রাস্তায় ফেলে একের পর এক লাথি মেরে চলেছে লোকটার মুখে-বুকে-পেটে। কখনও কখনও টেনে তুলছে জ্যাকেটের কলার ধরে, মাথাটা সজোরে ঠুকে দিচ্ছে স্টীলের রেলিং-এর সঙ্গে। দেখে মনে হচ্ছে লোকটাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে। মাথা, কপাল, গাল, নাক, ঠোঁট--বেঁটে লোকটার চেহারার প্রায় সব জায়গা দিয়েই রক্ত বের হচ্ছে সমানে। বাধা দিচ্ছে না সে, নিস্তেজ হয়ে আসা শরীরে সে-ক্ষমতা নেই সম্ভবত।

ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে আরও একবার রেলিং-এর ওপর আছড়ে ফেলল সানি, তারপর দু'পা সরে গিয়ে ধীরেসুস্থে পিস্তল বের করল হোলস্টার থেকে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রানার, যত জোরে পারে ছুট লাগাল সানির উদ্দেশে। সময় নিয়ে নিশানা করছিল সানি, ট্রিগার টানতে যাবে, এমন সময় কাছে পৌঁছে একথাবায় ওর হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল রানা।

'পাগল হয়ে গেছ?' প্রচণ্ড ধমক দিল ও সানিকে। 'যার বাধা দেয়ার কোনও ক্ষমতাই নেই তাকে গুলি করে মারতে যাচ্ছ কেন?'

'এটাই পাওনা বেজন্মাটার,' এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি সানি, হাঁপাচ্ছে। 'ওদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আমরা।'

'আমরা?' বুঝতে পারেনি রানা।

কিন্তু সানি কিছু বলার আগেই শোনা গেল একটা মেয়ের গগনবিদারী চিৎকার--বাদামি চামড়ার মেয়েটা হাজির হয়েছে গলিতে, ওর বয়ফ্রেণ্ডকে মরে পড়ে থাকতে দেখে দুঃখে বা আতঙ্কে গলা ফাটাচ্ছে।

পিস্তলটা সানিকে দেয়া ঠিক হবে না এখন, তাই ওটা হাতে

নিয়েই দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল রানা গলির উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে দেখল, মৃত বয়ফ্রেণ্ডের বুকের ওপর পড়ে সমানে ফোঁপাচ্ছে বাদামি মেয়েটা, আহাজারি করছে কখনও কখনও। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ফরসা মেয়েটা, বান্ধবীর কাঁধে-পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভয়ে কাঁপছে নিজেই, আতঙ্কের পাশাপাশি গভীর বিষাদ চেহারায়।

অনতিদূরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন ছেলেটি, কী করবে বা বলবে বুঝতে পারছে না।

নাটকপ্রিয় কৌতূহলী নিষ্ক্রিয় লোকেরা ধীরে ধীরে ভিড় জমাচ্ছে গলির ভেতরে; পায়ে পায়ে কাছে আসছে কেউ কেউ। বৌলিং ক্লাব থেকেও বেরিয়ে আসছে অনেকে, কারও কারও হাতে বিয়ারের বোতল।

বন্ধুর রক্তাক্ত লাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল সুদর্শন ছেলেটা, খামচে ধরল চুল। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর আহাজারি করার মত কণ্ঠে বলছে, 'ও, মাই গড! ও, মাই গড! এটা কী হলো? আমি...আমরা এখন কী জবাব দেব ওর মা-বাবাকে? ও, মাই গড! ওর পাশে থাকা উচিত ছিল আমার। ওকে সাহায্য করা উচিত ছিল। ও, মাই গড! আমি...আমি পালিয়ে যেতে চাইনি। কিন্তু কী করব? জীবনে মারামারি করিনি...'

থতমত খেয়ে গেছে নাটকপ্রিয় জনতা, আবার একইসঙ্গে মজাও পাচ্ছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছেলেটার মেয়েলি আচরণে।

আদর্শ মঞ্চনাটকের মতই আহাজারি শেষ করার পর কান্নায় ভেঙে পড়ল ছেলেটা, সিজদা দেয়ার ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়েছে গলিতে, দু'হাতে আড়াল করেছে মুখ।

গাড়ির দিকে এগোনো উচিত, রেডিয়োতে সাহায্য চাইতে হবে কাছের স্টেশনে; কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও থমকে যেতে হলো

রানাকে--কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সানি। ওর চেহারাটা দেখাচ্ছে পাথর কুঁদে বানানো মূর্তির মত, দু'চোখ থেকে যেন ঠিকরে বের হচ্ছে আগুন।

'আর কতকাল এসব সহ্য করবে তোমরা?' রানাকে আরেক দফা আশ্চর্য করে দিয়ে বজ্রকঠিন গলায় কথাটা জিজ্ঞেস করল সে উপস্থিত জনতা আর পেশিশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা ওই সুদর্শন কিন্তু দুর্বলদেহী ছেলেটাকে। 'আর কতদিন হরিণের পালের মত মেনে নেবে বাঘের আক্রমণ?'

কান্না থেমে গেছে ছেলেটার, ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাচ্ছে।

রানাকে ছাড়িয়ে কয়েক কদম আগে বাড়ল সানি, দেখে মনে হচ্ছে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত শ্রমিকদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে যাচ্ছে তেজস্বী নেতা। 'নিজেদেরকে দেখো তোমরা বিবেকের আয়নায়, তারপর থুতু দাও নিজেদের গায়েই। মাত্র দু'জন গুণ্ডা মিলে মারতে মারতে মেরেই ফেলল বাচ্চা একটা ছেলেকে, অথচ কিছুই করতে পারলে না তোমরা। একদিন তোমাদেরই কেউ ওই মরা ছেলেটার মত খুন হবে একই কায়দায়, সেদিনও কিছু করতে পারবে না তোমরা। আমি জানতে চাই, আর কতদিন মুখ বুজে থাকবে তোমরা? আর কতদিন?'

চড়তে চড়তে সপ্তমে চড়ে গেছে কণ্ঠ, রাগ বাড়তে বাড়তে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে চাঁদিতে--টের পেয়ে নিজেকে সামলে নিল সানি। ঘুরে তাকাল রানার দিকে, তারপর সময় নিয়ে দেখল ভিড় জমানো জনতাকে, ফরসা আর বাদামি মেয়েটাকে, সুদর্শন ছেলেটাকে। মৃত ছেলেটার লাশ দেখল কিছুক্ষণ। হঠাৎ করেই থু করে একদলা থুতু ফেলল গলিতে।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তখন নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রানা।

আঠারো

"বন্দুকধারী শত্রুপক্ষের" একটা টার্গেট লাফিয়ে উঠল হঠাৎ, সঙ্গে সঙ্গে পর পর তিনবার গুলি করা হলো। দুটো বুলেট গিয়ে লাগল টার্গেটের ভাইটাল এরিয়ায়, তিন নম্বর বুলেটটা বিদ্ধ হলো আগের দুটোর চেয়ে ইঞ্চি তিনেক উপরে। পড়ে গেল টার্গেট, দ্রুত গুলি করার জন্য যথেষ্ট পয়েন্ট পেলেও নিখুঁত লক্ষ্যভেদে ব্যর্থতার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ল শুটার লী ডেডরিক।

দু'-তিন সেকেণ্ড পরই লাফিয়ে উঠল আরেকটা টার্গেট, কিন্তু এর পরনে পুলিশের উর্দি, কাজেই গুলি করা যাবে না একে, এবং গুলি করা হলোও না। ট্রিগারে টান দিলেই স্কোর থেকে দশটা নম্বর কাটা যেত লী'র।

আবারও কয়েক মুহূর্তের বিরতি, তারপরই লাফিয়ে উঠল দু'-দুটো টার্গেট—শত্রুপক্ষের দুই লোক। আবারও গর্জে উঠল লী'র পিস্তল, চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত ট্রিগার টেনে গেল সে। কিন্তু দেখা গেল একটা টার্গেট শুয়ে পড়েছে, অন্যটা দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে, "আহত" হয়নি একটুও।

শুটিং শেষ, একটা ব্যারিকেডের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল লী, সার্ভিস রিভলভারের খালি চেম্বার খুলছে ধীরেসুস্থে। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শুটিং রেঞ্জের একটা কোনার দিকে, যেখানে বিশাল ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেতে ওর নামের পাশে স্কোর দেখা যাবে একটু পরই। কল্পনার চোখে দেখল, বিচারকদের পাশে বসা

স্কোরকিপাররা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্যালকুলেটর নিয়ে। ডিসপ্লে'র শুরুতে, ঠিক মাঝখানে, ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে বড় বড় করে লেখা আছেঃ প্র্যাকটিকাল পুলিশ কোর্স--কমব্যাট।

রোববার। পুলিশ অফিসারে গিজগিজ করছে আউটডোর টার্গেট রেঞ্জ। কারও কারও পরনে উর্দি, কিন্তু বেশিরভাগই এসেছে ইনফর্মাল ড্রেসে। পরিবেশ উৎসবমুখর; হওয়াটাই স্বাভাবিক--বার্ষিক এই শুটিং প্রতিযোগিতা এলএপিডি'র অফিসারদের জন্য গৌরব ও আনন্দের। একই সুযোগে ওদের ফ্যামিলি গেট-টুগেদারটাও হয়ে যায়। রেঞ্জের এক বর্গফুট জায়গা খালি নেই যেখানে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে বা বসে নেই--হয় কোনও অফিসার, নইলে তার বউ, অথবা বাচ্চা। সময়টা উপভোগ করছে সবাই, প্রতিযোগীদের তেলেসমাতি দেখছে, ঘুরছে, খাচ্ছে, পান করছে, হেসে হেসে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। বেশিরভাগ আলোচনার বিষয়ঃ কে হবে এবারের চ্যাম্পিয়ন?

লী'র স্কোর দেখা গেল ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেতে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোনে শোনা গেল রেঞ্জমাস্টারের কণ্ঠ, 'আমাদের পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মিস্টার মাসুদ রানা, এলএপিডি'র অনারারি অফিসার। প্রথমবারের মত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন তিনি।'

ফায়ারিং লাইনের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রানা, ঊর্ধ্বাঙ্গের নাইলন উইণ্ডব্রেকারের ওপর আঁটসাঁটভাবে বাঁধা শোল্ডার হোলস্টারে আছে একটা বড়সড় পয়েন্ট ফোর ফোর ম্যাগনাম রিভলভার। ইচ্ছা করেই ওয়ালথারটা নেয়নি ও।

ফায়ারিং লাইনে খাটো কতগুলো দেয়াল আর ব্যারিকেড আছে। এককোনায় নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে একটা বাতিল গাড়ি। লম্বা করে দম নিল রানা।

'ত্রিশবার গুলি চালাতে পারবেন আপনি,' হয়তো রানা নতুন

বলেই ওকে নিয়মটা বাতলে দিচ্ছে রেঞ্জমাস্টার। 'কত দ্রুত আর কত নিখুঁতভাবে হিট করতে পারেন টার্গেটে তার ওপর নির্ভর করবে আপনার স্কোর। ...রেডি?'

দু'পা কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়াল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, 'রেডি।'

'লোড।'

ম্যাগনামটা বের করে অভ্যস্ত ও দ্রুত হাতে লোড করল রানা।

'হোলস্টার।'

পয়েন্ট ফোর ফোরটাকে হোলস্টারে ঢোকাল রানা।

'রেডি অন দ্য লেফট। রেডি অন দ্য রাইট। রেডি অন দ্য ফায়ারিং লাইন?'

'রেডি।'

'গো!'

কথাটা রেঞ্জমাস্টার বলেছে কি বলেনি, রানার বাঁয়ে, প্রায় সত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে গেল দুটো টার্গেট—শত্রুপক্ষ। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল রানা, বিদ্যুৎগতিতে বের করে ফেলেছে ম্যাগনাম, হাতটা মাটির সঙ্গে সমান্তরালে আসার আগেই পর পর দু'বার টান দিল ট্রিগারে, আওয়াজ শুনে মনে হলো গুলি হয়েছে একবার। যেভাবে হঠাৎ উদয় হয়েছিল টার্গেটদুটো, সেভাবে আচমকাই শুয়ে পড়ল।

আরও একবার চরকির মত পাক খেতে হলো রানাকে--এবার ওর ডানদিকে দেখা দিয়েছে একটা টার্গেট। ঘুরবার সময়ই চোখের কোনা দিয়ে দেখেছে রানা, এটা "ভালোমানুষ", তাই বাঁ হাতের তালুটা শুধু অনুভূমিকভাবে রাখল ডান হাতের নীচে, গুলি করল না। মনে মনে এক দুই তিন গুনল, কারণ একটু আগে যখন গুলি করছিল লী তখন খেয়াল করেছে, ঠিক তিন সেকেণ্ডের মাথায়

"ভালোমানুষটার" গা ঘেঁষে দু'দিক দিয়ে উদিত হয়েছে শত্রুপক্ষের দুই টার্গেট।

হলোও তা-ই। এমনভাবে লাফিয়ে উঠেছে টার্গেটদুটো, দেখলে মনে হয় "ভালোমানুষটাকে" জিম্মি করতে চাচ্ছে অথবা জিম্মি করেছে শত্রুপক্ষের দুই লোক। এবার ম্যাগনামের নল ঘুরিয়ে পর পর দু'সেকেণ্ডে দু'বার গুলি করল রানা, শুইয়ে দিল দুই শয়তানকে, জিম্মি হওয়া থেকে বাঁচল "ভালোমানুষটা"।

পজিশন বদল করল রানা, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বামে, অনতিদূরের একটা খাটো দেয়ালের দিকে। লী একটু আগে প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সবগুলো শট নিয়েছে, আর ভুলটা করেছে সেখানেই--টার্গেটগুলোর লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে তাল রেখে পাক খেতে পারেনি সময়মত, গুলি করতে দেরি হয়েছে তাই, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মিসও করেছে কখনও কখনও। একই ভুল করতে চায় না রানা। চারটে বুলেট খরচ হয়েছে চেম্বারের, সে-হিসেবও আছে মাথায়।

দেয়ালের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় ওকে চমকে দিয়ে চোদ্দ-পনেরো ফুট সামনে দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল আরও দু'জন "ভালোমানুষ"। ট্রিগার টানতে গিয়েও শেষমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রানা। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পার হলো দেয়ালটা, র‍্যাপিড ফায়ার করল একবার ডানে, পরেরবার বাঁয়ে—শত্রুপক্ষের দুটো টার্গেট মাথা তুলেছিল ওই দু'জায়গায়। অব্যর্থ নিশানা; রানার গুলি বুকে নিয়ে শুয়ে পড়তে হলো ওই "দু'জনকে"।

বাতিল গাড়িটার উদ্দেশে দৌড় দিল রানা, দৌড়াতে দৌড়াতেই খুলে ফেলল ম্যাগনামের চেম্বার, একটা স্পিডলোডার দিয়ে রিলোড করল। গাড়ির কাছে পৌঁছাতে আর ফুট ছয়েক বাকি আছে, নিজেকে বাড়তি একটু সময় দেয়ার জন্য লাফিয়ে

পার হলো ওই দূরত্বটুকু, পা দুটো মাটি স্পর্শ করামাত্রই আবার শুরু করল র‍্যাপিড ফায়ারিং। রেঞ্জের আলাদা আলাদা ছয় জায়গায় মাথা তুলেছিল ছয় "গুণ্ডা", অবনত হলো ওদের উন্নত শির।

উইণ্ডব্রেকারের পকেট থেকে আরেকটা স্পিডলোডার বের করল রানা, রিলোড করল আবার। সময় দেয়া হচ্ছে ওকে, আসলে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ওর স্নায়ুর ওপর; অনেকেই পাস করতে পারে না এ-পরীক্ষায়—শত্রুপক্ষের কোনও টার্গেটের ঠিক পাশেই যখন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কোনও ভালোমানুষ দাঁড়িয়ে যায়, তখন গুলি চালিয়ে বসে বেচারার ওপর এবং পয়েন্ট হারায়।

রানার বেলায় তা ঘটল না। এবার ভালোমানুষ দাঁড়াল চারজন, শত্রুপক্ষের লোক দু'জন। ম্যাগনামের নল এদিক-ওদিক করে দু'বার গুলি করল রানা, চারবার সংযত করল নিজেকে।

দর্শকরা যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে। এবারের চ্যাম্পিয়নের ব্যাপারে নতুন করে ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে ওদের অনেকের মনেই। ক্যাভিস হ্যারিংটন ছিল গত চারবারের টানা চ্যাম্পিয়ন, এবার সে নেই; ওর জায়গা কি দখল করতে চলেছে বাদামি চামড়ার দীর্ঘদেহী ওই বলিষ্ঠ যুবক?

দিক বদল করল রানা, চলে এল গাড়িটার পেছনে, নিশ্চিত হতে চায় কোনও কেঠো টার্গেটের হঠাৎ দাঁড়ানোর খটাং আওয়াজ শোনা যাবে না ঘাড়ের পেছনদিক থেকে।

এবারের চারটা টার্গেটের চারটেই শত্রুপক্ষের, সবক'টাই উঠে দাঁড়াল রানার ডানে, ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, এবং রানাকে মাত্র এক সেকেণ্ড করে সময় দিয়ে উধাও হয়ে গেল চারটাই। কিন্তু তার আগেই লক্ষ্যভেদ করা হয়ে গেছে রানার, প্রতিটা টার্গেটের ভাইটাল এরিয়ায় একটা করে বুলেট ঢুকিয়েছে ও। র‍্যাপিড

ফায়ারিং শেষ করেই আরেকটা স্পিডলোডার হাতে নিয়েছে।

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল দর্শকদের মধ্যে, হাততালি দিচ্ছে অনেকে। রানার মনোযোগ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে বার বার 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ' বলছে রেঞ্জমাস্টার, কিন্তু কে শোনে কার কথা? একদিক দিয়ে লাভ হলো রানার--দর্শকদের কোলাহল না থামা পর্যন্ত আর কোনও টার্গেট দাঁড়াবে না, সে-সুযোগে লম্বা লম্বা দম নিয়ে নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনল প্রায়, একইসঙ্গে রিলোড করে নিল চতুর্থবারের মত।

স্তিমিত হলো হর্ষধ্বনি, থামল হাততালির আওয়াজ। মাইক্রোফোনে শোনা গেল রেঞ্জমাস্টারের কণ্ঠ, 'মিস্টার রানা, রেঞ্জের ঠিক মাঝখানে, হলুদ রঙ করা দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, প্লিয।'

কথামত কাজ করল রানা।

'হোলস্টার।'

রানার ম্যাগনাম ঢুকে গেল শোল্ডার হোলস্টারে, কী ঘটতে চলেছে জানে ও--র‍্যাপিড ফায়ারিং-এর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা: কুইক ড্র।

'রেডি অন দ্য লেফট? রেডি অন দ্য রাইট?'

'রেডি,' হাঁক ছাড়ল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে রানার ডান দিকে, এক শ' আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে গেল একটা টার্গেট।

খটাং আওয়াজটা শোনামাত্র হোলস্টারে থাবা দিয়েছে রানা, একইসঙ্গে ডান হাঁটু ভাঁজ করে শরীরটা ঘুরিয়েছে বাঁ পায়ের জুতোর সোলে ভর দিয়ে, টার্গেটের দিকে ওর শরীর পুরো ঘুরবার আগেই পর পর দু'বার টান দিয়েছে ম্যাগনামের ট্রিগারে। পুরো ঘটনাটা ঘটতে এক কি বেশি হলে দেড় সেকেণ্ড লাগল। ফলাফল

দেখার অপেক্ষায় থাকল না ও, ডান পা মাটিতে নামিয়ে তাতে ভর দিয়ে বসে পড়েছে, একইসঙ্গে বাঁ পা-টা একটুখানি ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ মোচড় কেটে তাকিয়েছে পেছনে, ম্যাগনামের নল যেদিকে ছিল ঠিক তার উল্টোদিকে মুখ করে আছে এখন। খটাং আওয়াজ তুলে দ্বিতীয় টার্গেটটা যখন দাঁড়াল, আগেই পজিশন নিয়ে থাকায় ঘটনাটাকে স্লো মোশন রিপ্লের মত মনে হলো রানার; অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে পর পর চারবার ট্রিগার টানল ও, আওয়াজ শুনে মনে হলো মাত্র একবার গুলি করেছে।

পুরোপুরি দাঁড়ানোর আগেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল দ্বিতীয় টার্গেট।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা, শেষ স্পিডলোডারটা বের করছে উইণ্ডব্রেকারের পকেট থেকে।

ওকে অবিশ্বাসভরা চোখে কিছুক্ষণ দেখল দর্শকরা, তারপর তুমুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল সবাই, এবার বোধহয় হাততালি দিতে বাকি নেই কেউই।

আস্তে আস্তে হেঁটে ফায়ারিং লাইনের বাইরে চলে আসছে রানা, দর্শকদের অভিনন্দনের জবাবে হাত নাড়ছে মাঝেমধ্যে। কয়েকজন অফিসার ছুটে গেল ওর দিকে, কাঁধ চাপড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ, হাত মেলানোর চেষ্টা করছে কেউ। এখন মোটামুটি নিশ্চিত সবাই, অলৌকিক কোনওকিছু না ঘটলে এবারকার চ্যাম্পিয়ন রানাই।

যারা দৌড়ে গেছে রানার দিকে তাদের মধ্যে লী-ও আছে, খুশিতে সব দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার। রানার কাঁধে বন্ধুত্বসুলভ আলতো ঘুসি মেরে বলল, 'তুমি তো দেখছি আমাদের সবার প্যান্ট খুলে নিলে। বাপের জন্মেও এত নিখুঁত শুটিং-এর কথা শুনিনি, দেখা দূরে থাক।'

'তোমরা যদি ঠিকমত প্যান্ট পরতে না পারো,' রিলোডেড ম্যাগনামটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল রানা, 'কেউ

না কেউ তো সেটা খুলে নেবেই।'

নির্মল হাসি হাসল লী। 'হ্যারিংটন থাকলে ভালো হতো এখন। তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে সেরা, দেখতাম।'

হঠাৎ করেই হ্যারিংটনের প্রসঙ্গ চলে আসায় খুশি খুশি ভাবটা বিদায় নিল রানার চেহারা থেকে। লী'র পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'একটা কথা বলো তো। চার্লিকে নিয়ে টেলিগ্রাফ হিলে ছিলে তুমি। দু'জনে নজর রাখছিলে ক্যাভেনডিশের ওপর, রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ছিলে। ঘটনাস্থলে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল হ্যারিংটনের, এবং গুলি খেয়ে মরল সে। তোমরা দু'জনে কিছুই দেখতে পেলে না, অথচ তোমাদের আগে হাজির হয়ে গেল সানি।' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লী'র দিকে। 'তোমরা আসলেই সেখানেই ছিলে তো?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল লী। 'মা মেরির কসম। তাঁর ছেলে যিশুর কসম। জায়গামতই ছিলাম আমরা। কিন্তু কীভাবে যে কী হয়ে গেল...। যতবার ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার। ...একটা কথা বলি, হেসো না। আমার কী মনে হয়েছে, জানো? আমার মনে হয়েছে, মাটির নীচে ছিল বোধহয় সানি, গুলির আওয়াজ পেয়ে গাছের মত মাথা তুলে দেখতে গিয়েছিল ঘটনা কী। ক্যাভেনডিশের গ্যারেজে হিসি করার জন্যে ঢুকতে দেখেছি আমরা হ্যারিংটনকে, কিন্তু বিশ্বাস করো, সানিকে দেখিনি একটাবারের জন্যও। নিশ্চয়ই জানো, ক্যাভেনডিশের দুই বডিগার্ডের লাশ পাওয়া গেছে ওখানে। আমাদের ধারণা হ্যারিংটনই গুলি করে মেরেছে ওই দু'জনকে। তারপর...'

'তারপর ওকে মারল কে? নিশ্চয়ই নিজের ওপর নিজে গুলি চালায়নি সে? চালিয়ে থাকলে গুলির খোসা কোথায়? ও তো পিস্তল ব্যবহার করত সবসময়--ছিটকে বেরোনো একটা খোসাও কি পাওয়া গেছে আশপাশে কোথাও? ও নিজেও মারা গেছে

রিভলভারের গুলিতে। তাই না?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লী। 'বয়স হয়েছে আমার, কেন যেন আগের মত চট করে বুঝতে পারি না অনেককিছু।'

এমন সময় ডেল কার্সনকে দেখা গেল হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। রানাকে দেখামাত্র হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। একটু ইতস্তত করে হাত মেলাল রানা।

'স্যর,' খুশিতে গদগদ কণ্ঠ কার্সনের, 'আন্তরিক অভিনন্দন আপনাকে। আপনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম আমিই, কিন্তু বিশ্বাস করুন, হেরেও খারাপ লাগছে না আমার। কুইক ড্র-তে অবিশ্বাস্য দক্ষতা দেখিয়েছেন আপনি। এখন আপনাকে হারানোর মত মাত্র একজনই আছে,' ইঙ্গিতে ফায়ারিং লাইনের দিকে দেখাল সে, 'সানি।'

রানার স্কোর লিপিবদ্ধ করা শেষ রেঞ্জমাস্টারের, দরকার না থাকার পরও সেটা মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিল সে উপস্থিত দর্শকদেরকে, তারপর প্রস্তুত হতে বলল সানিকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা, লী আর কার্সন।

আশ্চর্য, ওদের দিকে, আসলে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সানিও ঘাড় ঘুরিয়ে; অদ্ভুত শীতলতা ওর দৃষ্টিতে--হঠাৎ দেখলে মনে হয় ভূতে ধরেছে বুঝি ওকে।

'লোড,' মাইক্রোফোনে বলল রেঞ্জমাস্টার।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে লোড করল সানি।

রানা খেয়াল করল, যতটা কৌতূহলী হওয়া উচিত ছিল, তারচেয়ে বেশি কৌতূহল বোধ করছে ও হঠাৎ করেই।

সানির দৃষ্টির মতই ওর পিস্তলটাও অদ্ভুত--ও-রকম লম্বা টার্গেট ব্যারেল সচরাচর দেখা যায় না কোনও সার্ভিস পিস্তলে।

'হোলস্টার।'

হ্যাণ্ডগানটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সানি, দু'পা কিছুটা ফাঁক

করে আরামে দাঁড়িয়েছে।

'রেডি অন দ্য লেফট। রেডি অন দ্য রাইট। রেডি অন দ্য ফায়ারিং লাইন?'

'রেডি,' হাঁক ছাড়ল সানি।

'গো!'

মাইক্রোফোনে রেঞ্জমাস্টারের কথাটা শোনা গিয়েছে কি যায়নি, সাপের মত ছোবল চালিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সানি, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে গুলি চালাতে শুরু করেছে। আশ্চর্য দক্ষতায় পিস্তলের নল এদিক-ওদিক করে ফায়ার করছে সে, কিছুই হচ্ছে না কোনও "ভালোমানুষের", অথচ ভাইটাল এরিয়ায় একের পর এক "ক্ষত" নিয়ে শুয়ে পড়ছে শত্রুপক্ষের টার্গেটগুলো। চেম্বার খালি হওয়ার পর অভ্যস্ত হাতে এত দ্রুত রিলোড করছে যে, দেখে মনে হচ্ছে কখনও ফুরোয়নি বুলেট। সবচেয়ে বড় কথা, গুলি করার জন্য পজিশন বদল করতে হচ্ছে না ওকে। কুইক ড্র'র পর্বটা যখন এল, দর্শকদের তো বটেই, রানাকেও তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে একবার ডান হাতে পরেরবার বাঁ হাতে গুলি চালিয়ে নিমেষে শুইয়ে দিল শত্রুপক্ষের দুই টার্গেটকে।

'তুমি খুলে নিয়েছিলে প্যান্ট,' হাঁ হয়ে যাওয়া লী বলল রানাকে সানির শুটিং শেষ হওয়ার পর, 'আর ওই ছোকরা দেখি জাঙ্গিয়াটাও রাখল না।'

'ব্যাপার না,' নিচু গলায় বলল রানা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সানির দিকে, 'হয় এ-রকম।'

মনোরঞ্জনের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে দর্শকদের, চিৎকার করে সানিকে অভিনন্দম জানাচ্ছে তারা, যারা বেশি জোরে হাততালি দিচ্ছে তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে হাতের তালু ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়ে এলেও কিছু যায়-আসে না তাদের। খুশিতে মোট

ছিয়ানব্বইটা দাঁত বেরিয়ে গেছে কার্সন, রিডক্স আর হেন্ডনের; বন্ধুকে অভিনন্দন জানাতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা ফায়ারিং এরিয়ার দিকে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী হিসেবে এতক্ষণ ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেতে রানার নাম ছিল সবার উপরে, ওর পাশে সানির নামটা দেখা যাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল হেন্ডন; যুলুদের মত সারা গা দুলিয়ে অদ্ভুত নাচ নাচল কিছুক্ষণ।

ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লের দিকে তাকাল রানা। ওর আর সানির পয়েন্ট একদম সমান।

নিজের বক্স ছেড়ে বেরিয়ে এল রেঞ্জমাস্টার, এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজে নিল রানাকে, প্রায় ছুটে এসে হাজির হলো কাছে। সবগুলো দাঁত দেখিয়ে বলল, 'ছেলেটা তো ধরে ফেলেছে আপনাকে। আপনাদেরকে যুগ্মচ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার আগে আরেকটা সুযোগ দিতে পারি--সে-নিয়ম আছে। বুল'স আই অথবা কমব্যাট--যে-কোনও একটা বেছে নিতে পারেন।'

'কমব্যাট,' শান্ত গলায় বলল রানা, চেহারায় আবেগের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

নিজের বক্সে ফিরে গিয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিল রেঞ্জমাস্টার। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, অভূতপূর্ব এক ঘটনা ঘটেছে আমাদের এবারকার প্রতিযোগিতায়। ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করতে গিয়ে একটা টাই সিচুয়েশনে পড়ে গেছি আমরা। টাইব্রেকিং-এর জন্য একটাই উপায় আছে--আমাদের নেক্সট এবং ফাইনাল ইভেন্ট--শুধু মিস্টার মাসুদ রানা আর মিস্টার সানি ডানহিলের মধ্যে শুট-অফ।'

আবার গলা ফাটাল দর্শকরা, খুশিতে তুমুল শিস দিচ্ছে কেউ, কেউ আবার নখের নীচ দিয়ে রক্ত বের করে ফেলার জোগাড় করেছে হাততালি দিয়ে। বিশ-তিরিশ পিক্সেলের ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল বেরিয়ে এসেছে কারও কারও হাতে, দু'-চারজন

খাপছাড়া করেছে যুম লেন্সের দামি ক্যামেরা। এ-রকম অভূতপূর্ব ঘেরথের ছবি তুলে ফেসবুক বা টুইটারে না দিলে কি চলে?

'ইভেন্টের ধরন হিসেবে কমব্যাট বেছে নিয়েছেন মিস্টার মাসুদ রানা,' মাইক্রোফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিল রেঞ্জমাস্টার। 'এবার টার্গেট তিনটা, গুলি করার সুযোগ ছ'বার। মিস্টার রানা, মিস্টার ডানহিল...আপনাদের মধ্যে কে প্রথমে শুট করতে চান?'

'আমি,' রানা কিছু বলার আগেই চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল সানি। তারপর নিচু গলায়, শুধু বন্ধুদেরকে শুনিয়ে বলল, 'আমার রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই।'

ফায়ারিং লাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা আর সানি, বাকিরা ওদেরকে ছেড়ে পিছিয়ে আসছে।

ঘেমে যাওয়া হাতটা জিন্সের পিছনে বার দুই ডলে মুছল সানি, বেকারীর কর্মচারীর মত খামির বানানোর কায়দায় দু'হাতের আঙুলগুলো মুঠ করল আর খুলল কয়েকবার, শেষে ফায়ারিং লাইনে পৌঁছে আগেরবারের মতই আরাম করে দাঁড়াল।

'মনে রাখবেন,' জানিয়ে দিচ্ছে রেঞ্জমাস্টার, 'এটাও টাইম্‌ড শুটআউট, আর আপনারা বলামাত্র স্টপওয়াচের টাইমিং শুরু হবে। ...আপনি রেডি, স্যর?'

'রেডি,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বলল সানি।

'লোড। মনে রাখবেন, সিক্স শটস, র‍্যাপিড ফায়ার।'

'লোড করাই আছে আমার পিস্তল,' বলল সানি।

'হোলস্টার।'

হেসে ফেলল সানি। 'হোলস্টারে ভরাই আছে।'

'রেডি অন দ্য রাইট। রেডি অন দ্য লেফট। রেডি অন দ্য ফায়ারিং লাইন?'

'স্টার্ট!' শুনে মনে হলো হুঙ্কার ছেড়েছে সানি।

ঠিক আগেরবারের মতই ছোবল হানল সে শোল্ডার হোলস্টারে। দর্শকদের আবারও আশ্চর্য করে দিয়ে শুরু হলো ওর র‍্যাপিড ফায়ারিং। খটাং আওয়াজ করে টপাটপ দাঁড়াল শত্রুপক্ষের দুই টার্গেট, ভাইটাল এরিয়ায় গুলি খেয়ে শুয়েও পড়ল ঝটপট। পরের তিন টার্গেটের তিনটাই ভালোমানুষ, তাই গুলি করল না সানি। এরপর মাত্র দু'সেকেণ্ডের ব্যবধানে দাঁড়াল চারটা "খারাপ লোক," এবং গুলি করে চারজনকেই শুইয়ে দিতে দু'সেকেণ্ডের বেশি লাগল না সানির।

'আউট!' রিভলভার উঁচু করে ধরল সে, জানিয়ে দিল খালি হয়ে গেছে ওর হ্যাণ্ডগানের চেম্বার।

আবারও তুমুল হাততালি দিচ্ছে দর্শকরা, ওদের আশা পূরণ হয়েছে। যুম করে সানির ছবি তুলছে কেউ কেউ। ওদিকে তিন দু'গুণে ছয় আঙুল মুখে ঢুকিয়ে ফুসফুসের সব জোর দিয়ে শিস বাজাচ্ছে কার্সন, রিডক্স আর হেল্ডন, অভিনন্দন জানাচ্ছে ওদের বন্ধুকে।

হাততালি থামল একসময়, শিস থেমেছে তারও আগে। দর্শকদের মৃদু ফিসফাস পরিণত হয়েছে গুঞ্জনে--অনেকেই প্রশ্ন করছে তার পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে: মাসুদ রানা পারবে তো?

'সময় চার দশমিক এক সেকেণ্ড,' স্টপওয়াচ দেখে জানিয়ে দিল রেঞ্জমাস্টার, 'স্কোর পার্ফেক্ট। কাজেই মিস্টার রানাকে যদি জিততে হয়, সবগুলো অ্যাক্চুয়াল টার্গেট হিট করার জন্য সর্বোচ্চ চার সেকেণ্ড সময় পাবেন তিনি।'

সানির চোখে চোখ রেখে দু'পা আগে বাড়ল রানা। হাসি ছেলেটার চোখে। 'গুড লাক, স্যর,' রানার উদ্দেশে বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা, বুঝিয়ে দিতে চাইল কারও শুভ কামনার দরকার নেই ওর।

'রেডি, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল রেঞ্জমাস্টার।

'রেডি।'

'লোড।'

'অলরেডি লোডেড।'

'হোলস্টার।'

'অলরেডি ডান,' কাঁধ দুটো ঢিলে করে দিল রানা, আড়চোখে দেখল আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে সানি।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাল রানা। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। অনেক আগে একবার বলেছিলেন তিনি, 'প্রতিযোগিতার সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর বদলে নিশানায় যদি মনোযোগ দাও, সফল হবেই।'

রানা কি তা পারছে?

'রেডি অন দ্য রাইট,' রেঞ্জমাস্টারের হাঁকে অন্যমনস্কতা কাটল রানার, 'রেডি অন দ্য লেফট। রেডি অন দ্য ফায়ারিং লাইন?'

'স্টার্ট!' চিৎকার করল রানা, বিদ্যুৎগতিতে বের করে ফেলেছে ম্যাগনামটা।

সানি আর কী গুলি করেছে, রানার ফায়ারিং শুনে মনে হলো ছ'বার নয়, মাত্র দু'বার ট্রিগার টেনেছে ও। কোনও কোনও দর্শক ভাবছে আসলে একবারই গুলি করেছে রানা, ম্যাগনামের শেষের দুটো আওয়াজ প্রথম চারটে গুলিবর্ষণের ভারী গর্জনের প্রতিধ্বনি।

পাতলা ধোঁয়া ঘিরে ধরেছিল রানাকে, আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে সেটা। শত শত দর্শকের কারও মুখেই রা নেই। নিজের বক্সে বিমূঢ় হয়ে গেছে রেঞ্জমাস্টার, এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে। সানি আর ওর বন্ধুদের পক্ষ থেকেও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

মুখটা আবারও হাঁ হয়ে গেছে লী'র। নিজেকে সামলাতে কয়েকটা সেকেণ্ড লাগল ওর। তারপর অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে

নিজেকেই যেন বলল সে, 'মিস করেছে! মাসুদ রানা মিস করেছে!'

হ্যাঁ, মিস করেছে রানা। প্রথমে পাঁচটা গুণ্ডা, শেষে মাত্র একটা ভালোমানুষের বোর্ড খাড়া হয়েছিল ওর মুখোমুখি টার্গেট হিসেবে, র‍্যাপিড ফায়ারিং সামাল দিতে পারেনি ও, 'জিততে হলে সময় আছে মাত্র চার সেকেণ্ড,'--কথাটাই হয়তো ষষ্ঠবার ট্রিগার টানতে বাধ্য করেছে ওকে, আর সেটাই কাল হয়েছে ওর জন্য।

'একটা ভালোমানুষ!' গলা ফাটাল কার্সন, খুশিতে লাফাচ্ছে সানিকে জড়িয়ে ধরে, 'একটা ভালোমানুষকে মেরে ফেলেছে লোকটা!'

দর্শকদের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া নেই, ওরা এখনও বুঝতে পারছে না হাততালি দেবে কি দেবে না।

'সময়...মাত্র এক দশমিক আট সেকেণ্ড,' যা বলছে তা ঠিক আছে কি না দেখার জন্য হাতের স্টপওয়াচটার দিকে আরেকবার তাকাল রেঞ্জমাস্টার, তারপর আবার বলতে লাগল, 'অবিশ্বাস্য! মিস্টার মাসুদ রানা, আপনার এই রেকর্ড এই রেঞ্জে কেউ কোনওদিন ভাঙতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু...আমি দুঃখিত...একটা ভালোমানুষকে মেরে ফেলেছেন আপনি, বিফলে গেল আপনার র‍্যাপিড ফায়ারিং। ...লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আমাদের নতুন চ্যাম্পিয়ন, মিস্টার সানি ডানহিল।'

এতক্ষণে হর্ষধ্বনি আর হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা, ছবি তুলবার ধুম পড়ে গেল। সেফটি ব্যারিকেড ডিঙিয়ে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে সানির দিকে--ওর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা সেলফি না তুললেই নয়।

বেশ কিছুক্ষণ পর, "সদ্যোজাত" ভক্তদের কবল থেকে নিজেকে কোনওরকমে উদ্ধার করে রানার কাছে এসে দাঁড়াল সানি।

•

যতটা না বিমর্ষ, তারচেয়ে বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে।
ওর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সানি।
হ্যাণ্ডশেক করল রানা।
'চ্যাম্পিয়নশিপ আসলে ডিযার্ভ করি না আমি, স্যর,' শুনে আন্তরিকই মনে হলো সানির কণ্ঠ। 'নিজেকে সামলানোর সুযোগ পেয়েছিলাম আমি, কিন্তু আপনাকে সে-সুযোগ দেয়া হয়নি। চোখের পলকে পর পর পাঁচবার ট্রিগার টানা যতটা কঠিন, আমি জানি ষষ্ঠবার ট্রিগারে চাপ না দেয়াটা তারচেয়ে বেশি কঠিন।'
'ব্যাপার না,' সানির হাতে আরেকবার ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা। 'ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেছে, এবং তুমি জিতেছ, ব্যস।'
'হ্যাঁ, কিন্তু...'
'এখানে কিন্তুর কিছু নেই। যো জিতা উওহি সিকান্দার।'
'মানে?' রানার বলা হিন্দি কথাটার মানে বুঝতে পারেনি সানি।
'মানে যে জিতল সে-ই বাহাদুর।'
'হ্যাঁ, তা বটে।'
ইঙ্গিতে সানির রিভলভারটা দেখাল রানা। 'একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি?'
'অবশ্যই,' তাড়াহুড়ো করে হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করে দিল সানি, খুশি যেন বেয়ে বেয়ে পড়ছে ওর চোখ-মুখ থেকে; ওর অবস্থা হয়েছে সেই রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের মত, যার কাছে অসিলড়াইয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর তলোয়ারটা একটিবারের জন্য দেখতে চাচ্ছে পরাজিত প্রতিপক্ষ। 'কাস্টম ব্যারেল আর সাইট আছে আমার পিস্তলে।'
হাতে নিয়ে অস্ত্রটার ওজন পরীক্ষা করল রানা। 'দেখতে যতটা না ভারী লাগে, জিনিসটা তারচেয়েও ভারী।'

'হ্যাণ্ডগান যখন ব্যবহার করবেন,' মুনিঋষিরা যে-ঢঙে কথা বলে অনেকটা সেভাবে বলছে সানি--যেন উপদেশ দিচ্ছে রানাকে, 'ভারীটা করাই ভালো। একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে নিশানা ভেদ করা দুধভাত হয়ে যায়। নামিদামি বেসবল খেলোয়াড়রা ভারী ব্যাট ব্যবহার করে, জানেন নিশ্চয়ই?'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এ-রকম কোনওকিছু দেখিনি আগে।'

দাঁত বের করে হাসল সানি। 'আপনি একটু চেষ্টা করে দেখতে চেয়েছিলেন...'

ওর দিকে তাকাল রানা। 'তুমি আবার মাইণ্ড করবে না তো?'

'না, না, মাইণ্ড করার কী আছে?'

রেঞ্জমাস্টার দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই, লোকটার সামনে গেল রানা। কী করতে চায়, সংক্ষেপে বলল। শুনে একটু ইতস্তত করল লোকটা, কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেল।

ফায়ারিং লাইনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

এবার কোনও কমব্যাট হবে না, বুল'স আই, মানে টার্গেট প্র্যাকটিস হবে। গুলি খাওয়ার জন্য "বুক চিতিয়ে" দাঁড়িয়ে আছে এক "গুণ্ডা"।

নতুন অস্ত্র, তাই একটু সময় নিয়েই পর পর ছ'বার গুলি করল রানা।

প্রথম বুলেটটা ভাইটাল এরিয়া দূরে থাক, বোর্ডে বানিয়ে রাখা গুণ্ডার-শরীরের কাছ দিয়েও গেল না, বরং গিয়ে ঢুকল বোর্ডটাকে সাপোর্ট দিয়ে রাখা নরম কাঠের ফ্রেমে। কিন্তু পরের পাঁচটা বুলেট সুন্দর একটা বৃত্ত তৈরি করল গুণ্ডার ভাইটাল এরিয়ায়।

ফল দেখে নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হলো রানা, মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বড় করে। উপরের ঠোঁট ঘেমে গেছে, বাঁ হাত দিয়ে মুছল সে-জায়গা। সানির কাছে অস্ত্রটা ফিরিয়ে দিতে দিতে

বলল, 'তবুও পারলাম না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো প্রথম বুলেট।'

'ব্যাপার না,' সদ্য এ-বি-সি-ডি লিখতে শেখা বাচ্চা ভুল করলে বাবা যেভাবে সান্ত্বনা দেয় সেভাবে বলল সানি, 'এটা যখন প্রথম প্রথম ব্যবহার করতে শুরু করি তখন কত যে মিস করেছি!' রিভলভারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে ঘুরল সানি, বন্ধুদের নিয়ে চলে যাচ্ছে, শ্যাম্পেনের বোতল খুলে ফুর্তিফার্তি করবে এখন।

কিছুক্ষণ পর চ্যাম্পিয়নের পুরস্কারটা নেবে সে এলএপিডি'র প্রেসিডেন্টের হাত থেকে।

রাত গভীর হয়েছে।

খাঁ খাঁ করছে এলএপিডি'র আউটডোর টার্গেট রেঞ্জ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেফটি ব্যারিকেড টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। ওর হাতের জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইটটাকে উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল কোনওটাই বলা যাবে না।

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো টার্গেট পরীক্ষা করল ও ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়, শেষপর্যন্ত এসে দাঁড়াল যেটা খুঁজছিল সেটার সামনে। এই টার্গেটের ভাইটাল এরিয়ায় পাঁচ বুলেটের সেই বৃত্ত আছে।

ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে পকেট থেকে সুইস আর্মি নাইফ বের করল রানা, ছুরির ভাঁজ খুলল। সাপোর্টিং কাঠের ফ্রেমে ঢুকে-আটকে আছে সানির রিভলভারের প্রথম বুলেট, খুব সাবধানে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেটা বের করে আনল ও, খেয়াল রাখল বিচ্ছিরি কোনও আঁচড় যাতে না পড়ে সেটার গায়ে।

চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া বুলেটটা বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে চেপে ধরে দেখল কিছুক্ষণ রানা, তারপর ঢুকিয়ে রাখল প্যান্টের পকেটে। সুইস আর্মি নাইফটা ভাঁজ করে ঢোকাল আরেক পকেটে। সবশেষে ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে নেভাল, ফিরতি পথ

ধরল দ্রুত পায়ে।

আশা করছে, মিটিমিটি তারার আলোয় পার্কিংলট পর্যন্ত যেতে অসুবিধা হবে না ওর।

উনিশ

অনেক দেরি হয়ে গেছে, তারপরও সোজা ব্যালিস্টিক ল্যাবে চলে এল রানা আউটডোর টার্গেট রেঞ্জ থেকে। ওকে আজ রাতেও নজরদারির কাজ দিয়েছে হেইডন, সে-দায়িত্ব পালন করতে খুব একটা তাড়া অনুভব করছে না ও। 'আমার একটা কাজ আছে, আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হবে,' বলে শায়লাকে পুলিশ ক্যাফেটেরিয়াতে বসিয়ে রেখে উপরে এসেছে।

'কী কাজ?' জানতে চেয়েছিল শায়লা।

'ব্যালিস্টিক ল্যাবে যাচ্ছি। একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'মাসুদ ভাই, মিস্টার হেইডন জানতে পারলে কিন্তু খুব ঝামেলা করবে।'

'ঝামেলা সে জানতে না পারলেও করবে। কাজেই ওর কথা বলে লাভ নেই।'

'কী পরীক্ষা, বলা যাবে?'

'এখনই না। আমার ধারণাটা ঠিক কি না, আগে জেনে নিই।'

বন্ধ হয়ে গেছে ব্যালিস্টিক ল্যাব, কেউ নেই। দরজার পাল্লায় ধাক্কা দিল রানা। রাতের নিস্তব্ধতায় মৃদু ক্যাঁচকোঁচ

আওয়াজ করে জানিয়ে দিল কব্জা; মরচে ধরেছে ওগুলোর গায়ে।

সুইচবোর্ডটা খুঁজে নিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দিল রানা, সোজা চলে এল মাইক্রোস্কোপের কাছে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখল টার্গেট রেঞ্জ থেকে পাওয়া বুলেটটা। ক্যাভিস হ্যারিংটনের শরীর থেকে যে-বুলেটগুলো পাওয়া গেছে, একটা কেবিনেটে আলাদা একটা ট্রে-তে সেগুলো রেখে গেছে মর্টিশিয়ান; ট্রে-টা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না ওর। সেটা থেকে বেছে বেছে একটা বুলেট নিল, আবার গিয়ে দাঁড়াল মাইক্রোস্কোপের সামনে। যত সময় নিয়ে দেখেছিল আগের বুলেটটা, তারচেয়েও বেশি সময় নিয়ে দেখল এবারেরটা। তারপর মাইক্রোস্কোপের স্টেজের ওপর বুলেটদুটো পাশাপাশি রেখে কোর্স ফোকাস আর ফাইন ফোকাস বার বার অ্যাডজাস্ট করে প্রথম বুলেটের সঙ্গে মেলাল দ্বিতীয়টা। কাছেই লম্বা একটা টেবিলের ওপর রাখা আছে ল্যাব টেকনিশিয়ানের অফিশিয়াল ল্যাপটপ, লগ-ইন আই.ডি. আর পাসওয়ার্ড জানা আছে রানার, চালু করল সেটা। হাই স্পিড ব্রডব্যাণ্ড ইন্টারনেট কানেকশন দেয়া আছে ল্যাপটপ্টাতে, গুগলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করল ও। তারপর নোটপ্যাড চালু করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েণ্ট টাইপ করে সেইভ করে রাখল ডকুমেন্টটা। এরপর ধীর পায়ে ফিরে গেল মাইক্রোস্কোপের কাছে, আরও একবার চোখ রাখল আইপিস লেন্সে, স্টেজের ওপর পাশাপাশি রাখা বুলেটদুটো দেখল সময় নিয়ে।

কাজ শেষে আগের চেয়েও ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে বসে পড়ল অনতিদূরের একটা টুলে, ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে।

ক্যাভিস হ্যারিংটনের শরীর থেকে পাওয়া বুলেটের সঙ্গে পার্ফেক্ট ম্যাচ করেছে টার্গেট রেঞ্জ থেকে আনা সানির স্মিথ অ্যাণ্ড

ওয়েসনের বুলেট।

ওভাবে কতক্ষণ বসে ছিল রানা বলতে পারবে না নিজেও, ল্যাবের দরজাটা আরেকবার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করায় কিছুটা চমকে উঠে তাকাল সেদিকে। ভেতরে ঢুকছে শায়লা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উদ্বেগও আছে।

'আপনি বলেছিলেন পাঁচ মিনিট,' চাপা গলায় বলছে মেয়েটা, যেন কেউ শুনে ফেললে মহা অপরাধ হবে, 'অথচ আধঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে।'

'তা-ই?' উঠে দাঁড়াল রানা। টার্গেট রেঞ্জের বুলেটটা ঢোকাল পকেটে, ট্রে'র বুলেট ট্রে-তে ফেলে সেটা নিয়ে রাখল আগের জায়গায়।

'ঈশ্বর!' তাকিয়ে তাকিয়ে রানার কাজ দেখছে শায়লা, দৃষ্টিতে প্রশ্ন আর উদ্বেগ দুটোই বেড়েছে। 'ঘটনা কী, দয়া করে বলবেন?'

'আমি রেডি,' জবাব না দিয়ে বলল রানা। 'ক'টা বাজে?'

'বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।'

'বারোটা?' চোখ পিটপিট করল রানা। 'তা হলে তো আজ রাতের মত আমাদের নজরদারির কাজ শেষ। যার যার বাসায় ফিরে যেতে পারি আমরা, না?'

'মাসুদ ভাই...কী বলছেন এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। মিস্টার হেইডন যদি জানতে পারেন নজরদারির কাজে যাইনি আমরা, বারোটা বাজিয়ে ছাড়বেন আমাদের দু'জনেরই।'

হাই তুলল রানা। 'ফালতু কাজে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।'

অস্থিরতা দেখা দিল শায়লার চেহারায়। 'কাজটা আপনার কাছে ফালতু হতে পারে, কিন্তু লেফটেন্যান্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথামতই তো চলতে হবে আমাদের, নাকি?'

'ও আমাদের বস নয়, শায়লা। আমরা এখানে এসেছি অন্য

কাজে, ওর কথামত চললে আমাদের আসল কাজ গুবলেট হয়ে যাবে। হেইডনের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ, আমার কাছে তা গুরুত্বহীন। আমার কী ধারণা, জানো? আমার ধারণা, খুঁটির জোরে এবং ওপর লেভেলে তোয়াজ-তদবির করে এতদূর আসতে পেরেছে লোকটা। তা না হলে ওর মত একটা মাথামোটা লোকের এই পদে থাকার কথা না।'

'মাসুদ ভাই...আপনি কি কোনও লিড পেয়েছেন?'

'মনে হয়।'

'কী?'

আবারও হাই তুলল রানা। 'শায়লা, অল্পবিদ্যা যেমন ভয়ঙ্করী, অতিবিদ্যাও তা-ই। ভয়ঙ্কর কিছু জানার চেয়ে, না জানাটাই কি ভালো না?'

আহত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে শায়লা, হতবাক হয়ে গেছে।

'চলো বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই তোমাকে,' বলল রানা। 'কাল সকাল ঠিক আটটায় চলে এসো এখানে।'

শায়লাকে ওর বাসায় নামিয়ে দিয়ে আবার পুলিশ বিল্ডিং-এ ফিরে এল রানা। উর্দিপরা পাহারাদারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পাত্তা না দিয়ে দ্বিতীয় দফায় ঢুকে পড়ল ভেতরে, সোজা চলে এল লিফটের কাছে। যত রাতই হোক লিফট চালু থাকে এখানে, তাই ছ'তলায় হাজির হতে সময় লাগল না ওর।

ছ'তলা মানে ডকুমেন্ট আর রেকর্ড সেকশন। অফিসারদের পার্সোনাল ফাইল থেকে শুরু করে এলএপিডি'র খরচাপাতির যাবতীয় হিসাব আছে এখানে, আছে সবরকমের কেসের খুঁটিনাটি তথ্য-উপাত্ত। হার্ডকপি, সফটকপি--তদন্তকারী অফিসারদের যার যেটা চাই সে সেটাই নিতে পারবে, নিখরচায়।

সফটকপি সেকশনে ঢুকল না রানা, এখানকার কম্পিউটারগুলোর আই.ডি.-পাসওয়ার্ড জানা নেই ওর। বরং চলে এল হার্ডকপির এলাকায়। সুইচবোর্ড খুঁজে নিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দিল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

সারি সারি স্টীল কেবিনেট দেখা যাচ্ছে। কোন্ কেবিনেটের ভেতরে কী আছে তা, কম্পিউটারে বড় হাতের অক্ষরে লিখে প্রিন্টআউট নিয়ে কাগজটা সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে কেবিনেটের মাথায়। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে আর লেখাগুলো পড়ছে রানা। যে-কেবিনেটটা খুঁজছিল সেটা ওর চোখে পড়তে সময় লাগল না।

পার্সোনাল ফাইলস: ট্রাফিক পুলিশ অফিসার্স (জয়েনিং ডেট...)

তারিখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল আনমনে।

চারটে ড্রয়ার আছে কেবিনেটটাতে, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী এ থেকে এফ, জি থেকে এল, এম থেকে আর, এবং এস থেকে যেড পর্যন্ত নামের ফাইল রাখা আছে একেকটা ড্রয়ারে। কোন্ ড্রয়ারে কোন্ ফাইলটা পাওয়া যাবে, তা-ও লেখা আছে।

অ্যালফাবেটিকালি চারটে ফাইল বের করল রানা:

সি দিয়ে কার্সন, ডেলমার; অর্থাৎ ডেল কার্সন।

ডি দিয়ে ডানহিল, সানি।

এইচ দিয়ে হেন্ডন, জর্জ।

এবং আর দিয়ে রিডক্স, জনাথন।

ওগুলো নিয়ে একদিকের দেয়াল ঘেঁষে বসানো ছোট একটা রিডিংটেবিলে চলে এল রানা, মাথার উপরের শক্তিশালী ঝোলানো-বাতিটা জ্বালিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

কী মনে করে প্রথমে জর্জ হেন্ডনের ফাইলটা টেনে নিয়ে

পড়তে শুরু করল।

হেল্ডনের বয়স তেইশ। ঘন বাদামি চুলের কারণে বন্ধুমহলে ব্রাউনি নামে পরিচিত সে। জন্মস্থান হিউস্টন, বড়ও হয়েছে সেখানে। ছাত্র হিসেবে মাঝারি মানের--হাইস্কুলের রেকর্ড ভালোও না, আবার খারাপও না। স্কুলের বাস্কেটবল দলের সদস্য ছিল, ডিফেন্সে খেলত। ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দু'বছর পড়াশোনা করেছে। হুট করেই ঢুকে পড়ে সেনাবাহিনীতে। আরব-বসন্ত চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যসঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে স্পেশাল ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় হোয়াইট হাউস থেকে (যে-ফোর্সের কাজ ছিল, রানা জানে, মধ্যপ্রাচ্যের আমেরিকাবিরোধী বড় বড় নেতাদের হত্যা করা, অথবা তাঁরা কোনও কারণে নিহত হলে উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেয়া), এবং সে-ফোর্সে যোগদান করার আদেশ দেয়া হয় হেল্ডনকে। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক ফোর্সটা যায়নি অথবা যেতে পারেনি মধ্যপ্রাচ্যে, আর ততদিনে সেনাবাহিনীর ওপর থেকে মনও উঠে গেছে হেল্ডনের, তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে আসে সে। মেরিন হাইওয়ে নামের একটা রোড-কন্সট্রাকশন কোম্পানি তখন সৈকতের ধারের কয়েকটা রাস্তা মেরামতির কাজ করছে, কাজ জুটিয়ে নেয় সেখানে।

ওই সময়ে লোক লাগবে এলএপিডি'র ট্রাফিক সেকশনে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করে হেল্ডন। "কেন তুমি পুলিশ হতে চাও,"--প্রশ্নটার উত্তর স্বহস্তে লিখে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দেয়ার শর্ত ছিল, শর্তটা পূরণ করেছে সে, এবং ওর সেই জবাব ফাইলেই আছে।

কাগজটা হাতে নিল রানা।

"স্পেশাল ফোর্সের একজন রেঞ্জার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য মনোনীত হয়েছিলাম আমি, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক প্রমাণ

দিতে পারিনি নিজের যোগ্যতার; আমার মনে হয় যদি পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই তা হলে ওই মনোনয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এখন রাশা, চীন বা উত্তর কোরিয়া আমাদের জন্য বড় হুমকি নয়। আমাদের বড় হুমকি আমরাই--অন্ধকার সবসময় প্রদীপের নীচেই থাকে। নাশকতামূলক কত জঘন্য কাজ হররোজ সংঘটিত হচ্ছে এ-দেশের জায়গায় জায়গায়, আমরা কি পারছি সেসব দমন করতে? আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার দিকে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা কি ভেবে দেখেছি, অন্তর্ঘাতমূলক ওই সব কাজ কতটা পিছিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে? রাজনৈতিক আমূল সংস্কারের প্রতি ঢালাও কোনও ইঙ্গিত করছি না আমি, বরং বলতে চাই সেসব অপরাধীর কথা যাদের কারণে বিপন্ন হচ্ছে এদেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে না খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ, তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে আইনশৃঙ্খলার সুনাম। অথচ তারপরও দেশের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সবাই সাফাই গাইছে অপরাধীদের পক্ষেই; তাই ওরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, ওদের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস নেই আমজনতার। নিজের কাছে, দেশের বিবেকবান প্রতিনিধিদের কাছে আমার প্রশ্ন, আর কত দীর্ঘায়িত হবে এই অসুস্থ পরিবেশ? আমার পরবর্তী প্রজন্ম যাতে প্রশ্নটা না করতে পারে আমাকে, সেজন্যই একজন সৎ ও দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার হতে চাই আমি।”

হেন্ডনের বক্তব্যটা পর পর চারবার পড়ার পর কাগজটা রেখে দিল রানা, হেলান দিল চেয়ারে।

কিছু একটা আছে হেন্ডনের কথায়। এমন কিছু, যা খানিকটা হলেও বিরক্তি জাগিয়ে তুলছে রানার মনে। সেটা কী, কিছুক্ষণ চিন্তা করল ও, কিন্তু বের করতে পারল না। কোনও ক্লু পাওয়া

যায় কি না ভেবে নজর দিল হেন্ডনের সার্ভিস রেকর্ডের ওপর।

নাহ্, খুঁত বের করার মত কিছুই নেই। চমৎকার রেকর্ড ওর, পুলিশের চাকরির জন্য ওকে "অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন" বলা হয়েছে।

মনে হচ্ছে সবাই পছন্দ করে ব্রাউনিকে, বিশেষ করে ওর সুপিরিয়ররা। তাঁদের সবার মন্তব্য জোড়া লাগালে জর্জ হেন্ডন সম্বন্ধে যে-কথাটা পাওয়া যায় তা হলোঃ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন আজ্ঞাবাহী একজন সৈনিক সে, নাজুক অ্যাসাইনমেন্টগুলোও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনে যার পারদর্শিতা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

হেন্ডনের ফাইলটা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখল রানা, টেনে নিল সাতাশ বছর বয়সী জনাথন রিডক্সকে।

জীবিকা হিসেবে পুলিশের চাকরি কেন বেছে নিয়েছে সে, সে-ব্যাপারে কোনওকিছু পাওয়া গেল না ফাইলে। আশ্চর্যের বিষয়, রিডক্সও সেনাবাহিনীতে ছিল একসময়, এমনকী স্পেশাল ফোর্সেও ছিল।

সে বড় হয়েছে মিশিগানের রাজধানী ল্যানসিং-এ, অখ্যাত এক হাইস্কুলে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হয় মিশিগান স্টেট কলেজে। খেলাধুলার প্রতি ভীষণ ঝোঁক। কলেজের আমেরিকান-ফুটবল দলের কোয়ার্টার ব্যাক। আহামরি কোনও খেলোয়াড় না, তবে নিয়মিত খেলত বলে ধরে নেয়া যায় ওর ওপর আস্থা ছিল কোচের। কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে শেষ ম্যাচটা খেলতে গিয়ে ডান হাঁটুতে মারাত্মক চোট পায়, শেষ হয়ে যায় ওর খেলোয়াড়ি জীবন, একইসঙ্গে শেষ হয়ে যায় ওর পেশাদার ফুটবল লিগে খেলার উচ্চাশা। একে তো শারীরিক দুরবস্থা, তার ওপর হতাশা--কলেজের ফাইনাল পরীক্ষায় ওর রেযাল্ট খারাপ হয়। যার নাই কোনও গতি, সে করে ওকালতি--প্রচলিত কথাটা আরেকবার সত্যি প্রমাণ করতে গিয়ে ভর্তি হয়ে যায় মামুলি এক

ল কলেজে। কিন্তু দুই সেমিস্টার যেতে না যেতেই নাম প্রত্যাহার করে নেয় নিজের, এবং নামটা লেখায় সেনাবাহিনীর খাতায়।

এখানেও ওর নামের বিপরীতে আহামরি কোনও রেকর্ড নেই, আবার বাজে কোনও রেকর্ডও নেই। ওর সুপিরিয়ররা ওকে কখনও কখনও "অনন্যসাধারণ", "সাহসী" ইত্যাদি বলেছেন।

তবে একটা ব্যাপার, নিজের গড়পড়তা রেকর্ডের কারণে স্পেশাল ফোর্সে ডাক পায়নি রিডক্স, বরং যেন ডাকা হয় ওকে সেজন্য আবেদন করেছিল। ওর সে-আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল।

'হেল্ডনও স্পেশাল ফোর্সে ছিল,' বিড়বিড় করে বলল রানা, 'রিডক্সও ছিল। দুই মাস্কেটিয়ার।'

রিডক্সের ফাইলে পাওয়া একটা ডকুমেন্ট থেকে জানা গেল, সে, কার্সন আর হেল্ডন একসময় আর্মি ইন্টেলিজেন্সের একটা ইউনিটের হয়ে কাজ করেছে। ওদের প্রধান দায়িত্ব ছিল, ওদের ব্যাটেলিয়নের যেসব সৈনিক মারিজুয়ানা সেবন করত তাদের নামে গোপন রিপোর্ট করা।

'মারিজুয়ানা?' আবারও বিড়বিড় করল রানা। 'ইন্টারেস্টিং।'

একই ফাইলে পাওয়া গেল একটা রিপোর্ট, যেটা তৈরি করেছে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জনৈক পার্সোনেল ইন্টারভিউয়ার। রিপোর্টটার একজায়গায় ওই ইন্টারভিউয়ার লিখেছে: "মিস্টার রিডক্স মনে করেন, সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে তিনি কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক আর স্যাবটারের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বানচালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।"

ওই একই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, "এই যুবকের ভেতরে এমন কিছু একটা আছে, যার কারণে ওঁকে একজন ভালো পুলিশ অফিসার না বলে উপায় নেই। তাঁকে সুশিক্ষিত বলার চেয়ে স্বশিক্ষিত বলাই ভালো। হাল সময়ের সমাজব্যবস্থা নিয়ে, তরুণ-তরুণীদের বিপথগামিতা নিয়ে তিনি কিছুটা হলেও হতাশ।

পর্যবেক্ষণের সময় দেখা গেছে, যখনই তিনি হতাশ হয়েছেন, ভাগ্যগুণে হোক অথবা বুদ্ধিমত্তার জোরে, কোনও না কোনও অভূতপূর্ব উপায় বের করে সে-হতাশা কাটিয়ে উঠেছেন। এবং সম্ভবত এ-গুণের কারণেই তিনি বিশ্বাস করেন, ঘুণে ধরা সমাজটাকে বদলানোর মত কিছু না কিছু করার ক্ষমতা আছে তাঁর। সোজাকথায়, মুখে স্বীকার না করলেও নিজেকে একজন সমাজসংস্কারক ভাবেন তিনি। আর এই সংস্কারের কাজে তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, তাঁরই বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর পুলিশ অফিসারের উর্দি।"

থম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা। তারপর রিডক্সের পি.সি.আর. অর্থাৎ পার্সোনাল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টটা নিল। হিসেবটা আগের মতই--চাকরিজীবনে কোনও খারাপ রেকর্ড নেই, আবার আহামরি কিছুও করেনি সে। সুপিরিয়রদের কেউই ওর ওপর অসন্তুষ্ট নন; সবার দৃষ্টিতে ওর আচরণ ভালো, ওর দক্ষতা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে একজায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেল রানার হাত। বেশ্যার দালাল রাফির ফটোগ্রাফ দেখা যাচ্ছে, পাঞ্চ করে রাখা আছে। সঙ্গের এক তা কাগজটাতে লোকটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কীভাবে সে মারা গেল তার বর্ণনা আছে। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, রাফির লাশ সবার আগে দেখতে পেয়েছে রিডক্স, রিপোর্টও করেছে সে-ই।

ফাইলটা বন্ধ করল রানা, টেনে নিল পরেরটা: ডেল কার্সন।

এর বয়স পঁচিশ, টেক্সাসের ছেলে। স্কাউটিং-এর সঙ্গে জড়িত ছিল স্কুলজীবন থেকে, পরে ভর্তি হয় সেনাবাহিনী-পরিচালিত একটা কলেজে। গ্র্যাজুয়েশনের জন্য চলে আসে লুইযিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে,লিবারেল আর্টসের ওপর ডিগ্রি নেয়। ছাত্র হিসেবে মাঝারি মানের। টেক্সাসের অখ্যাত এক শহরের মেয়র

ছিলেন ওর বাবা, কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চালাননি, কারণ একটা অফশোর অয়েল রিগিং কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরি পেয়ে যান। সামাজিক এবং গির্জা-বিষয়ক কাজকর্মে খুব সক্রিয় ছিলেন ওর মা। কার্সন নিজেও ক্যাথোলিক গোঁড়ামিতে বিশ্বাসী। ওর সেই গোঁড়ামি মাঝেমধ্যে এত বেড়ে যায় যে, সাইকিয়াট্রিক কাউন্সেলিং-এর দরকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ছিল, তখন একবার এ-রকম একটা ঘটনা ঘটে। বিদেশি কোটায় ভর্তি হয়েছিল এক সুন্দরী নরওয়েজিয়ান মেয়ে. ওর প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করে কার্সন, মেয়েটাও সাড়া দেয়, এবং প্রথম ডেটিং-এই যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হয় দু'জনের মধ্যে। তখন ভীষণ অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করে কার্সন, সম্পর্ক ছিন্ন করে মেয়েটার সঙ্গে, তারপর সোজা গিয়ে হাজির হয় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে।

গ্র্যাজুয়েশন করে বেরোনোর পর কোথাও চাকরি না পেয়ে হতাশায় ভুগছিল সে। সেলসম্যানের চাকরি পছন্দ না ওর, কারণ সে-চাকরিতে প্রচুর মিথ্যা বলতে হয়, আর ক্যাথোলিক মতবাদ কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা সমর্থন করে না। পছন্দ না ক্ল্যারিকাল জবও, কারণ এতে, কার্সনের বিশ্বাস, যে-কারোরই উদ্ভাবনী সত্তার মৃত্যু ঘটে। এদিকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা রকেট সায়েন্টিস্ট হিসেবে যে কাজ করবে, সে-উপায়ও নেই। কাজেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে ট্রাফিক পুলিশের চাকরির জন্য আবেদন করে এবং লিখিত ও মৌখিক দুই পরীক্ষাতেই ভালো নম্বর পায়। তারপর...

দু'-তিনটা পাতা উল্টাল রানা। কার্সন কেন কীভাবে ঢুকল পুলিশের চাকরিতে, সে-ইতিহাসে উৎসাহ বোধ করছে না।

কার্সনের চাকরির রেকর্ড, রিডক্স বা হেল্ডনের মত নিখুঁত না। চাকরিতে ঢোকার পর পরই, বরাবরের মত, ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয় ওর, অন্য আরও অনেকের সঙ্গে। একরাতে সম্পূর্ণ

মাতাল অবস্থায় ডজনখানেক অফিসার ধরা পড়ে সুপিরিয়রদের হাতে, তাদের মধ্যে কার্সনও ছিল। শাস্তি হিসেবে ওদের প্রত্যেকের প্রবেশন পিরিয়ড ছ'মাস করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে-সময় অসুস্থতার অজুহাতে দু'দিন ছুটি কাটায় কার্সন; ধারণা করা হয় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিল সে, মদ্যপানের কারণে অপরাধবোধে জর্জরিত থাকার কারণে।

তবে এমনিতে ওর ব্যাপারে প্রশংসাবাণীর অভাব দেখা যাচ্ছে না। হাসিখুশি দিলদরিয়া যুবক, সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে, ওকে কোনও দায়িত্ব দেয়া হলে সেটা সুষ্ঠুভাবে শেষ না করার আগে থামে না, কখনও কখনও আগ বাড়িয়ে এসে অন্যের কাজ তুলে নেয় নিজের কাঁধে।

অন্য একটা পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, কখনও কখনও মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না কার্সন, তখন যা-তা ব্যবহার করে সহকর্মীদের সঙ্গে, এমনকী সুপিরিয়রদেরও ছেড়ে কথা বলে না। এবং যখনই সেই অপরাধবোধে জর্জরিত হয়, সিক লিভের দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয়।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা নিউযপেপার ক্লিপিংস পাওয়া গেল--সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে একটা প্রবন্ধ, লেখক কার্সন নিজে। মনোযোগ দিয়ে ক্লিপিংটা পড়ল রানা, যে-জায়গাগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো সেগুলোর ওপর চোখ বুলাল দু'বার করে:

"...আমাদের এই সমাজটা আসলে একটা জেলখানার মত। সামাজিক দায়বদ্ধতার কাছে নতি স্বীকার করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে বাস করে যাচ্ছি আমরা, ঠিক যেভাবে আইনের হাতকড়া হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে কয়েদখানায় গিয়ে ঢোকে অপরাধীরা। আমার এই অনুভূতির কারণ, সমাজে মন খুলে বাঁচার উপায় নেই। এখানে আইনের শাসন আছে, ধর্মের

চোখ রাঙানি আছে। অথচ কী অদ্ভুত, যে-আইন শাসন করে, সে-আইনই আবার পালানোর পথ করে দেয় অপরাধীদের। যে-ধর্ম চোখ রাঙায়, সে-ধর্মের গুরুরাই এমন সব পাপ আর অন্যায় করে, যা দেখলে ভক্তিশ্রদ্ধা উঠে যায় ধর্মের ওপর থেকে...”

“...আমি জানতে চাই, কেন এমন হবে? কেন আমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নামে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করব, যার ফলে একটার পর একটা খুন করার পরও, একের পর এক মেয়েকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহব্যবসায় বাধ্য করানোর পরও, পাশের বাড়ির ছেলেটার কাছে মাদক বেচে সে-টাকায় নিজের ছেলের লেখাপড়া করানোর পরও একটা অপরাধীর কিছুই হবে না, অথচ তার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অনেক পরিবার, ভবিষ্যৎ বলে কিছুই থাকবে না অনেকগুলো মানুষের...”

“...উপযুক্ত সময় বার বার আসে না, বরং একবারই আসে। এখন যে-সময় যাচ্ছে আমাদের, যে-ক্রান্তিকাল পার করছি আমরা, সমাজ সংস্কারের এখনই সুযোগ। প্রথমেই ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের বিচারব্যবস্থাটাকে। আরও লম্বা করতে হবে আইনের হাত, আরও কঠোর হতে হবে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে। নিশ্চিত করতে হবে, খুন করে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কেউ যেন রায় ঘোষণার পর হাতের দু'আঙুল উঁচু করে ভি চিহ্ন দেখাতে দেখাতে আদালত ছাড়তে না পারে...”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইলটা বন্ধ করল রানা, হেলান দিল চেয়ারে।

কমন কতগুলো বিষয় আছে হেল্ডন, রিডক্স আর কার্সনের ফাইলে। যেমন তিনজনের কারোরই পুলিশে, বিশেষ করে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করার ইচ্ছা ছিল না। দু'জন এসেছে আর্মির স্পেশাল ফোর্সে ইস্তফাপত্র দিয়ে, আরেকজন অন্য কোনও চাকরি পাচ্ছিল না বলে এখানে যোগ দিয়েছে। তিনজনই প্রত্যক্ষ-

পরোক্ষভাবে বিশ্বাস করে সমাজটা ঘুণে ধরা, এবং এ-সমাজের আমূল সংস্কারের এখনই সময়।

পিঠ খাড়া করল রানা, টেনে নিল চার নম্বর, মানে সানির ফাইলটা।

আশ্চর্য, অন্য ফাইলগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এ-ফাইলকে তালপাতার সেপাই না বলে উপায় নেই, কারণ ভেতরে কাগজের সংখ্যা খুবই কম। সানি বড় হয়েছে মিশিগানের এক এতিমখানায়, ওর বাপ-মা ঠিক কবে কীভাবে মরেছে সে-ব্যাপারে কোনও বর্ণনা পাওয়া গেল না কোথাও। আঠারোতে পা দিতে না দিতেই সেনাবাহিনীতে নাম লেখায় সে, চাকরি ছাড়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে। তখন সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে বিশেষ দায়িত্বে ছিল সে; কুর্দি যোদ্ধাদের একটা দলের হামলায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওদের কনভয়, মরতে মরতে বেঁচে যায় সানি।

তিক্ত অভিজ্ঞতাটা হয়তো অসহনীয় বোঝা হয়ে চেপে বসেছিল ওর মনে, তাই ইস্তফাপত্র দিয়ে সোজা দেশে ফিরে আসে, উপযুক্ত কোনও চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে এ-শহর থেকে ও-শহরে। লস অ্যাঞ্জেলেসে হাজির হয়ে দেখে, লোক চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে এলএপিডি'র পক্ষ থেকে। সেনাবাহিনীতে আট বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে আবেদনপত্র জমা দেয় তখন, উপযুক্ত রেফারেন্সও জোগাড় করে ফেলে। ব্যস, আর কী?

পুলিশ অ্যাকাডেমি থেকে সর্বকালের সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছে সানি। কোনও কোনও ফায়ার আর্মসের ব্যাপারে ওর জ্ঞান, ফাইলের একজায়গায় বলা হচ্ছে, ওই অস্ত্র যে বা যারা বানিয়েছে তাদের চেয়েও সম্ভবত বেশি। আনআর্মর্ড কমব্যাটেও পারদর্শী সে।

ফাইলের শেষপাতায় চলে এল রানা। এখানে সানির ব্যাপারে

মন্তব্য লিখেছে ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রিচার্ড হেইডন স্বয়ং, 'গত কয়েক বছরে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে-ক'জন ইয়াং অফিসার জয়েন করেছে, তাদের মধ্যে যাদেরকে আমি দেখেছি, সানি তাদের মধ্যে সেরা। এরকম অফিসারই চাই আমরা, কারণ এরা অনেক বড় বড় কাজ করার ক্ষমতা রাখে।'

আবারও চেয়ারে হেলান দিল রানা, হাতঘড়ি দেখল। তিনটে বাজে।

তিনটা? কখন বাজল? ফাইলগুলো পড়তে পড়তে এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিল রানা যে, টেরই পায়নি কোন্‌দিক দিয়ে চলে গেছে সময়।

হাই তুলল ও। হঠাৎ করেই ক্লান্তি লাগছে, আরাম চাইছে শরীরটা। হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় একটু লম্বা না হলেই নয়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রানা, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। ওর অ্যাপার্টমেন্টটা পুলিশ বিল্ডিং-এর কাছে হওয়ায় ভালোই হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে ঘুমাতে পারবে। সকাল ঠিক আটটায় আসতে বলেছে শায়লাকে, কাজেই বিছানা ছাড়তে হবে আরও আগে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় লাইটগুলো নিভিয়ে দিতে ভুলল না ও।

কিন্তু খেয়ালই করল না, ফাইল চারটে পড়ে আছে টেবিলের ওপর।

বিশ

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় পুলিশ বিল্ডিং-এ হাজির হলো

রানা। হাতে এখনও আধ ঘণ্টা আছে, তাই হেইডনের অফিসে ঢুঁ মেরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

বরাবরের মতই টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে হেইডন, এই সাত-সকালেই। একদিকের কাঁধ আর কান দিয়ে চেপে ধরেছে একটা সেটের রিসিভার, একইসঙ্গে দু'হাত দিয়ে কী যেন টাইপ করছে ডেস্কের-ওপর-রাখা ল্যাপটপে। রানাকে দেখে থমকাল একটু, তারপর 'ঠিক আছে, রাখছি এখন,' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। ইশারায় বসতে বলল রানাকে, ল্যাপটপের পাশে রাখা নিজের টাচস্ক্রীন মোবাইলটা নিল, সেটটা একহাতে ধরে রেখে আরেকহাতের তর্জনী দিয়ে গুঁতোচ্ছে সমানে, কাউকে খুদেবার্তা পাঠাচ্ছে মনে হয়।

একটু অন্যরকম লাগছে না হেইডনকে?

লোকটা বোধহয় জানে না কাল রাতে "ডিউটিতে" ফাঁকি দিয়েছে রানা ও শায়লা। জানলে এতক্ষণে...

এস.এম.এস. পাঠানো শেষ করে সেটটা আগের জায়গায় নামিয়ে রাখল হেইডন। বলল, 'ঘুমালে মরে যাও নাকি?'

হাই তুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। 'স্লিপিং মিন্স সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্লিনিকাল ডেথ। কথাটা আমার নয়, ডাক্তারদের।'

'ডাক্তারদের...' গালি দিতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল হেইডন। 'সেই কখন থেকে একের পর এক ফোন করছি তোমাকে, একবারও ধরলে না।'

'আমার মোবাইলটা সাইলেন্ট করা ছিল...'

'হঠাৎ সাইলেন্ট করার দরকার পড়ল কেন?' চোখ সরু করল হেইডন। 'কাল রাতের জন্য কত টাকা দিয়ে ভাড়া করেছিলে মেয়েটাকে?'

'মেয়েদেরকে বিছানায় নিতে চাইলে ভাড়া করার দরকার হয়

না আমার।'

'তা-ই নাকি? জেনে ভালো লাগল হলিউডের একজন নায়ক বসে আছে আমার সামনে। শোনো, সার্চ ওয়ার‍্যান্টটা ইস্যু করিয়ে ফেলেছি আমি।'

কথাটা হঠাৎ বলেছে হেইডন, তাই বুঝতে পারল না রানা। 'কীসের সার্চ ওয়ার‍্যান্ট?'

'মেয়েটা নিশ্চয়ই খাসা মাল ছিল, না? সেজন্যে ঘোর এখনও কাটেনি? শর্টি টার্নারের কথা বলছি আমি, মিস্টার হিরো।'

'ও আচ্ছা। আসলে তোমার তুলনা হয় না, হেইডন। না, ভুল বললাম। তোমার তুলনা তুমি নিজেই।'

'ফালতু কথা বাদ দাও। আগামীকাল সকালে লোকটাকে পাকড়াও করতে যাব আমরা। শর্টি টার্নার এখন তোমার, শুধু তোমার। তবে মনে রেখো, ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাই আমি, কফিনে ঢোকাতে চাই না।'

'এটা শুধু তোমার মত একজন মহৎহৃদয় মানুষই চাইতে পারে।'

কটমট করে কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকল হেইডন। তারপর বলল, 'কাজটা করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে।'

'কাঠখড় বেশি হয়ে গেছে তোমার, পোড়াবে না তো কী করবে?'

'শুধু শুধু তর্ক করছ কেন?'

'তর্ক করছি, কারণ প্রথম থেকে তোমাকে বলছি: এই কেসের সঙ্গে টার্নারের কোনও যোগাযোগ নেই। তুমিও প্রথম থেকে মাথামোটা বসের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছ, যদিও ভালো করেই জানো, তুমি আমার বস নও, সিনিয়র কলিগ। ওয়ার‍্যান্ট ইস্যু বাদ দাও, আমার সঙ্গে বরং নীচে ব্যালিস্টিক ল্যাবে চলো, একটা

জিনিস দেখাই।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল হেইডনের। 'মানে? কোনও লিড পেয়েছ নাকি?'

'সম্ভবত।'

'তা হলে তোমার জিনিসটা দেখার জন্য কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, কী বলো? ওটার কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই তো আবার?' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হাসল হেইডন।

ওকে হাসিটা শেষ করার সুযোগ দিল রানা। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা হলে আমার চেয়ে বেশি আফসোস কিন্তু তোমাকেই করতে হবে।'

স্থির দৃষ্টিতে রানাকে দেখল কিছুক্ষণ হেইডন, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'চলো।'

নিজের ডেস্কেই আছে ল্যাব টেকনিশিয়ান অ্যান্থনি স্কারযা, কিন্তু অফিশিয়াল কোনও কাজ করছে না। বড় এক টুকরো রুটি কামড়ে ধরেছে, গরম কফির প্লাস্টিক-কাপটা একহাতে ধরে আরেকহাতে ঢাকনা খুলছে। আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, দেখল দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে হেইডন আর রানা।

রুটির টুকরোটা মুখ থেকে না সরিয়েই স্কারযা বলল, 'গুড মর্নিং, স্যর। গুড মর্নিং, মিস্টার রানা।'

হেইডন বলল, 'সকালটা যে ভালো, জানলে কী করে? খারাপও তো হতে পারে। কারণ বিশেষ একটা জিনিস দেখানোর জন্য তোমার ল্যাবে আমাকে নিয়ে এসেছে রানা।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল স্কারযা।

ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'হ্যারিংটনের শরীর থেকে যে-বুলেটগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলো দিতে পারবে, প্লিয?'

সাত-সকালে কী হয়েছে বুঝতে পারছে না স্কারযা, চিবানো পাউরুটিটুকু তাড়াতাড়ি গিলতে গিয়ে গলায় আটকিয়ে ফেলল সে, আগুনগরম কফি দিয়ে গলা ভেজাতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলল জিভ। চোখমুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে বলল, 'অবশ্যই।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' স্কারযার কাঁধে হাত রাখল রানা।

একটু স্থির হলো স্কারযা। তারপর এগিয়ে গেল কেবিনেটের দিকে, সেটা খুলে বের করল "পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম--ক্যাভিস হ্যারিংটন" লেখা একটা ট্রে। ফিরে এসে রানার হাতে দিল ট্রে-টা।

'মার্টিন বেকার আর রাফির মৃতদেহ থেকে যে-বুলেটগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোও দরকার,' বলল রানা।

'ওগুলো নেই,' হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা নিল স্কারযা।

'কেন?'

'এফবিআই থেকে কয়েকজন লোক এসেছিল। আলামত হিসেবে নিয়ে গেছে ওগুলো।'

'এফবিআই?' হেইডনের দিকে তাকাল রানা। 'আমাকে কিছু জানানো হয়নি কেন?'

'প্রয়োজন মনে করিনি, তাই,' হাতঘড়ি দেখল হেইডন, বুঝিয়ে দিল মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে ওর।

ঘুরে হেইডনের মুখোমুখি হলো রানা। 'কেন প্রয়োজন মনে করলে না? তদন্তের দায়িত্ব এফবিআইকে দেয়া হয়েছে--তারমানে এই কেসে ভূতের বেগার খাটছি আমরা?'

'কে বলেছে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এফবিআইকে?' মুখ ঝামটা মারল হেইডন।

'তা হলে বুলেটগুলো নিল কেন ওরা? তরকারি হিসাবে ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে?'

‘দেখো, রানা, মাঝেমধ্যে বুঝি না কেন সবকিছু ভেঙে না বললে বোঝো না তুমি। আমাদের ওপরওয়ালারা আমাদের কাজে অসন্তুষ্ট। আমাদের শব্দটার মধ্যে যেমন লী বা চার্লি আছে, তেমন তুমি আর তোমার পার্টনার শায়লাও আছে। আমি যেভাবে বলছি সেভাবে কাজ না করে নিজেদের মর্জিমত চলতে শুরু করেছ তোমরা, কাজেই ওপরওয়ালা যদি আলামত পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে এফবিআই-এর সাহায্য চেয়ে বসে, তা হলে তাতে দোষের কী আছে? আমারই বা কী করার আছে?’

‘না, দোষের কিছু নেই। তোমারও কিছু করার নেই। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি আমাকে জানানো হলো না কেন।’

‘সময় পাইনি, তাই। মনে ধরেছে আমার জবাব? এবার কী দেখাবে দেখাও জলদি, নইলে যাচ্ছি আমি। অনেক কাজ পড়ে আছে।’

স্কারযার দিকে তাকাল রানা। ‘কবে এসেছিল এফবিআই-এর সূর্যসন্তানরা?’

‘দু’দিন আগে।’

চোয়াল শক্ত করল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘হ্যারিংটনের বুলেটগুলো বাদে আর কোনওকিছু কি রেখে গেছে ওরা?’

মাথা নাড়ল স্কারযা। ‘না, হ্যারিংটনেরগুলো বাদে বাকি সব নিয়ে গেছে।’

আবারও চোয়াল শক্ত করল রানা, বিরক্তির ছাপ ওর চেহারায়। ‘ঠিক আছে, স্কারযা। একটু বাইরে যেতে পারবে?’

‘কীসের জন্য?’ শুনে মনে হলো যেন আর্তনাদ করছে হেইডন। ‘আবারও প্রেম জেগেছে নাকি তোমার? ল্যাবের ভেতরে একা পেতে চাচ্ছ আমাকে? ভালোমত তাকিয়ে দেখো, আমি জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষ। বয়সেও তোমার চেয়ে বড়।’

‘যাচ্ছি,’ কফির কাপটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল স্কারযা,

টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

হেইডনের দিকে তাকাল রানা। ওকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে লোকটা।

ট্রে থেকে একটা বুলেট তুলে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের কাছে গেল রানা, স্টেজের ওপর রাখল সেটা। তারপর পকেট থেকে বের করল আরেকটা বুলেট, আগেরটার সঙ্গে একই জায়গায় রাখল পাশাপাশি। আগেরবার যা করেছিল, ঠিক তা-ই করল এবারও--আইপিস লেন্সে চোখ রেখে কোর্স ফোকাস আর ফাইন ফোকাস বার বার ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করে স্পষ্ট করল বুলেটদুটোকে। যখন নিশ্চিত হলো ওর জায়গায় এখন অন্য যে-কেউ এসে যদি চোখ রাখে লেন্সে, বুলেটদুটোর রাইফ্লিং মার্ক আর স্ট্রাইয়েশন যে হুবহু এক সেটা বুঝতে সমস্যা হবে না তার। কাজ শেষে সরে দাঁড়িয়ে তাকাল হেইডনের দিকে। 'এসো, দেখে যাও।'

হেইডনের সতর্ক দৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে এখন সন্দেহ। এগিয়ে এসে আইপিস লেন্সে চোখ রাখল সে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দেখল। এই সময়ে কিছুই বলল না, কোনও ভাবান্তরও হলো না ওর চেহারায়। বুলেটদুটোর ম্যাচিং দেখা শেষ করে সরে এল মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে, মুখোমুখি হলো রানার। 'দেখলাম। অনেক কাছাকাছি।'

একটা ভ্রূ উঁচু করল রানা। 'অনেক কাছাকাছি? তারমানে হুবহু এক না?'

'দেখো, রানা, দুটো বুলেটের পার্ফেক্ট ম্যাচিং নিয়ে প্রায়ই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি আমি। যে-বুলেট দুটো দেখালে, আমার কাছে মনে হচ্ছে, এখনও কতগুলো লাইন আছে সে-দুটোতে, যেগুলো পুরোপুরি মেলেনি। আমার মন্তব্য যদি জানতে চাও, তা হলে বলব, আমি যতটা না সন্তুষ্ট, তারচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত,'

আসলেই চিন্তার ছাপ পড়েছে হেইডনের চেহারায়।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা, তাকিয়ে আছে হেইডনের দিকে।

'কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?' পিছিয়ে গিয়ে লম্বা টেবিলটাতে ভর দিল হেইডন। 'একই আগ্নেয়াস্ত্রের নল থেকে বেরিয়েছে বুলেটদুটো, তা-ই তো? সে-কারণে একইরকমের টুইস্ট আর ডেপ্‌থ অভ রাইফ্লিং দেখা যাচ্ছে ওদুটোর গায়ে?'

জবাব না দিয়ে হেইডনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল রানা, মাইক্রোস্কোপের কাছে গেল। স্টেজের ওপর থেকে তুলল বুলেটদুটো। ট্রে'র বুলেটটা রেখে দিল ট্রে-তে, অন্যটা ঢোকাল পকেটে। আড়চোখে দেখল, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে হেইডন। বলল, 'কী মনে হয় তোমার, বলো তো? যা দেখলে, প্রমাণ হিসেবে সেটা টিকবে জুরির সামনে?'

'কীসের প্রমাণ তা-ই তো বুঝতে পারছি না। আর জুরি? বুলেটদুটো একই অস্ত্র থেকে বেরিয়েছে কি না সে-ব্যাপারে আমি নিজেই যেখানে এক শ' ভাগ নিশ্চিত না, সেখানে জুরির নিশ্চয়তা দিই কীভাবে?'

'হুঁ।'

'তবে তুমি চাইলে এলএপিডি'র, এমনকী এফবিআই-এর ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারি বুলেটদুটো। ওদের মতামত নিশ্চয়ই আমাদের মত অনুমাননির্ভর হবে না?' হাত বাড়াল হেইডন। 'আরেকবার দেখি তো তোমার বুলেটটা?'

'কোন্ বুলেট?' বুঝতে না পারার ভান করছে রানা।

'যেটা এইমাত্র পকেটে ঢোকালে।'

'ও, ওটা?' পকেট থেকে বুলেটটা আবার বের করল রানা, দু'আঙুলে ধরে হেইডনের হাতে দিতে গিয়েও ছেড়ে দিল, কিন্তু সেটা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই চট করে লুফে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল ধীরে ধীরে, হেইডনের প্রতিক্রিয়া দেখছে।

'কী হলো?' মোয়া নিয়ে বাচ্চাছেলের সঙ্গে খেলা করা হলে ছেলেটার চেহারা যে-রকম হয়, হেইডনের অবস্থা হয়েছে সে-রকম।

'কিছু না,' বুলেটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল রানা। 'আমার জিনিস আমার কাছেই থাক।'

'দেখো, রানা...'

হাত তুলে হেইডনকে থামিয়ে দিল রানা। 'একটা কথা ঠিকই বলেছ। যে-ব্যাপারে তুমি নিজে নিশ্চিত না, সে-ব্যাপারে জুরিকে সন্তুষ্ট করা যাবে না।'

'সন্তুষ্ট করা যাবে কি যাবে না সে-ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা না করেই নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

'আচ্ছা, হেইডন, শুধু শুধু যে কথা বাড়াচ্ছ, এখন সময় নষ্ট হচ্ছে না তোমার? তা ছাড়া পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার নেই আপাতত, কারণ কোনও তাড়া নেই আমার।'

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করল হেইডন। 'আপাতত মানে?'

'মাঝেমধ্যে বুঝি না কেন সবকিছু ভেঙে না বললে বোঝো না তুমি,' সুযোগ পেয়ে একহাত নিল রানা। 'আপাতত মানে এখন পর্যন্ত।'

'এখন পর্যন্ত মানে কোন্ পর্যন্ত?'

'জবাবটা,' নাক টানল রানা, 'সময়ই বলে দেবে।'

'দেখো, রানা, কোন্ ইঁদুর-বিড়াল খেলা শুরু করলে আমার সঙ্গে বুঝতে পারছি না। ...ঠিক আছে, তোমার যেদিন খুশি সেদিন পরীক্ষা করিয়ো তোমার সাধের বুলেট। এবার বলো, কোত্থেকে পেয়েছ জিনিসটা?'

'যে-প্রশ্নটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল তোমার, সেটা এত দেরিতে করলে কেন?'

'সুযোগ দিলে কই?'

'ঠিক আছে, সুযোগ না দেয়ার অভিযোগ যখন করলেই, তখন যথাসময়ে দেয়া হবে প্রশ্নটার জবাব।'

'গড্যাম্ইট, রানা, দোহাই লাগে, এই খেলা বন্ধ করো। তুমি...তুমি ডাবলক্রস করছ না তো আমার সঙ্গে? ঠিক করে বলো তো, আসলে কার হয়ে কাজ করছ এই কেসে?'

'আপনার হয়েই, স্যর,' ঢং করল রানা।

'যদি তা-ই হয়, তা হলে এখনই বলো কোত্থেকে পেয়েছ ওই বুলেটটা। ইট'স মাই অর্ডার।'

'হেইডন, একটা কথা আছে, জানো নিশ্চয়ই--ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। খামোকা আমার কেরামতি বাড়িয়ো না। আমার অনুমান ভুল হতে পারে। শুধু ভুল না, মারাত্মক ভুল। কাজেই একটু সময় দাও আমাকে, আমার মত কাজ করতে দাও, কী জানতে পারলাম তা নিশ্চয়ই জানাব তোমাকে একদিন না একদিন।'

'শালা শু...'

'থামো! আগেও বলেছি তোমাকে, আবারও বলছি, সবজান্তার ভান করাটা স্মার্টনেস নয়। আমি কোন্ পর্যন্ত জানি, সেটা জানাটাই স্মার্টনেস।'

'কিন্তু তোমার আচরণ দেখে আমার মনে হচ্ছে সবজান্তার ভান করছ তুমি নিজেই।'

'ভুল বললে। সবজান্তার ভান করে কোনও লাভ নেই আমার। আমি বরং বুঝবার চেষ্টা করছি, কোন্ পর্যন্ত জানতে পেরেছি।'

'ঠিক আছে, তা হলে আরও একটা কথা জেনে রাখো। এই কেসটা শেষ হওয়ামাত্র তোমার অনারারি অফিসারগিরি যাতে শেষ হয়, সেটা নিশ্চিত করব আমি নিজে। কথা দিলাম।'

'এই কেসটা শেষ হওয়ামাত্র আমার অনারারি অফিসারগিরি এমনিতেই ফুরোবে, বলদ কোথাকার,' সোজাসাপ্টা বলল রানা। তারপর যোগ করল, 'ঠিক আছে, আমি নিজের পেশায় ফিরে যাওয়ার পর তোমার যতবার খুশি আমার চাকরি খেয়ো, মানা করব না। তবে একটা আর্জি আছে, পেশ করতে পারি?'

'কী?'

'আগামীকাল যখন তোমার কথামত কফিনে না ঢুকিয়ে টার্নারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কাজে যাব, তখন আমার ব্যাকআপ স্কোয়াডে সানি আর কার্সনকে চাই।'

'কী!' থতমত খেয়ে গেছে হেইডন।

'সকালে ডাক্তারদের কথা শোনামাত্র বাপ-মা তুলে গালি দিতে চাইলে। অথচ দেখো, একজন ই.এন.টি. বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে তোমারই, কারণ কানে সত্যিই কম শোনো তুমি।'

'যাব। একজন কেন, দরকার হলে দশজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাব আমি। কিন্তু তোমারও একটা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত, মনে রেখো।'

'কেন?'

'সানি আর কার্সন, না? কতদিন হলো এলএপিডিতে ঢুকেছে ওরা, বলো তো? ওদের মত অনভিজ্ঞ, তা-ও আবার ট্রাফিকের লোককে পাঠাব টার্নারের মত বিপজ্জনক একটা খুনিকে পাকড়াও করার জন্য? পাগলা কুত্তার কামড় খাইনি আমি তোমার মত। ...হঠাৎ করে ব্যাকআপ স্কোয়াডের দরকার পড়ল কেন তোমার?'

'কারণ হঠাৎ করেই টার্নারের নামে ওয়ার‍্যান্ট ইস্যু করিয়েছ তুমি।'

'হঠাৎ কোথায়? সে-রকম কিছু যে করব, সে-ব্যাপারে আভাস দিয়েছিলাম আগেই।'

'কই, মনে পড়ছে না তো!'

'তোমার মনে না পড়ার মাশুল কি ব্যাকআপ স্কোয়াড?'

'আমার আশঙ্কা, টার্নার যদি টের পায় পুলিশ ঘিরে ফেলেছে ওকে, গুলি শুরু করবে, ডানে-বাঁয়ে দেখবে না। সানি আর কার্সনকে যদি দিতে না পারো, অসুবিধা নেই, ওদের বদলে ওদের মত ভালো গুলি চালাতে পারে এমন অন্তত দু'জনকে চাই আমার। তা না হলে আগামীকালের অ্যাসাইনমেন্টে দুনিয়ার সবাইকে পাবে তুমি, আমাকে ছাড়া। শুনেছ, নাকি তোমার কানের সমস্যার জন্য আরেকবার বলতে হবে?'

দেখে মনে হচ্ছে একটু নরম হয়েছে হেইডন। 'কিন্তু...ওরা একেবারেই অনভিজ্ঞ, রানা। এত বড় একটা অ্যাসাইনমেন্টে...'

'মা যদি সারাজীবন তার বাচ্চাকে কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াতে থাকে, বাচ্চা কখনোই শক্ত খাবার খেতে শিখবে না। কাজেই কোল থেকে একটু নামাও সানি আর কার্সনকে। সারাজীবন নিশ্চয়ই ট্রাফিকে থাকবে না ওরা? নিশ্চয়ই শুধু জরিমানার টিকেট কেটে কেটে ক্যারিয়ার শেষ করবে না? ওদের দু'জনকে, বিশেষ করে সানিকে চাই আমি, কারণ হ্যাণ্ডগান হাতে কী করতে পারে সেটা সে কাল অ্যানুয়াল কমপিটিশনে দেখিয়ে দিয়েছে।'

'তোমার মাথাটা আসলেই গেছে, রানা। পিস্তল হাতে কমপিটিশন করা, আর যে-লোক সাতাশটা মানুষকে মাটির নীচে পাঠিয়েছে তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। কারণ কমপিটিশনের টার্গেট তোমাকে গুলি করবে না, কিন্তু একটু আগে তুমিই বললে, টার্নার গুলি চালাতে পারে।'

'একটু আগে এটাও বলেছি, টার্নার গুলি চালাতে পারে বলেই সানি আর কার্সনকে চাচ্ছি। তা ছাড়া সম্ভাবনার কথা বলছি আমি, লোকটা গুলি না-ও চালাতে পারে।'

'যদি চালায়?'

'তা হলে এলএপিডি'র যেসব সূর্যসন্তান সানির মত নিখুঁত জবাব দিতে পারবে তারা বাঁচবে। বাকিরা গুলি খাবে। সহজ হিসাব।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল হেইডন, ঠিক বোঝা গেল না, চট করে হাতঘড়ি দেখল, তারপর ঝড়ের গতিতে বের হয়ে গেল ল্যাব ছেড়ে।

পায়ে পায়ে হেঁটে ভেতরে ঢুকল স্কারযা, দাঁড়াল রানার সামনে। জানতে চাইল, 'কী হয়েছে আমাদের বসের? ওভাবে টর্নেডোর মত কোথায় গেল?'

জবাব দেয়ার আগে হেইডনের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। 'কী যে হয়েছে, সেটা বুঝবার চেষ্টা করছি আমিও।'

একুশ

পরদিন ভোরবেলা।

লস অ্যাঞ্জেলেসের আকাশে সূর্য উঠতে দেরি আছে এখনও। একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে আকাশ। কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে পাখিরা, কা কা করছে কাকের দল। সামনে-পেছনে-ডানে-বাঁয়ে দু'মাইলের মধ্যে কোনও ফুল গাছ না থাকলেও বুক ভরে দম নিলে অদ্ভুত এক সুবাস পাওয়া যায়। শরীরে একটু পর পর ভালো লাগার শিহরন তুলে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদুমন্দ বাতাস।

পুলিশ বিল্ডিং-এর বাইরে, পার্কিংলটে, সারি ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিশটা গাড়ি; কোনওটার গায়েই কালোর উপরে সাদা কালিতে পুলিশ শব্দটা লেখা নেই, তবে কোনও কোনও গাড়িতে সাইরেন আর লাল-নীল আলোর ব্যবস্থা আছে। উর্দি পরিহিত অথবা সাদা পোশাকের পুলিশরা বের হচ্ছে হেডকোয়ার্টার থেকে দলে দলে, ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; প্রয়োজনীয় অস্ত্র হাতে বা হোলস্টারে রেখে বাড়তি যেগুলো আছে সেগুলো ঢোকাচ্ছে গাড়ির ট্রাঙ্কে, তারপর নিজেরা ঢুকছে গাড়িতে, সশব্দে বন্ধ করছে দরজা।

নিজের গাড়ির ড্রাইভিং সিটের পাশে, গাড়ির বডিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সব আয়োজন। দেখছে আজকের অপারেশনের ইনচার্জ ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রিচার্ড হেইডনকে, এবং ভাবছে: একেই বোধহয় বলে শশব্যস্ত।

তেজ বেড়ে গেছে লোকটার। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে সারা পার্কিংলট দাবড়ে বেড়াচ্ছে, শেষবারের মত নির্দেশনা দিচ্ছে অধীনস্থদের, যার যা নেয়ার কথা সে সেগুলো নিয়েছে কি না মিলিয়ে দেখছে বোর্ডের চেকলিস্টের সঙ্গে। যাদের চেহারায় সাহসের অভাব দেখা যাচ্ছে তাদেরকে সাহস জোগাচ্ছে। যাদেরকে দেখে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে তাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে কীভাবে কী করতে হবে।

ড্রাইভিং সিটের পাশে বসে থাকা শায়লাকে রানা বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে টার্নারকে গ্রেপ্তার নয়, আরেকটা গালফ ওয়ার শুরু করতে যাচ্ছে হেইডন।'

মুচকি হাসল শায়লা, কিছু বলল না।

আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে হেইডনের দৌড়ঝাঁপ দেখল রানা, চোয়াল শক্ত করল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে কোথায় আছে সানি আর কার্সন। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল

তাদেরকে--সারির শেষদিকের একটা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, বসে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। শায়লার দিকে তাকাল। 'তোমাকে আলাদা একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেব আমি।'

'আলাদা অ্যাসাইনমেন্ট?'

'হ্যাঁ, আলাদা।'

'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'না, ঠাট্টা না। মন দিয়ে শোনো আমার কথা। টার্নারের ওখানে যা-ই ঘটুক, এমনকী আমারও যদি কিছু হয়ে যায়, কোনও অ্যাকশনে যাবে না তুমি।'

'ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে যদি বসিয়েই রাখবেন, তা হলে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন আমাকে?'

'নিরাপদ কোনও জায়গায় বসে থেকে সানি আর কার্সনের ওপর চোখ রাখার জন্যে।'

'সানি আর কার্সন...। হায়, ঈশ্বর! হয়েছেটা কী বলুন তো, মাসুদ ভাই?'

'প্রশ্নোত্তরের সময় এখন না, শায়লা। যা বলেছি তাই কোরো।'

'কিন্তু...'

'শায়লা! এজেন্সির চিফ হিসেবে নিশ্চয়ই...'

কথাটা শেষ করতে পারল না রানা--কে যেন টোকা দিচ্ছে জানালার কাঁচে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওরা দু'জনই।

হেইডন।

সুইচ টিপে কাঁচ নামাল রানা।

মাথা নিচু করে রানা-শায়লাকে একনজর দেখল হেইডন।

'বাহ্, স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকি ধান ভানতে শুরু করেছে দেখছি! মহিলা সহকর্মীকে কোলে বসিয়ে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছ এই অবস্থাতেও?'

চেহারা কালো হয়ে গেল শায়লার।

'হাইপারমেট্রোপিয়া, হেইডন,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'মানে?'

'কাছের জিনিস দেখতে সমস্যার ডাক্তারি নাম। শায়লা আমার কোলে না, পাশে বসে আছে। টার্নারের ওখান থেকে যদি সুস্থ শরীরে ফিরতে পারি, একজন ইএনটি আর একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিজ দায়িত্বে করে দেব তোমার জন্য।'

'বেশি বোকো না, বুঝলে? তোমার দৌড় কত দেখা যাবে একটু পরেই। দৌড় যে বেশি না, তা তো বুঝিয়ে দিয়েছ আগেই, সানি আর কার্সনকে চেয়ে।'

'আমি চেয়েছি, তুমি দিয়েছ--তোমার প্রতি আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। দোয়া করি স্রষ্টা তোমাকে স্বর্গে নিক।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হেইডন। 'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'ঝড়ের গতিতে হাজির হতে চাই টার্নারের ওখানে। সানি আর কার্সন গিয়ে অ্যারেস্ট করবে ওকে, শায়লা কভার দেবে। পেছনের গলিতে ব্যাকআপ হিসেবে থাকব আমি, কেউ যদি পালানোর চেষ্টা করে, সামাল দেব।'

কোমরে ঝোলানো রেডিয়ো খুলে সানি আর কার্সনকে ডাকল হেইডন, ওরা কাছে আসার পর রানার পরিকল্পনাটা শোনাল ওদেরকে। তারপর বলল, 'কোনও সমস্যা নেই তো?'

'না, স্যর,' বলল সানি।

'না, স্যর,' বলল কার্সন।

তারপর দু'জন একসঙ্গে বলল, 'উই অ্যাপ্রিশিয়েট দিস, লেফটেন্যান্ট।'

ওদের কৃতজ্ঞতার জবাবে কিছু বলল না হেইডন। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'টার্নারকে অ্যারেস্ট না করা পর্যন্ত বাকি স্কোয়াডকে অ্যাকশনে নামাব না আমি। যেহেতু আমার ধারণা সবকিছুর হোতা টার্নারই, সেহেতু আগে ওকে ধরি, তারপর বাকিদের নিয়ে চিন্তা করা যাবে। ওর বন্ধুবান্ধবদের সতর্ক করার কোনও সুযোগ দিতে চাই না ওকে। কাজেই তোমার মাথায় যদি বিশেষ কোনও মতলব থেকে থাকে, স্রেফ ভুলে যাও, রানা।'

'বিশেষ কোনও মতলব নেই আমার মাথায়, হেইডন,' সানি আর কার্সনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা রেডি?'

'ইয়েস, স্যর,' দু'জনের হয়ে জবাব দিল সানি।

'মিস্টার রানা, আমরা চাওয়ার আগেই আমাদের জন্য সুপারিশ করে এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে আপনার সঙ্গী করেছেন আমাদের--আপনার প্রতি আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

'ভালো।'

'দেখবেন, আপনাকে হতাশ করব না আমরা,' আশ্বাস দিল সানি।

'ঠিক আছে। উঠে পড়ো গাড়িতে। আর দেরি না করে রওনা হয়ে যাই। ...শোনো, একটা কথা আছে।'

নিজেদের গাড়ির দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল সানি আর কার্সন, দু'জনই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'গোলাগুলির সময় ডানে-বাঁয়ে কেউ থাকলে খুব অস্বস্তি হয় আমার, ঠিকমত নিশানা করতে পারি না। তোমাদের আবার সে-রকম সমস্যা নেই তো?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সানি ও কার্সন।

সানি বলল, 'না, স্যর, সে-রকম কোনও সমস্যা নেই আমাদের।'

'তা হলে নিশ্চয়ই আমার সহকারী শায়লাকে তোমাদের গাড়িতে নিতে আপত্তি করবে না? লক্ষ্মী মেয়ে সে, দেখবে একদমই বিরক্ত করবে না তোমাদেরকে, বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে বসে থাকবে পেছনের সিটে।'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সানি ও কার্সন। 'না, স্যর,' এবার মুখ খুলল কার্সন, 'মিস শায়লাকে আমাদের সঙ্গে নিতে কোনও অসুবিধাই নেই। তিনি যদি পেছনের সিটে শুয়ে ঘুমিয়েও যান, কিছু অসুবিধে হবে না আমাদের।'

শায়লার দিকে তাকাল রানা। 'যাও, তা হলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে গেল ওরা।

নিজের গাড়িতে রানা একা। পেছনের গাড়িতে ড্রাইভিং সিটে সানি, ওর পাশে কার্সন। শায়লা বসেছে পেছনের সিটে।

টার্নারের গুদামের কাছে পৌঁছাতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা--আজ এই কাকডাকা ভোরে কারোরই বাইরে বের হওয়ার জরুরত হয়নি। আলো আরও বেড়েছে আকাশে, সূর্য উঠি উঠি করছে।

গুদামের পেছনের গলিতে গাড়ি থামাল রানা। সানি ব্রেক করেছে মেইন রোডে, চাইনিয রেস্টুরেণ্টটার কাছে।

গাড়ি থেকে বের হলো রানা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, ধীর পায়ে হেঁটে গলির আরও ভেতরে ঢুকছে। গুদামের পেছনের দরজার কাছে একটা বুইক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর হাঁটার গতি আরও কমল। চট করে একটা গারবেজ ক্যানের আড়ালে বসে পড়ল ও। ঠিক তখনই, ওকে কিছুটা আশ্চর্য করে দিয়ে, গুদামের ভেতর থেকে ভেসে এল টেলিফোনের আওয়াজ।

ক্রিং ক্রিং শব্দে একটানা বেজে চলেছে ল্যাণ্ডফোনটা।

রেক্সিন-সুতা-স্ক্রু যা ছিল চেয়ারটাতে, অতি ব্যবহারে প্রায় সবই যাই যাই করছে, তারপরও ওই চেয়ারেই বসা চাই টার্নারের। শুধু তা-ই না, আরও অনেক কিছুই চাই ওর। যেমন এই সাত-সকালে পোচ-করা লবণ-মাখানো আধডজন ডিম রাখা হয়েছে ওর সামনের টেবিলে, সঙ্গে পুরো একটা পাউরুটি দিয়ে তৈরি বাটার-টোস্ট আর বড় সাইজের দুই গ্লাস দুধ। বাঁ হাতটা ব্যস্ত উদরপূর্তির কাজে, ডান হাতে চোখের সামনে মেলে ধরে আছে সে একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকার কমিক সেকশন। ফোনটা যখন বাজতে শুরু করল, যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বিষদৃষ্টিতে তাকাল সেটটার দিকে, হাত থেকে টেবলস্পুনটা ফেলে দিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল একটা দুধের-গ্লাস।

'সকাল সকাল কার মরার খবর এসেছে কে জানে,' দুধের গ্লাস একনিঃশ্বাসে খালি করে বিড়বিড় করে বলল সে।

ঘরের আরেককোনায় একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে ষণ্ডামার্কা চারজন লোক, নাস্তা সারছে তারাও। টার্নার একা যা খাচ্ছে, ওদের সবার ভাগে অতটা জোটেনি। আলাদা আলাদা প্লেটের ঝামেলায় না গিয়ে খাবলাখাবলি করে খাচ্ছে ওরা পাউরুটি আর শুয়োরের মাংসের কাবাব। উইস্কির একটা মাত্র বোতল খোলা ওদের সামনে, যার যখন দরকার লাগছে তখন গলা চেপে ধরে বোতলটা টেনে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে সে। তবে আলাদা আলাদা ন্যাপকিন ব্যবহার করছে ওরা। ন্যাপকিনের পাশে ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমের ভান করছে ওদের পিস্তলগুলো। একটা শটগান ঠেস দিয়ে রাখা আছে টেবিলের সঙ্গে।

ফোনের আওয়াজ পেয়ে শুয়োরের কাবাব চিবানো বন্ধ করে চারজনই তাকাল টার্নারের দিকে। বহুল ব্যবহৃত চেয়ারটা যেন লোকটার কফিন--সেখান থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই ওর। এক

গ্লাস দুধ খেয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে, এক টুকরো পাউরুটিতে পুরো একটা ডিম রেখে টুকরোটা চালান করে দিল মুখে, তারপর আগের মতই মনোনিবেশ করল কমিকসে।

তারমানে যে-ই ফোন করে থাকুক, রিসিভ করার কোনও আগ্রহ নেই বসের--বুঝে নিল অন্য চারজন। শুয়োরের কাবাবে আবার মন দিল ওরা।

কিন্তু এক কি দেড় মিনিট পর আবার বেজে উঠল ফোনটা।

ততক্ষণে আরেক টুকরো পাউরুটি তুলে নিয়েছে টার্নার, ওটা ধরে রেখেই হাতটা নাড়ছে সে--ইশারায় বলছে স্যাঙাৎদের, তোমরা কেউ একজন রিসিভারটা তুলে আমাকে উদ্ধার করো, বাপু।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, প্রায় দৌড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভারটা, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরেকটু হলেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল নতুন-আমদানি-করা থমসন সাবমেশিনগানের একটা বাক্স। রিসিভার কানে ঠেকাল সে, কিন্তু কিছু বলার আগে মাউথপিসে জড়িয়ে নেয়ার জন্য রুমাল বের করল পকেট থেকে।

কিছু বলার দরকার হলো না ওর, কারণ অন্যপ্রান্তের লোকটা কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। এবং যা বলেছে, তা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রিসিভার ধরে থাকা লোকটার। নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, 'কে?'

পরিচয় দিল না ও-প্রান্তের লোকটা।

'হু দ্য হেল ইয দিস?'

জবাব নেই ও-প্রান্তে।

'হারামখোর, নিজের পরিচয় দিবি না? কুত্তার বাচ্চা, একবার শুধু নাগালের মধ্যে পাই তোকে, একলাথিতে তোর কোমর যদি না ভেঙেছি তো আমার নাম...' নিজের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে

টের পেয়ে সংযত হলো এ-প্রান্তের লোকটা।

খট্ করে আওয়াজ হলো ও-প্রান্তে, কেটে দেয়া হয়েছে লাইন।

মাউথপিস থেকে ধীরে ধীরে রুমাল সরিয়ে নিচ্ছে এ-প্রান্তের লোকটা, বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে রিসিভারের দিকে।

গোলমাল টের পেয়ে মাংস চিবাতে চিবাতেই উঠে দাঁড়িয়েছে বাকি তিনজন। টার্নারও বুঝতে পারছে দিনের শুরুটা শুভ নয়, তাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। যে-লোকটা ফোন ধরেছে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, রিখ?'

স্লো মোশন রিপ্লে'র গতিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রিখ, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল সদর-দরজার দিকে। তারপর টার্নারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেউ একজন ফোন করে বলল, আমাদেরকে নাকি ঘিরে ফেলেছে পুলিশ, হামলা করবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'কী?' হাঁ হয়ে গেছে বাকি তিনজনের মধ্যে একজনের মুখ।

মাথা ঝাঁকাল রিখ। 'ওদের মধ্যে নাকি উর্দিপরা-উর্দিছাড়া দু'রকমেরই পুলিশ আছে।'

আদেশের অপেক্ষায় টার্নারের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

খিদে নষ্ট হয়ে গেছে টার্নারের, এবং যখনই এ-রকম হয় মেজাজ ভীষণ বিগড়ে যায় ওর। প্লেটের ডিমগুলোকে মুরগির বিষ্ঠা বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে, মজাদার কমিক চরিত্রগুলোকে মনে হচ্ছে শয়তানের বাচ্চা। যে-চেয়ারে ওর নিতম্বটা সুপার গ্লু দিয়ে আটকানো ছিল এতক্ষণ, সেটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে; ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'কণ্ঠটা পরিচিত মনে হয়েছে তোমার কাছে, রিখ?'

'একটুও না। লোকটা শুধু বলল পুলিশ ঘিরে ফেলেছে আমাদেরকে, হামলা করবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, উর্দিপরা-উর্দিছাড়া

দু'রকমের পুলিশই আছে। সে কে জানতে চাইলাম, জবাব না দিয়ে ফোন রেখে দিল।'

সাপ যেভাবে ঘৃণা করে বেজিকে, কুমড়ো যেভাবে ঘৃণা করে দা-কে, কিংবা ধর্ষিতা যেভাবে ঘৃণা করে ধর্ষককে, পুলিশ শব্দটা এবং পুলিশের উর্দিপরা লোকদের ঠিক সেইভাবে ঘৃণা করে টার্নার। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আজ যে-অবস্থানে আছে সে, তার চেয়ে আরও অনেক উপরে থাকতে পারত--না পারার একমাত্র কারণ এই পুলিশ। সময়ে-অসময়ে হানা দিয়েছে ওরা ওর "ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে", কারণে-অকারণে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে থানায়, এবং এমন সব মামলায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে ওকে যেগুলো হয়রানিরই নামান্তর।

'শুয়োরের বাচ্চা!' বিড়বিড় করে বলল সে, এবং বলেই ভালুকের মত হাত দিয়ে থাবা মারল টেবিলে। ডিমের প্লেট, দুধের গ্লাস, পাউরুটির প্যাকেট এবং কমিকওয়ালা ট্যাবলয়েড ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে। টেবিলের ওপর চোদ্দ ইঞ্চির একটা টিভিও ছিল, হুড়মুড় করে পড়ল সেটা মেঝেতে, ফাটল পিকচার টিউব, কাঁচ ভাঙার আওয়াজটা বিশ্রী শোনাল সকালের সতেজ আবহাওয়ায়। 'হামলা করবে, না? ঠিক আছে, জবাব দেয়ার জন্য আমিও প্রস্তুত। রিথ, সদর-দরজার দায়িত্বে থাকবে তুমি। ল্যান্স, তুমি যাও গ্যারেজের দরজায়। হেণ্ড্রিক্স আর র‍্যাশ গিয়ে দাঁড়াও জানালার দুই পাশে। ওদেরকে কোনও সুযোগ দেব না আমরা।'

'কিন্তু, বস্, ওরা যদি আসলেই পুলিশ হয়ে থাকে তা হলে কী করব?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলল ল্যান্স। 'হতে পারে কেউ হয়তো...'

জবাবে ওর দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকাল টার্নার, সেটা দেখে মুখের কথা মুখেই মরে গেল ল্যান্সের।

বাকি তিনজন ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যার যার জায়গায়,

অস্ত্র হাতে। র‍্যাশ নিয়েছে সাবমেশিনগানটা। দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না, তাই ল্যান্সও পজিশন নিল নিজের জায়গায়।

'খুন করতে করতে মজা পেয়ে গেছে লোকটা,' চেঁচিয়ে চার স্যাঙাৎকে বলল টার্নার, 'বেপরোয়া হয়ে গেছে। এবার টার্গেট করেছে আমাকে। কত বড় সাহস, হামলা করার আগে ফোন দেয়! পুলিশ-টুলিশ সব ভুয়া কথা, বুঝতে পেরেছি আমি, পুলিশের উর্দিপরা যে-লোক খুন করেছে মার্টিন বেকারকে সে-ই আসছে এখন। কাজেই সে পুলিশ নাকি অন্যকিছু সে-প্রশ্ন করার কোনও মানে হয় না।'

'বস্!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হেণ্ড্রিক্স। 'একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'কোথায়?' জলহস্তির মত শরীর নিয়ে ছুটে গেল টার্নার, দাঁড়াল হেণ্ড্রিক্সের পাশে। পুলিশের মার্কাছাড়া রানার সাদা ফোর্ডটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গলিতে, যা বুঝবার বুঝে নিয়ে বলল, 'যে বা যারাই এসে থাকুক, ওরা পুলিশ না। হয় আমাদের শত্রুপক্ষের লোক, নইলে ওই খুনিটা। পুলিশ সবসময় সদর-দরজায় আসে।'

'বস্,' সদর-দরজার কাছ থেকে আওয়াজ দিল রিখ, 'মেইনরোডেও একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। পুলিশের মার্কামারা না, কিন্তু ভেতরে উর্দিপরা এক বা দু'জন আছে।'

'তুমি শিয়োর ওরা উর্দিপরা?'

'হ্যাঁ...আসলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আলো এত কম যে...। আরে, প্যাসেঞ্জার সিটে আরেকজন আছে দেখছি! ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামনের দু'জন উর্দি পরে আছে, স্পষ্ট দেখছি। কিন্তু গাড়িতে পুলিশ শব্দটা লেখা নেই।'

'তা হলে গলির সাদা গাড়িটার মানে কী?' বিভ্রান্ত হয়ে গেছে টার্নার। 'মানলাম সামনের লোকগুলো উর্দি পরে এসেছে, কিন্তু

ওদের অফিশিয়াল গাড়ি গেল কোথায়? বাজি ধরতে পারো, ওদের একজনও পুলিশ না, পুলিশের বেশ ধরে এসেছে।'

'মনে হয়,' সায় জানাল রিখ।

'বস্, গলিতে আছে আরও একজন,' জানাল র‍্যাশ, একহাত থেকে আরেকহাতে নিল সাবমেশিনগানটা। 'লম্বাচওড়া একটা লোক, গারবেজ ক্যানের আড়ালে বসে আছে। পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম না, ক্যাযুয়াল ড্রেস।'

'কোথায়?' জায়গা বদল করে র‍্যাশের পাশে এসে দাঁড়াল টার্নার।

'ওই যে...ওখানে। ...উঠে দাঁড়াল এইমাত্র। মাথা নিচু করে ছুট লাগিয়েছে। হাতে পিস্তল।'

'দেখেছি!' বলল টার্নার। 'লোকটাকে দেখতে পুলিশের মত লাগছে না একটুও। হাতের পিস্তলটাও পুলিশের সার্ভিস রিভলভার না, সম্ভবত ওয়ালথার। ...হ্যাঁ, বোঝা গেল, ওদের কেউ পুলিশ না। ...শোনো তোমরা, প্রথম সুযোগেই ওদের সবক'টাকে শুইয়ে ফেলবে, কোনও ছাড় দেবে না।'

গাড়ি থেকে বের হয়ে মাথা নিচু করে ছুট লাগিয়েছে সানি আর কার্সন, একদৌড়ে এসে হাজির হয়েছে সদর-দরজার দু'পাশে। সানি সাবধানে গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে, জোরে দু'বার টোকা দিয়েই সরে গেল।

গুদামের ভেতরে সবাই তাকিয়ে আছে দরজাটার দিকে, টার্নার বাদে বাকিরা অস্ত্র তাক করেছে সেদিকে। টার্নারের নির্দেশের অপেক্ষা করছে ওরা।

ডান হাতের তিনটা আঙুল তুলল টার্নার, বুঝিয়ে দিল, সে চাইছে না এখনই গুলি করতে শুরু করুক ওর স্যাঙাৎরা।

আবারও টোকা পড়ল দরজায়, এবার আগের চেয়েও জোরে।

'দরজা খোলা যাবে না,' গলা ফাটাল টার্নার। 'ভেতরে কেউ নেই। আজ রোববার, মালিকের কড়া হুকুম আছে, ছুটির দিনে যেন বাইরের কেউ ঢুকতে না পারে গুদামে। আগামীকাল এসো।'

'পুলিশ,' চেঁচিয়ে বলল সানি। 'কয়েকটা কথা বলতে চাই। দরজা খোলো।'

'আমার সঙ্গে কথা বলে কী লাভ? আমি এখানকার দারোয়ান মাত্র। আগামীকাল এসো।'

'দরজা খোলো!' আগের চেয়েও জোরে বলল সানি, অধৈর্য হয়ে পড়ছে। 'শর্টি টার্নারকে খুঁজছি আমরা। ওর নামে অ্যারেস্ট ওয়ার‍্যান্ট আছে আমাদের কাছে।'

ইঙ্গিতে নিজের লোকদেরকে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হতে বলল টার্নার। 'বললাম তো, ভেতরে কেউ নেই!'

'ঠিক আছে, কেউ না থাকলেও চলবে,' বলল কার্সন, আগের পজিশন ছেড়ে সরে এসে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল, 'পুরো গুদাম সার্চ করার ওয়ার‍্যান্টও আছে আমাদের কাছে। এখন শেষবারের মত বলছি, দরজা খোলো!'

'খুলছি!' হাতটা নামিয়ে নিল টার্নার, গুলি করার সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিয়েছে স্যাঙাৎদের। 'তবে তার আগে ওয়ার‍্যান্টটা ঠেলে দাও দরজার নীচ দিয়ে।'

কী করবে জানার জন্য সানির দিকে তাকাল কার্সন।

ঠিক সে-মুহূর্তে একসঙ্গে গুলি করল রিখ, ল্যাম্ব, হেন্ড্রিক্স আর র‍্যাশ।

দরজা ভেদ করে দুটো বুলেট গিয়ে লাগল কার্সনের শরীরে, ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে, দৃষ্টিতে একইসঙ্গে ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে—যেন এখনও বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। সে সরার আগেই আবারও গুলি করল টার্নারের স্যাঙাৎরা—আগের বুলেটগুলো দরজায় যে-ছিদ্রপথ

বানিয়েছে সেগুলো দিয়ে দেখতে পেয়েছে ওরা কার্সনকে--এবার চারটে বুলেটের ক্ষত শরীরে নিয়ে স্রেফ ছিটকে পড়ে গেল কার্সন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর ইউনিফর্ম, প্রচণ্ড ব্যথায় ঠিকমত গোঙাতেও পারছে না বেচারা।

লাইন অভ ফায়ারে ওদের গাড়িটাও ছিল, বুলেটগুলো চুরমার করে দিয়েছে উইণ্ডশিল্ড, বেরিয়ে যাওয়ার সময় টুকরো টুকরো করেছে ড্রাইভারের পাশের জানালার কাঁচও। নিজেকে বাঁচাতে প্যাসেঞ্জার সিট থেকে ঝট করে গাড়ির মেঝেতে বসে পড়েছে শায়লা, খুলে দিয়েছে একপাশের দরজা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করেছে ওর নাইন মিলিমিটার। একটুখানি সরে গিয়ে ড্রাইভিং সিটের পেছনে পজিশন নিল ও, খুলে দেয়া দরজার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে পিস্তলধরা হাতটা রাখল জানালার এককোনায়, ড্রাইভিং সিটের আড়াল থেকে মাথাটা একটুখানি বের করে পর পর দু'বার ফায়ার করল গুদামের দিকে। বুঝতে পারল, অকারণে গুলি খরচ করছে নিজের নাইন মিলিমিটারের; প্যাসেঞ্জার সিটে শুয়ে আছে একটা শটগান। পিস্তলটা শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে শটগানটা নিল ও, চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক গুলি করে চুরমার করে দিল গুদামের সবক'টা জানালা। তারপর অস্ত্রটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে আবার বের করল পিস্তল, কিন্তু গুলি করল না, বরং মেঝেতে প্রায় শুয়ে পড়ে হাত বাড়াল রেডিয়োর দিকে। সুইচ টিপে দিয়ে যোগাযোগ করল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে, অপারেটরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জরুরি কণ্ঠে হড়বড় করে বলল, 'অনারারি অফিসার শায়লা মারিয়া বলছি। আমাদের অবস্থা খারাপ। ডেল কার্সনকে মেরে ফেলেছে ওরা। জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য চাই। যত জলদি পারো আরও ইউনিট পাঠাও। ওরা মনে হয় একডজন লোক বসে আছে গুদামের ভেতরে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

শায়লা গুলি করতে শুরু করায় ক্রসফায়ারে পড়ে গিয়েছিল সানি, ভাগ্যকে জঘন্য সব গালি দিতে দিতে শুয়ে পড়ল সে মাটিতে, ক্রল করে যত জলদি সম্ভব সরে এল গুদামের একদিকের দেয়ালের আড়ালে।

গারবেজ ক্যানের আড়াল ছেড়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল রানা, এলোপাতাড়ি গুলি করছে গুদামের উদ্দেশে। কে যেন গুলি করল গুদামের ভেতর থেকে, চুরমার হয়ে গেল বুইকের একদিকের জানালা, ভাঙা কাঁচের টুকরো এসে লাগল রানার গায়ে। ঝট করে বসে পড়ল ও, পকেট থেকে এক্সট্রা ম্যাগাযিন বের করে রিলোড করে নিল ওয়ালথারটা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, বুকে-পেটে ভর দিয়ে আরও কাছে চলেছে গুদামের।

গুদামের ভেতরে যারা আছে সবাই একসঙ্গে গুলি করতে শুরু করেছে আবার। একটা সেকেণ্ডের জন্য থামল রানা, মাথা তুলে খেয়াল করার চেষ্টা করল অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো, ওর মনে হচ্ছে পাঁচ কি বেশি হলে ছ'জন আছে গুদামে। হিসেবটা কাজে লাগবে।

একটু আগে যেখানে ছিল রানা সেদিকে এলোপাতাড়ি গুলি করছে গুদামের ভেতরের লোকগুলো। চুরমার হয়ে যাচ্ছে বুইকের সবগুলো কাঁচ, ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে বনেট আর দরজাগুলো। টের পেল রানা, ওর মাথার বড়জোর দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, একটু দূরের মাটি ছেঁদা হওয়ার শব্দ শুনতে পেল ও পরিষ্কার।

দুই কনুই, মাথা আর ঘাড় কাজে লাগিয়ে ডিগবাজি দিল রানা, ল্যাণ্ড করল নিতম্বের ওপর। মুহূর্তমাত্র সময় দিল না গুদামের লোকগুলোকে, আরও একটা ডিগবাজি খেয়ে চলে এল আরেকটা গারবেজ ক্যানের আড়ালে। ততক্ষণে কেউ একজন শটগান নিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে একদিকের জানালার কাছে, রানাকে সহজ টার্গেট মনে করে নিশানা করেই টেনে দিয়েছে

ট্রিগার। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, ভারী বুলেটের ধাক্কায় ক্যান উল্টে গিয়ে বেশকিছু ময়লা পড়ল রানার গায়ে। পরের বুলেটটা একটা আধ-গ্যালনের দুধের কন্টেইনার উল্টে ফেলল ওর ওপর। পিছলে সরে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ আড়ালে নিয়ে গেল ও।

নাইন মিলিমিটার হাতে অপেক্ষা করছিল শায়লা গাড়িতে, গুদামের ভেতরে জানালার কাছে একটা লোককে দেখল শটগান দিয়ে গুলি চালাচ্ছে রানার ওপর, দেরি না করে পর পর চারবার টান দিল ও পিস্তলের ট্রিগারে, জানালার লোকটাকে লক্ষ্য করে। ওর প্রথম দুটো বুলেট লাগল না নিশানায়, তৃতীয় বুলেট ক্ষত তৈরি করল লোকটার বুকের ডানদিকে, চতুর্থ বুলেট বেরিয়ে গেল লোকটার পেট ছেঁদা করে দিয়ে।

নিস্তব্ধতা।

গোলাগুলি আপাতত বন্ধ। উভয়পক্ষই বুঝতে চেষ্টা করছে, একে অপরের কী ক্ষতি করতে পেরেছে ওরা।

গুদামের ভেতরে জানালার কাছে চিৎ হয়ে পড়ে আছে হেণ্ড্রিক্স, এখনও দম বের হয়নি ওর, তবে মরণপিপাসায়-শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা, একটুখানি পানি ভিক্ষা চাইছে সে কমরেডদের কাছে। কিন্তু নিরাপদ পজিশন ছেড়ে সরতে গিয়ে নিজের মরণ ডেকে আনতে রাজি নয় কেউই, তাই হেণ্ড্রিক্সের কথায় কর্ণপাত করছে না ওরা। এত গোলাগুলি হতে পারে ভাবেনি টার্নার, তাই ঘাবড়ে গেছে, একদিকের পুরু ইটের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়েছে। বাকিরা সময় নিয়ে রিলোড করছে যার যার ফায়ার আর্মস।

আড়াল ছেড়ে বের হওয়ার সাহস পাচ্ছে না সানি। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুকে হারানোয় ভাগ্যকে এখনও গালমন্দ করছে সে বিড়বিড় করে। টের পাচ্ছে, রক্তপিপাসু হয়ে উঠছে ওর মনটা। লম্বা ব্যারেলের লোডেড সার্ভিস রিভলভারটার দিকে

তাকাল সে।

গাড়ির মেঝেতে এখনও বসে আছে শায়লা। প্রথমে শটগানটা, পরে ওর নাইন মিলিমিটার রিলোড করল। বার বার বাইরে উঁকি দিয়ে খুঁজছে রানাকে।

নাকেমুখে এসে পড়েছে একগাদা পচা নুডল্‌স, দুর্গন্ধে দম আটকে যাওয়ার জোগাড়; ডান হাতে ওয়ালথারটা ধরে রেখে বাঁ হাতে নুডল্‌সগুলো সরাচ্ছে রানা। কাজটা শেষ হওয়ার পর মাথা একটুখানি তুলতে গেল, কিন্তু নামিয়ে নিতে হলো সঙ্গে সঙ্গে--গুদামের একদিকের চুরমার হওয়া জানালায় দাঁড়িয়ে সাবমেশিনগান দিয়ে গুলি করছে কেউ।

এবার ঝাঁঝরা হলো সানিদের গাড়ি, মেঝেতে পুরোপুরি শুয়ে পড়ায় বেঁচে গেল শায়লা। ঝাঁঝরা হলো গারবেজ ক্যান আর দুধের কন্টেইনারটাও। খট্‌ করে একটা আওয়াজ হলো কিছুক্ষণ পর, সকালের নিস্তব্ধতায় সে-আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল রানা, মুহূর্তের মধ্যে আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, সাবমেশিনগানওয়ালাকে লক্ষ্য করে অতি দ্রুত তিনবার টান দিল ওয়ালথারের ট্রিগারে, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

ও বসে পড়ার আগেই সাবমেশিনগানটা খসে পড়েছে র‍্যাশের হাত থেকে, বুকের বাঁ দিকে একই জায়গায় ওয়ালথারের তিনটে বুলেটের ক্ষত নিয়ে মারা গেছে সে।

সাইরেনের প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ করতে করতে ছুটে আসছে কতগুলো গাড়ি, তবে এখনও দূরে আছে ওগুলো। আশপাশের নীরবতায় বড় বেশি কানে লাগছে সে-আওয়াজ।

সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটলে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-ক্ষুধিত মানুষদের চোখেমুখে যে-খুশি দেখা যায়, ঠিক সে-আনন্দ এখন শায়লার চেহারায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও, শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে আবার পজিশন নিল ড্রাইভিং সিটের আড়ালে।

গ্যারেজের দরজার কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ল্যান্স, রানার পজিশনটা ফাঁস হয়ে গেছে ওর কাছে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল জানালার কাছে, একের পর এক টান দিচ্ছে ট্রিগারে। আরও একবার ফুটো হলো গারবেজ ক্যান, বুলেটের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে গড়িয়ে পাঁচ ফুট দূরে চলে গেল দুধের কন্টেইনার, পজিশন ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে তিন-চার হাত তফাতে সরে গেল রানা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার, জানালার উদ্দেশে দু'বার র‍্যাপিড ফায়ার করেই বসে পড়ল। যে-লোক দাঁড়িয়ে ছিল জানালায় তার মরণ আর্তনাদ শুনে বুঝল, ওর ফায়ারিং বৃথা যায়নি।

ক্রসফায়ারে পড়ার ভয়ে এখনও মাথা তুলতে পারছে না সানি। পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শুনে শায়লার মত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে-ও।

এতক্ষণে নিজের পিস্তলটা হাতে নিয়েছে টার্নার, মৃত্যুভয়ে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। তিন স্যাঙাৎকে হারিয়েছে সে, বাকি আছে শুধু সদর-দরজা-আগলে-রাখা রিখ, দু'জনে মিলে বাইরের লোকগুলোকে সামলাবে কীভাবে বুঝতে পারছে না। ওদিকে হাজির হয়ে গেছে চিরঘৃণিত পুলিশ, ওরা যদি এবার হাতে পায় ওকে...

মেইনরোডে একের পর এক ব্রেক কষল পুলিশের গাড়িগুলো, ঝড়ের গতিতে দরজা খুলে দলে দলে নামছে অফিসাররা; কেউ পজিশন নিচ্ছে খোলা দরজার আড়ালে, কেউ চলে যাচ্ছে বুটের পেছনে। কারও হাতে শটগান, কারও হাতে সার্ভিস রিভলভার। যারা দরজার আড়ালে আছে তারা দেরি না করে গুলি করতে শুরু করেছে, গুদামের প্রতিটা জানালা আর প্রতিটা দরজা ওদের লক্ষ্য। ফায়ারিং শেষ হলে এদেরকে, যারা বুটের পেছনে গেছে তারা ব্যাকআপ দেবে। সে-সুযোগে রিলোড করে নেবে দরজার

আড়ালের লোকগুলো।

বুলেটের মুহুর্মুহু আঘাতে জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে গুদামের দরজাগুলো, জায়গায় জায়গায় চলটা উঠে যাচ্ছে গোবরাটের, জানালাগুলোয় কাঁচ বলতে কিছু বাকি থাকছে না, পাল্লাসহ খসে পড়ছে কোনও কোনওটা।

নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিয়েছে পুলিশবাহিনী, জবাবে গুদামের ভেতর থেকে টুঁ শব্দটিও শোনা যাচ্ছে না।

আবারও নিস্তব্ধতা।

সঙ্গে করে আনা মেগাফোন তুলে নিল জনৈক পুলিশ অফিসার, গাড়ির খোলা দরজার আড়ালে থেকে উঁচু গলায় আদেশের ভঙ্গিতে বলল, 'গুদামের ভেতরে যারা আছ তাদেরকে বলছি। তোমাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু'হাত মাথার উপরে তুলে বেরিয়ে এসো। তিন পর্যন্ত গুনব আমি। কথামত কাজ না করলে আবার ফায়ারিং শুরু করব আমরা। এক...'

পজিশন সামান্য বদল করল রানা, এখন কী হতে পারে আঁচ করতে পারছে। অনেক পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে গুদামের লোকগুলোকে, নতুন করে হামলা করার উপায় নেই ওদের, অবস্থাটা এখন ওদের জন্য কিস্তিমাতের মত। সুতরাং শেষ যে-চেষ্টাটা করবে ওরা তা হলো, পালানো। পেছনের দরজার দিকে তাকাল রানা।

বুইকটা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অকেজো হয়ে যায়নি নিশ্চয়ই?

'দুই...'

আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে পেছনের দরজাটা, কেউ একজন বেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে। প্রথমে মাথাটা বের হলো একটুখানি, এদিক-ওদিক তাকিয়ে অবস্থা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল সে, তারপর পাগলের মত ছুট লাগাল বুইকের উদ্দেশে।

'যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে যাও!' হুঙ্কার দিল রানা; শরীরটা দেয়ালে ঠেকিয়ে, দু'হাঁটু ভেঙে, নিতম্বে ভর দিয়ে উঠে বসেছে ও। ওয়ালথার তাক করা আছে ছুটন্ত লোকটার দিকে।

চমকে উঠল ছুটন্ত লোকটা, দৌড়ানোর গতি কমল ওর কিন্তু থামল না সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল রানাকে, পাত্তা না দিয়ে উঠে পড়ল বুইকে। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ তুলে গুলি করল রানাকে। তাড়াহুড়োয় মিস করল।

ওয়ালথার তুলল রানা, নিশানা করেই টান দিল ট্রিগারে; উইণ্ডশিল্ডে আরও একটা গর্ত বানিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটার কপালে একটা লাল টিপ পরিয়ে দিল রানার বুলেট। লোকটার মাথা সিটের সঙ্গে বাড়ি খেল সজোরে, নড়াচড়ার আর কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে মেগাফোনওয়ালা পুলিশ অফিসার, গণনা থামিয়েছে সে। কে কেন কাকে গুলি করেছে জানার দরকার নেই ওদের, তাই আবার ফায়ারিং শুরু করল ওরা।

দেয়ালের আড়াল ছেড়ে মাত্র বের হয়েছিল রানা, একইসঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং অন্য আরেকটা শব্দ হওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

গুদামের সামনের গ্যারেজের দরজা খুলে গেছে হঠাৎ, গর্জন করে বেরিয়ে আসছে একটা ক্যাডিলাক, চালকের আসনে শর্টি টার্নার স্বয়ং।

জায়গা ছেড়ে সরল না রানা, বরং ওয়ালথারটা তুলে নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে।

টার্নারকে খুন করার ইচ্ছা ছিল না রানার, তাই বুলেটটা চুরমার করল উইণ্ডশিল্ডের এককোনার ক্রোমস্ট্রিপ। রানাকেও

বোধহয় চাপা দেয়ার ইচ্ছা ছিল না টার্নারের, কিন্তু ও গুলি করায় মাথায় রক্ত উঠে গেল জলহস্তিটার, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল সে, ক্যাডিলাকের নাক তাক করল রানার দিকে। হঠাৎ দিক বদল করায় গুদামের একপাশের দেয়ালের সঙ্গে ঘষা খেল গাড়ির বনেট, উধাও হলো আরও কিছু ক্রোমস্ট্রিপ। সরবার সময় নেই, তাই ওয়ালথারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে হাইজাম্প দিল রানা, বনেটের সঙ্গে শেষমুহূর্তের সংঘর্ষ এড়াতে পারলেও উইণ্ডশিল্ডের সঙ্গে জোরে বাড়ি খেল ওর শরীরের একপাশ।

বনেটের ওপর অসহায়ের মত পড়ে আছে রানা, এবং ও ওভাবে পড়ে আছে বলে খুশি লাগছে টার্নারের, কারণ এখন ওর গাড়ি লক্ষ্য করে বুঝেশুনে গুলি চালাতে হবে পুলিশদের। এক্সিলারেটরের ওপর চাপ বাড়াতে গিয়েও গিয়ার বদলে গতি কমাতে হলো ওকে, তারপরও আরেকদিকের দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পারল না।

রানার চোখের সামনে পৃথিবী দুলছে, তারপরও বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে, দেয়ালের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হওয়ার আগেই দুই পা তুলে নিল বনেটের ওপর।

একসারিতে কয়েকটা গারবেজ ক্যান রাখা ছিল এদিকের দেয়ালের সঙ্গে, কানফাটানো আওয়াজ করে সবগুলো ছিটকে পড়ল ক্যাডিলাকের ধাক্কা খেয়ে। একটা ক্যান উড়াল দিল শূন্যে, পরে নেমে এল সোজা রানার মাথার ওপর, মাথা বাঁচাতে গিয়ে চোয়ালে জোরে বাড়ি খেল রানা। যাতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে না যায় সেজন্য ক্যাডিলাকের ওয়াইপার দুটো আঁকড়ে ধরল ও, ততক্ষণে হাজারটা তারা দেখছে চোখের সামনে। ধাতব কিছু একটা কোত্থেকে যেন উড়ে এল এমন সময়, অল্পের জন্য বেঁচে গেল রানা, কিন্তু বাঁচতে পারল না উইণ্ডশিল্ডটা--বাড়ি লেগে চিড় ধরল ওটার জায়গায় জায়গায়।

টার্নারের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। লোকটার রক্তলাল দু'চোখে আবেগের কোনও প্রকাশ নেই। সে-চোখ নিঃশব্দে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, পুলিশের ব্যারিকেড পার হতে পারলে খুন করবে সে রানাকে।

বাঁচার আকুতি প্রবল হলো রানার।

ডান হাতে ধরা ওয়াইপারটা ছেড়ে দিল ও, শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করল ওয়ালথার। একটা মুহূর্তের জন্য চোখ ছানাবড়া হলো টার্নারের, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুদ্ধি বের করে ফেলল সে--রানা যাতে গুলি করতে না পারে ওকে সেজন্য ক্যাডিলাকের স্টিয়ারিং একবার বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে, পরেরবার ডানে।

টার্নারকে গুলি করল না রানা, বরং ওয়ালথারের নল ক্যাডিলাকের বনেটে ঠেকিয়ে টান দিল ট্রিগারে। বুলেটের আওয়াজের পর পরই সেই শব্দের মতই দ্বিতীয় আরেকটা আওয়াজ শোনা গেল--কিছু একটা হয়েছে গাড়ির ইঞ্জিনে। হিস হিস শব্দ তুলে ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে বনেটের ঝাঁঝরিগুলো দিয়ে।

আরও দু'বার গুলি করল রানা, ক্ষতিগ্রস্ত হলো ফুয়েল ইনজেকশন আর ব্রেক ফ্লুয়িড রিযার্ভয়ার; স্টিয়ারিং-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারাল টার্নার। একদিকের দেয়ালের সঙ্গে কোলাকুলি করতে করতে ছুটছে ক্যাডিলাক এখন।

রানার বাঁ হাতে ধরা ওয়াইপারটা ভেঙে চলে এল, পিছলে পড়ে গেল ও বনেট থেকে রাস্তায়। জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে ওর শরীর, রক্ত বের হচ্ছে; চোয়ালের যে-জায়গায় গারবেজ ক্যানের বাড়ি খেয়েছে সে-জায়গা বিশ্রীভাবে ফুলে গিয়ে মানচিত্র বদলে গেছে চেহারার। রাস্তায় আছড়ে পড়ার সময় প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে বাঁ পায়ে আর বুকের বাঁ দিকে। দপদপ করছে মাথার পেছনটা, মনে হচ্ছে দশ ইঞ্চির আস্ত তিনটা ইট বেঁধে দেয়া

হয়েছে ঘাড়ের সঙ্গে।

দেয়ালের সঙ্গে কোলাকুলি শেষ হলো ক্যাডিলাকের, যক্ষ্মা রোগীর মত কয়েকবার কেশে উঠল সেটার ইঞ্জিন, তারপর পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত চলৎশক্তি হারাল। ঝড়ের গতিতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টার্নার, ঝড়ের গতিতেই পালাতে চাইল দৌড়ে, কিন্তু জলহস্তি কি চিতার গতিতে ছুটতে পারে?

হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রানার বুকের ভেতরে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তারপরও যখন চোখের কোনা দিয়ে দেখল পালাচ্ছে টার্নার, গড়ান দিয়ে সোজা হলো। ওয়ালথারটা যেন আপনাআপনি চলে এসেছে চোখের সামনে। 'থামো!' গলার সব শক্তি দিয়ে চেঁচাল ও টার্নারের উদ্দেশে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ছুটতে ছুটতেই নিজের পিস্তল বের করেছে টার্নার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, এবং পিস্তলটা তাক করল রানার দিকে।

দেরি করার মানে হয় না, তাই ট্রিগারে টান দিল রানা। একটাই বুলেট ছিল ওয়ালথারের চেম্বারে, ওটা দিয়েই কাজ হয়ে গেল।

এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টার্নার যে, দেখে মনে হলো রাস্তার ওপর উল্টে পড়ে গেল মদভর্তি একটা পিপা। উল্টোদিক থেকে তখন বাঁক ঘুরে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে একটা দুধের-ট্রাক, শেষমুহূর্তে একইসঙ্গে ব্রেক চেপে আর স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সংঘর্ষ এড়াতে চাইল ড্রাইভার, কিন্তু পারল না। মসৃণ রাস্তায় তীব্র ঘর্ষণের ফলে আর্তনাদ করে উঠল টায়ারগুলো, জীবনের প্রথম মানুষ-চাপা দেয়াটা যাতে দেখতে না হয় সেজন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল ড্রাইভার, পরমুহূর্তেই চাকার নীচে কিমা হয়ে গেল টার্নার। ওকে পিষে দিয়ে আরও কিছুদূর গেল ট্রাকটা, আকস্মিক ব্রেকের কারণে দু'দিক থেকে গড়িয়ে পড়ল দুটো

করে মোট চারটা দুধের কন্টেইনার। রাস্তার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে খুলে গেল সবক'টার মুখ, ওগুলো থেকে হড়হড় করে পড়ছে টাটকা দুধ।

যেহেতু বাসররাতের নববধূর মত মুখ ঢেকে বসে আছে ড্রাইভার, সেহেতু আরও কিছুদূর গেল ট্রাকটা, ধাক্কা দিয়ে বারোটা বাজাল একটা পুলিশ কারের, তারপর থেমে দাঁড়াল, যেন সে বিদ্রোহী রণক্লান্ত।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা, তাকিয়ে আছে টার্নারের দিকে। ভর্তা হয়ে যাওয়া লোকটাকে চেনার উপায় নেই।

পৃথিবীটা আবার দুলতে শুরু করেছে রানার চোখের সামনে। "ধূমায়িত" ক্যাডিলাকটাকে ভুল করে নিজের গাড়ি ভেবে হাঁটা ধরল সেটার উদ্দেশে, কিন্তু চার-পাঁচ পা'র বেশি যেতে পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তায়।

জ্ঞান হারানোর আগে দেখল, কয়েকজন পুলিশ অফিসার ছুটে আসছে ওর দিকে, সবার আগে শায়লা। রাজ্যের উদ্বেগ ভর করেছে মেয়েটার চেহারায়।

বাইশ

ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে বাঁ পায়ে, বুকটাও বাদ যায়নি। হাসপাতালের স্টেইনলেস স্টীলের খাটে বসে আছে রানা। পাশেই একটা টুলে বসে আছেন বয়স্ক এক আফ্রিকান-আমেরিকান ডাক্তার, অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশন দিয়ে পরিষ্কার করছেন রানার কপালের

একটা ক্ষত। হাতের পাশাপাশি মুখটাও সমানে চলছে ডাক্তার সাহেবের, এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছেন তিনি রানার সঙ্গে, আসলে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন ওকে।

'ট্রাকচাপা পড়ে মরেছে টার্নার,' বলছেন ডাক্তার, 'খুব ভালো হয়েছে। ওর মত লোকের এ-রকম মরণই প্রাপ্য।' একটু জোরে ডলা দিলেন রানার কপালের ক্ষতে। 'তোমার কৃতিত্বও কম নয়, ইয়াং ম্যান।'

'উফ্ফ্, আস্তে!' মৃদু আপত্তি জানাল রানা। 'ব্যথা পাচ্ছি।'

'ব্যথা? যদি ঠিকমত কাজ করতে না দাও, এই ব্যথা যে কী পরিমাণ বাড়তে পারে, কল্পনাও করতে পারবে না। চুপচাপ বসে থাকো, বেশি নড়াচড়া কোরো না। ...তোমার নায়কোচিত ঘটনার বর্ণনা শুনলাম একজনের কাছ থেকে। হলিউডি ছবির অ্যাকশন আর কাকে বলে? হলওয়েতে দেখেছি টার্নারকে।'

'টার্নারকে দেখেছেন! তারমানে মরেনি লোকটা?'

'ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভর্তা হওয়ার পরও একটা মানুষের না মরে উপায় আছে? আমি বোঝাতে চেয়েছি, মর্গের হলওয়েতে দেখেছি লোকটাকে। এমন মরা মরেছে যে, অলৌকিক কোনও উপায়েও আর প্রাণ ফিরে পাবে না।'

মুচকি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। 'একটু তাড়াতাড়ি করুন। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

'সব ভুলে যাও, বাছা। আর ঠিকমত কাজ করতে দাও আমাকে। অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশন লাগাতে হবে আরও কমপক্ষে দশ জায়গায়। ঈশ্বর জানে গাড়ি থেকে পড়ার সময় কীসের ওপর ল্যাণ্ড করেছে তোমার বাঁ পা, একজায়গায় কেটে গেছে অনেকখানি; প্রথমে এটিএস, পরে অ্যানেস্থেটিক ইনজেকশন দিয়ে সেলাই করতে হবে জায়গাটা। সুতরাং যেভাবে বসে আছ সেভাবেই বসে থাকো। আপাতত আর কোনও কাজ নেই

তোমার।'

নিয়তির বিধান আর ডাক্তারের ছুরির কাছে সবাই অসহায়, তাই আর কিছু বলল না রানা। সময় নিয়ে ওর সবগুলো ক্ষতের ওপর অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশন লাগালেন ডাক্তার, তারপর ইনজেকশন দুটো পুশ করে সুঁই-সুতো নিলেন হাতে। সেলাইয়ের কাজ চলছে, এমন সময় বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় খুলে গেল কেবিনের দরজা, সেটার কাছে একটা টুলে বসে থাকা বেচারী নার্স পড়ে গিয়েছিল আরেকটু হলে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল হেইডন, ভ্রূ কুঁচকে আছে। ওর ঠিক পেছনেই ক্যাপ্টেন ডোনাল্ড পিয়ার্স। ক্যাপ্টেনকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর যত দুশ্চিন্তা আছে সব যেন একসঙ্গে ভর করেছে তাঁর মাথায়। দু'জনের পরনেই পাতলা সামার স্যুট, টাইয়ের নট ঢিলা করে রেখেছেন দু'জনই, খুলে রেখেছেন কলারের বোতাম।

আঙুল তুলে রানাকে দেখাল হেইডন, ডাক্তার সাহেবকে বলল, 'ওর নিশ্চয়ই আর থাকার দরকার নেই এখানে?'

কাজ থামিয়ে হেইডনকে আপাদমস্তক দেখলেন ডাক্তার। 'বুঝলাম।'

আরও কুঁচকে গেল হেইডনের ভ্রূ। 'কী বুঝলেন?'

'যে হাসপাতালে কাজ করেন আপনি, সেটা খুবই নিম্নমানের। তা না হলে গুরুতরভাবে আহত এই ইয়াং ম্যানের ব্যাপারে বলতে পারতেন না কথাটা।'

'আমি ডাক্তার নই, পুলিশ।'

'তা হলে, বলতে খারাপই লাগছে, আপনি একজন নির্দয় পুলিশ। যদি বলেন তা হলে এখনই রিলিয করে দিতে পারি আপনার লোককে, কিন্তু হাসপাতাল ছাড়ার আগেই যদি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় সে তা হলে সব দোষ আপনার।'

আর কিছু বলল না হেইডন, বলতে পারল না আসলে, আড়চোখে তাকাল ক্যাপ্টেন পিয়ার্সের দিকে।

আগে বাড়লেন ক্যাপ্টেন, ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পরিস্থিতি ভালো না। এর আগে একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করা হয়েছে, আর আজ সকালে টার্নারকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে মারা পড়েছে আরেকজন। ওপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে করতে আমার জানটা উঠে এসেছে গলায়।'

সুপিরিয়রের সমর্থন পেয়ে তেজ বাড়ল হেইডনের, রানার দিকে তাকাল। 'যদি ভুল না হয় আমার, তোমাকে সার্চ ওয়ার‍্যান্ট দিয়ে পাঠিয়েছিলাম টার্নারের ওখানে। কথা ছিল ভেতরে ঢুকবে তুমি, টার্নার বেশি তেড়িবেড়ি করলে গ্রেপ্তার করবে ওকে। সেসবের বদলে হিরোগিরি দেখালে, ওদের পাঁচ আর আমাদের এক, মানে মোট ছ'জন চলে গেছে পরপারে। বলো, কে তোমাকে একইসঙ্গে বিচারক, জুরি আর জল্লাদ হতে বলেছে? গড্যামইট!'

হেইডনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে উল্টোদিকে শূন্য দেয়ালটার দিকে তাকাল রানা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'টার্নারের মত সাতাশটা খুনের একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা মুখের কথা নয়।'

'শেখাতে এসো না আমাকে, বুঝলে? তোমার চেয়ে কম জানি না আমি। আসল কথাটাই ভুলে গেছ? প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও মানুষই অপরাধী নয়। আদালত যাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে, তাকে ক্রিমিনাল বলার তুমি কে? সিরিয়াল কিলিংগুলো নিয়ে এমনিতেই নাজেহাল অবস্থা আমাদের, তার ওপর সামান্য এক সার্চ ওয়ার‍্যান্টের জোরে মিলিটারি অপারেশন চালিয়ে এলে টার্নারের গুদামে! আসলে তোমার মত একটা মাথামোটা আর ঘাড়ত্যাড়া আপদকে এলএপিডিতে ঢোকানোটাই ভুল হয়েছে। শুধু ভুল না, মস্ত বড় ভুল।'

দেয়ালটার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে রানা, হেইডনের কথাগুলো শুনেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। নিচু গলায়, অনেকটা ফিসফিস করে আবেগহীন কণ্ঠে বলল, 'যে বা যারা আগে গুলি চালিয়েছে আমার ওপর, আমি শুধু তাদেরকেই গুলি করেছি।'

কিন্তু কথাটা কান এড়াল না ঘরের কারোরই। চেহারা বিকৃত করে, বিরক্ত কণ্ঠে পিয়ার্স বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনার গুলি করার ফলে এখন কী হবে জানেন? আগামী তিন মাস ধরে চিঠি চালাচালি করতে হবে আমাকে ওপরওয়ালাদের সঙ্গে, জবাবদিহির পর জবাবদিহি করতে হবে। এখানে আসার আগে মিটিং করতে হয়েছে এলএপিডি'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, কেসটার দৃশ্যমান কোনও উন্নতি না হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন তিনিও। ...টার্নারের ওখানে আসলে কী হয়েছিল তা তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সে-কমিটি যদি আপনার বিরুদ্ধে নেগেটিভ কোনও রিপোর্ট দেয়...' ঠোঁট উল্টিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি।

'যে বা যারা আগে গুলি চালিয়েছে আমার ওপর, আমি শুধু তাদেরকেই গুলি করেছি,' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথাটা আবার বলল রানা।

কিন্তু একই কথা বার বার শুনতে নারাজ পিয়ার্স, অন্তত এ-রকম পরিস্থিতিতে। প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন তিনি রানার ওপর। আরেকদিকে তাকিয়ে থাকায় সেটা দেখতে পেল না রানা। কিছুক্ষণ ওভাবেই তাকিয়ে থেকে, যেভাবে ঝড়ের গতিতে ভেতরে এসেছিলেন সেভাবেই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

পিয়ার্সের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিল হেইডন, ঘুরে রানার দিকে তাকাল। 'কার্সন ওভাবে মরল কেন জবাব দাও। তবে তার আগে সাবধান করে দিচ্ছি, একটা ফালতু কথাও বলবে না।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গুদামের সদর-দরজার

দিকে এগিয়ে গিয়েছিল কার্সন। নিজের পরিচয় দিয়ে দেখা করতে চাচ্ছিল টার্নারের সঙ্গে। বলেছিল, ওর কাছে ওয়ার‍্যান্ট আছে। কিন্তু কোনও সুযোগ দেয়নি ওরা, ভেতর থেকে গুলি চালাতে আরম্ভ করে। প্রথম শটেই মারা পড়ে কার্সন।' দেয়ালের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হেইডনের দিকে তাকাল। 'হঠাৎ করে গুলি চালায়নি ওরা, বরং ঘটনাটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল।'

'কী ছিল?'

'তুমি আসলেই কালা, হেইডন।'

'বাজে বকতে মানা করলাম না?' ধমক দিল হেইডন।

'ওরা জানত আমরা যাচ্ছি। কেউ জানিয়ে দিয়েছে টার্নারকে।'

'হ্যাঁ, সে-লোক তো তোমার শালা লাগে, আর তুমি ওর দুলাভাই, এজন্য টার্নারকে জানানোর পর তোমাকে বলেছে, সব ফাঁস করে দিয়েছি। ঠিক না?'

"উভয়পক্ষের" বাক্য বিনিময় শুনছিলেন ডাক্তার, একইসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। রানার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, লম্বা করে দম নিলেন।

তাঁকে বিষদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে রানার দিকে তাকাল হেইডন, ছোবল দেয়ার আগে শিকারকে সম্ভবত এ-দৃষ্টিতেই দেখে রাজগোখরা। 'অনেকবার বলেছি তোমাকে, আজ শেষবারের মত বলছি। সবজান্তার ভাব বাদ দাও। তোমার এত ভাব অন্য কাউকে দেখিয়ো, আমাকে না। আর...ওই বুলেটটা দাও আমাকে।'

'কোন্ বুলেট?' নিরীহ গলায় বলল রানা, নিরীহ দৃষ্টিতে তাকাল হেইডনের দিকে।

'ওই, শালা...' মুখ খারাপ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হেইডন। 'কোন্ বুলেট তুমি বোঝো না? দুদু খাও? নাকি

নাটক করো?'

'যেটা থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি আমি, সেটার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হচ্ছ কেন?'

'সিদ্ধান্তে আসতে পারোনি মানে?'

'আরেকবার ল্যাবে গিয়েছিলাম আমি, ক্রসচেক করেছি আবারও। নিশ্চিত হয়েছি, দুই বুলেটের রাইফ্লিং টুইস্ট দুই রকম। ...তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল হেইডন, তারপর হো হো করে হাসল। 'বোকা ঠাওরেছ আমাকে, না? তোমার চোখে আমি একটা খোকাবাবু, আমার হাতের মোয়া নিয়ে খেলবে তুমি, আর আমি মজা পেয়ে হাততালি দেব। তা-ই তো?'

'তোমার হাতের মোয়া?'

'হ্যাঁ, আমার হাতের। যে-বুলেটটা দেখিয়েছিলে, সেটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, তোমার বাপের না। এলএপিডি'র ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট হিসেবে আদেশ করছি, বুলেটটা হস্তান্তর করো।'

'না।'

'তা হলে তদন্তে অসহযোগিতা এবং আলামত গোপন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করব তোমাকে।'

এবার রাজগোখরার দৃষ্টিতে তাকাল রানা। কিন্তু একটুও ভয় পেল না হেইডন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হাত বাড়িয়ে দিল রানা, বিছানার পাশে একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলে থাকা ওর প্যান্টটা নিল। সামনের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল, কিছুক্ষণ হাতড়ে বের করে আনল চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া একটা বুলেট। জিনিসটা ছুঁড়ে মারল হেইডনের দিকে, ওটা গিয়ে লাগল লোকটার বুকে।

'এই নাও,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'বড়িটা দু'টুকরো করে সকাল-বিকেল পানি দিয়ে গিলে খেয়ো। অনেক উপকার পাবে।

হজমে সমস্যা থাকলে দূর হবে, কানে ভালো শুনতে পারবে এর পর থেকে, হাইপারমেট্রোপিয়াও কেটে যাবে আশা করি।'

হা হা করে হেসে ফেললেন ডাক্তার, রানার কথায় মজা পেয়েছেন।

বুলেটটা লুফে নিয়েছে হেইডন, মুঠো করে ধরে আছে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে তার, কথার মাধ্যমে বোমাবর্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু কী ভেবে সিদ্ধান্ত বদলাল, ঘুরে কালবৈশাখীর গতিতে হাঁটা ধরল দরজার দিকে, বেরিয়ে যাওয়ার আগে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

রানার দিকে একইসঙ্গে কৌতুক আর করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তার। 'ইয়াং ম্যান, বুঝতে পারছি ঝামেলার মধ্যে আছ তুমি। আমার উপদেশ শোনো, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ো। কষে একটা ঘুম লাগাও। যখন জাগবে তখন দেখবে, শরীরের অনেক জায়গার ব্যথা কমে গেছে, মনটাও হালকা লাগছে। মানুষের মন যখন হালকা থাকে, যে-কোনও সমস্যার সমাধান করাটা তখন সহজ হয় তার জন্য। ...একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

দেয়ালটার দিকে আবারও তাকিয়ে ছিল রানা, কথাটা শুনে ঘাড় ঘুরাল।

'তোমার বয়স আছে, শরীরে স্ট্যামিনা আছে। শুধু শুধু পুলিশে চাকরি করার দরকার কী? অন্যকিছু করতে পারো না?'

'না, পারি না। ...আপনিই বা এই বয়সে আমার মত হাতভাঙা-পাভাঙা লোকদের পরিচর্যা করছেন কেন? প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন না?'

'প্রাইভেট প্র্যাকটিস?' করুণার হাসি হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। 'একটা চেম্বার খুলতে কত টাকা লাগে জানো? মাঝেমধ্যে মনে হয়, পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তার না হয়ে দর্জি

হলে ভালো করতাম। ঝামেলা বলে কিছু থাকত না জীবনে।'

'আছেন কেন এই হাসপাতালে? অন্য কোথাও...'

'আমার বাবা পুলিশ ছিলেন। হয়তো সে-কারণেই...'

'ছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'ডাকাত পড়ল আমাদের পাশের বাড়িতে, সবার আগে ঠেকাতে গেলেন বাবা। গুলিটাও খেলেন সবার আগে। হাসপাতালে নেয়ার আগেই...। আমি তখন টিনএজার, একটা চিন্তা কেন যেন পেয়ে বসল আমাকে, যদি হাসপাতালে নিতে পারতাম বাবাকে তা হলে হয়তো বাঁচানো যেত। তাই ডাক্তারি পাস করার পর ডানে-বাঁয়ে না দেখে ঢুকে গেলাম পুলিশে। সেই থেকে আছি এখানেই, তোমার মত হাতভাঙা-পাভাঙাদের পরিচর্যা করে যাচ্ছি।'

'জীবন,' দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল রানা।

এমন সময় দরজাটা খুলে গেল আবার, রাজ্যের দুশ্চিন্তা চেহারায় নিয়ে উঁকি দিল এক নার্স। 'ডাক্তার, ইমারজেন্সি একটা অপারেশন করতে হবে। এক পুলিশ অফিসারের অ্যাপেণ্ডিক্স ফেটে যাচ্ছে।'

চলে যেতে গিয়েও ঘুরে তাকালেন ডাক্তার। 'আমার কথায় কিছু মনে কোরো না।'

মাথা নাড়ল রানা, বুঝিয়ে দিল কিছু মনে করেনি।

নার্সকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার।

রানা এখন একা। তেজহীন ফ্লুরোসেন্ট লাইটটা কিছুক্ষণ দেখল ও, তারপর শরীরের সব ব্যথা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নামল খাট থেকে।

প্যান্ট পরছে।

তেইশ

বাইরে গিয়েছিল শায়লা, করিডোর ধরে ফিরে আসছিল, কেবিনের দরজা খুলে রানাকে বের হতে দেখে চমকে উঠল ভূত দেখার মত। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর, ঝুলে পড়ল মুখ। 'ঈশ্বর! ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই জাদুকরী ওষুধ দিয়েছেন? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রাণ ফিরে পেয়েছে একটা মমি।'

'চলো তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি এখান থেকে,' বলল রানা, ওকে কেমন দেখাচ্ছে-না দেখাচ্ছে সে-ব্যাপারে কোনও আগ্রহ বোধ করছে না। শায়লাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটা ধরল লিফটের দিকে।

নীচে নেমে রাস্তায় চলে এল ওরা, পার্কিংলটের দিকে এগোচ্ছে। গাড়িতে ওঠার আগে কোনও কথা হলো না দু'জনার।

ড্রাইভিং সিটে, স্বাভাবিকভাবেই, বসল শায়লা। লম্বা করে দম নিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'মাসুদ ভাই, একটু আগে আপনার কেবিনে যখন যাচ্ছিলাম, মিস্টার হেইডনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে মানে, দূর থেকে লোকটাকে দেখেছি, তিনি সম্ভবত খেয়াল করেননি আমাকে। যা-হোক, মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন, ভঙ্গি দেখে মনে হলো ভীষণ চটেছেন। আপনার নাম উচ্চারণ করতে শুনলাম, টুকরো টুকরো দু'-একটা কথাও কানে এল, বুঝলাম আপনার ওপর খুব বিরক্ত তিনি।'

'সে কবে আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিল?' ব্যাণ্ডেজ করা পা-টা নিয়ে

বসতে অসুবিধা হচ্ছে রানার, লিভার টেনে সিটটা কিছুটা পিছিয়ে নিল।

গাড়ি স্টার্ট করল শায়লা, রিয়ারভিউমিররটা চেক করে রওয়ানা হলো। ধীরেসুস্থে চুপচাপ ড্রাইভ করল কিছুক্ষণ। ট্রাফিক সিগনালে থামল একটু পর, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো,' আরাম করে হেলান দিয়েছে রানা, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, 'আমি জ্ঞান হারানোর পর নিশ্চয়ই টার্নারের গুদামে ঢুকেছিল ওরা?'

'হ্যাঁ, ঢুকেছিল।'

'কী পেল?'

করুণার হাসি হাসল শায়লা। 'একসময় আমেরিকান সরকার জোর গলায় বলেছিল, ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে সাদ্দাম হোসেনের কাছে, কোনও কোনওটা নাকি পারমাণবিক, কিন্তু ইরাক দখল করার পর সে-রকম কিছু কি পাওয়া গেছে?'

যা বুঝবার বুঝে নিল রানা।

'একগাদা প্যাকেট করা ইটালিয়ান খাবার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি টার্নারের গুদামে,' বলে চলল শায়লা। 'অস্ত্র আর মাদকব্যবসায়ী হিসেবে ওর পরিচয় দেয়া হয়েছে আমাদের কাছে, যদি তা হয়ও, নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আলাদা গুদাম আছে ওর। ...আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, সে জানত আমরা যাচ্ছি।'

'তা হলে গুলি করতে শুরু করল কেন?'

'হয়তো...আমাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। হয়তো ভেবেছে, পুরোটাই ওর জন্যে একটা ফাঁদ। পুলিশের ইউনিফর্ম পরে খুন করছে আমাদের সিরিয়াল কিলার; হয়তো ভেবেছে, খুনিটাই গেছে ওর ওখানে, দরজা খোলামাত্র গুলি করে মারবে ওকে।'

'ঠিক।'

সবুজ বাতি জ্বলেছে, আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল শায়লা। 'ঠিক মানে?'

'মানে আসলেই আমাদের যাওয়ার খবর জানিয়ে দেয়া হয়েছে টার্নারকে।'

'সত্যিই?'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কথাটা দুঃখজনক হলেও সত্যি। কেউ একজন, লোকটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টেরই, জেনে-বুঝেই করেছে কাজটা। যা ঘটে গেছে টার্নারের ওখানে, এখন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য লাগছে আমার কাছে।'

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে আরেকহাতে কপাল চুলকাল শায়লা। 'এই কেসে আর কতবার এ-রকম আশ্চর্য হতে হবে কে জানে!'

'আশ্চর্য, না? তা হলে আরও কিছু কথা বলি, শুনে দেখো কেমন লাগে তোমার কাছে। আমার ধারণা আমাদের সিরিয়াল কিলার একজন নয়, একাধিক। এবং ওরা এলএপিডি'রই লোক, নিয়োগ পেয়েছে বেশিদিন হয়নি।'

সামনের গাড়ি ব্রেক করেছে, রানার কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল শায়লা, আরেকটু হলে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল গাড়িটার সঙ্গে, শেষমুহূর্তে ব্রেক করল। নিজেকে সামলে নিয়ে ইণ্ডিকেটর জ্বালাল, রাস্তার মাঝখান থেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে আনল গাড়ি, একধারে পার্ক করল। 'এসব কী বলছেন, মাসুদ ভাই?'

জবাব না দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া একটা বুলেট বের করল রানা, বাড়িয়ে ধরল শায়লার দিকে।

বুলেটটা হাতে নিল শায়লা, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কী বোঝাতে চাচ্ছে রানা তা-ও বুঝতে পারছে না।

‘কোত্থেকে পেয়েছি ওটা জানতে চাইবে না?’

‘কোত্থেকে?’

‘টার্গেট রেঞ্জ।’

ভ্রূ আরও কোঁচকাল শায়লা। ‘কার হ্যাণ্ডগানের?’

‘সানির। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন, সার্ভিস রিভলভার। ক্যাভিস হ্যারিংটনের শরীর থেকে যে-বুলেটগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোর সঙ্গে পার্ফেক্টলি ম্যাচ করেছে বুলেটটা।’

কিছু বলছে না শায়লা। ওর কোঁচকানো ভ্রূ স্বাভাবিক হয়ে গেছে ওর অজান্তেই। অবিশ্বাস্য সত্যিটা নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করছে ওকে রানার দিকে। এবং অপলকে তাকিয়ে থাকার কারণেই হয়তো, আরও সুন্দর লাগছে ওকে।

কিছুক্ষণ চোখের পলক ফেলল না রানাও, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। ‘হয়তো অনুমান করতে পারছ আমাদের সিরিয়াল কিলার কারা, তারপরও বলছি নামগুলো। সানি ডানহিল, ডেল কার্সন, জনাথন রিডক্স আর জর্জ হেল্ডন। এদের মধ্যে কার্সন পটল তুলেছে, বাকি আছে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, নেতৃত্ব দিচ্ছে সানি।’

‘কিন্তু, মাসুদ ভাই,’ এতক্ষণে কথা জোগাল শায়লার মুখে, ‘কীভাবে প্রমাণ...’

‘তোমার হাতের বুলেটটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।’

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল শায়লা। ‘অসম্ভব। অবাস্তব। যে-ই শুনবে সে-ই বলবে, অতিকল্পনা।’

‘কিন্তু ঘটনাটা সম্ভব। যা ঘটছে তা বাস্তব। এবং আমি জানি আমার কল্পনা মোটেও অতিকল্পনা নয়।’

‘কিন্তু...কেন করবে ওরা এ-রকম? আইন রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর, তারা কেন আইন তুলে নেবে নিজেদের হাতে?’

‘কারণ ওরা মনে করছে, সাজা দেয়ার দায়িত্ব যাদের, তারা ঠিকমত করছে না বা করতে পারছে না কাজটা। তাই টার্নারের

মত সাতাশটা খুনের আসামিও বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে বার বার, মার্টিন বেকারের মত ক্রিমিনাল বুক ফুলিয়ে নেমে আসছে আদালতের সিঁড়ি দিয়ে। বেশ্যার দালালরা খুন করছে বেশ্যাদের, বেপরোয়া হয়ে গেছে ড্রাগডিলাররা। তাই যে-কোনও কারণেই হোক আমাদের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ভাবছে, ওরাই বিচারক, ওরাই জুরি এবং ওরাই জল্লাদ। ভাবছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যখন ওদের ওপর, তখন যে-কোনওভাবে সে-দায়িত্ব পালন করতেই হবে ওদেরকে, এবং সে-অধিকার ওদের আছে। পুরো ব্যাপারটা যতটা না যৌক্তিক তারচেয়ে বেশি নৈতিক হয়ে গেছে ওদের কাছে। তাই আদালত যাদেরকে বেকসুর খালাস দিচ্ছে, তাদেরকে ওরা প্রাণদণ্ড দিতে দ্বিধা করছে না। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আসলে, তাই মনে করছে ওরাই যথেষ্ট, এ-শহরে রানা এজেন্সির কোনও দরকার নেই।'

চুপ করে আছে শায়লা, রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কী যেন। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হাসপাতালে আপনার কেবিন থেকে যখন বেরিয়ে এলেন মিস্টার হেইডন, তাঁর হাতে একটা বুলেট দেখেছি আমি, মোবাইলে কথা বলার সময় ওটা নিয়ে লোফালুফি করেছেন তিনি কয়েকবার...'

'ওটা?' মুচকি হাসল রানা। 'ওটা নকল।'

'মানে?'

'হেইডনকে ব্যালিস্টিক ল্যাবে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি, তোমার হাতে যে-বুলেট আছে সেটার সঙ্গে হ্যারিংটনের মৃতদেহ থেকে পাওয়া বুলেটের ক্রসম্যাচিংটা দেখানোর জন্য। দেখল সে, কিন্তু বলল, বুলেট দুটো পার্ফেক্টলি ম্যাচ করেছে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওর। এই প্রমাণ যদি আদালতে উপস্থাপন করা হয় তা হলে নাকি ধোপে টিকবে না। তখনই জানতাম, ওর যে-রকম খাসলত, নিজের কৃতিত্ব জাহির করার

জন্য যে-কোনওভাবেই হোক বুলেটটা বাগানোর চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে। তাই একটা নকল বুলেট জোগাড় করে রেখেছিলাম।'

'কী করবেন তিনি ওটা দিয়ে?'

'ওর যা খুশি করুক। দরকার হলে পাটা-পুতায় বেটে চাটনি বানিয়ে খাক, আমার কী?'

হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল শায়লা। 'এই বুলেটটা যখন দেখালেন তাঁকে, কোত্থেকে পেয়েছেন বলেননি?'

'না। সে চাপাচাপি করেছিল, আমি এড়িয়ে গেছি।'

'নকলটা পাওয়ার সময়ও কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

'পেয়েই তো ছুট লাগাল খ্যাপা ষাঁড়ের মত, জিজ্ঞেস করবে কোন্ সময়?'

'লোকটা ভীষণ রগচটা। অল্পতে বেশি খেপে যায়। আসলে...একতরফাভাবে দোষও দেয়া যায় না তাকে। ওপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে করতেই তার দফারফা। তার পেছনে তো পারলে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে থাকেন মিস্টার ডোনাল্ড পিয়ার্স।'

'শুটিং রেঞ্জ থেকে সানির স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনের যে-বুলেট পেয়েছি, সেটার সঙ্গে পুরোপুরি ম্যাচ করেছে হ্যারিংটনের মৃতদেহ থেকে পাওয়া বুলেট। এবং হ্যারিংটন যেদিন যে-সময়ে যে-জায়গায় মারা গেছে, একই দিনে একই সময়ে একই জায়গায় মারা গেছে ক্যাভেনডিশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ। আমার ধারণা লোকটাকে খুন করে কেটে পড়ার ধান্দায় ছিল সানি, হ্যারিংটনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওর, তখন হয়তো ওকে চিনে ফেলে হ্যারিংটন, অথবা বাধা দিতে যায়, এবং গুলি খেয়ে মরতে হয় বেচারাকে। আমার দুর্ভাগ্য, কথাটা বুঝতে দেরি হয়ে গেছে, তা না হলে ক্যাভেনডিশের মৃতদেহ থেকে যে-বুলেটগুলো পাওয়া

গেছে সেগুলোও ক্রসম্যাচ করে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারতাম।'

'কেন? ওই বুলেটগুলো কোথায়?'

'এফবিআইকে খবর দেয়া হয়েছে, আলামত হিসেবে বুলেটগুলো নিয়ে গেছে ওরা, ওদের ল্যাবে পরীক্ষা করবে।'

কিছু বলল না শায়লা।

রানা বলে চলল, 'আমার ধারণা মার্টিন বেকারকেও পরপারে পাঠিয়েছে সানি। সেই হিসাবে আমাদের এজেন্ট জনির খুনিও সে-ই। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সিরিয়াল কিলিং শুরু হওয়ার পর থেকে এতগুলো খুন একা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ খুনগুলো কোথায় কখন হয়েছে সেটার খসড়া হিসেব করেছি, আমাদের ফোর মাস্কেটিয়ার্স সেই সময় কে কোথায় ডিউটিতে ছিল তারও খোঁজ নিয়েছি। সবগুলো খুনের সঙ্গে জড়ানো যায়নি সানিকে, তবে ওর বন্ধুদের কাউকে না কাউকে জড়ানো গেছে। তখন থেকেই ওই চারজনকে সন্দেহ আমার।'

'বুঝলাম। কিন্তু আজ টার্নারকে ফোন করল কে? আপনি বলছেন পালের গোদা সানি, যদি তা-ই হয়, সাধ করে কি মরতে গিয়েছিল সে?'

'টার্নারকে ফোন করেছে রিডক্স বা হেল্ডন--যে-দু'জন যায়নি আমাদের সঙ্গে। আর সাধ করে মরা? বাজি ধরে বলতে পারি, সানি বা কার্সন কল্পনাও করেনি পুলিশ এসেছে শুনেই গুলি করবে টার্নাররা। ওরা সম্ভবত ফাঁদ পেতেছিল আমার জন্য--চেয়েছিল গোলাগুলি হোক এবং তাতে মারা পড়ি আমি। আসলে টার্নারকে অথবা আমাকে গুলি করে মারার জন্যে একটা বাহানা চেয়েছিল ওরা।'

'কিন্তু...কার্সন নিজেই তো...'

'ওই যে বললাম, কল্পনাই করেনি ওরা। আবার হতে পারে, স্যাক্রিফাইস করা হয়েছে তাকে।'

'ঈশ্বর!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা শায়লার দিকে। মেয়েটা কথায় কথায় স্রষ্টাকে ডাকে, অদৃশ্য কারও কাছ থেকে সাহস বা ভরসা পেতে চায় সম্ভবত। 'এতক্ষণ যা বললাম তোমাকে, তা যদি সঠিক হয়, স্যাক্রিফাইস করা হবে আমাকেও। ইচ্ছা হলে লিখে রাখতে পারো কথাটা।'

'মাই গড! মাসুদ ভাই, আমার মনে হয় এসব বেশি হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য। এসব বাদ দিয়ে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়ার আগে মনে রেখো, আমরা পারব ভেবেই কাজটার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদেরকে, তা না হলে এলএপিডিতে হোমিসাইড ডিটেকটিভের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। তাছাড়া জনি ছিল আমাদের লোক, ওর মৃত্যুর দিকে পিঠ ফেরাতে পারি না। যা-হোক, চেষ্টা করব যাতে না হয়, তবু যদি কিছু হয়ে যায় আমার, সোজা ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডের কাছে ইস্তফা দিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেয়ো।'

কেমন আনমনা মনে হচ্ছে শায়লাকে। 'যদি...আমাদের দু'জনেরই কিছু হয়ে যায়? ওরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি, যদি একসঙ্গে হামলা চালায় আমাদের ওপর?'

'তা হলে একসঙ্গে প্রতিরোধ করব আমরা। সফল হলে বেঁচে থাকব, না হলে...' হাসল রানা, 'একসঙ্গে চলে যাব পরপারে, তুমি জায়গা পাবে বেহেস্তে; আমাকে পাঠানো হবে...'

'আবার এখানে, নতুন আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে,' বলেই সিটে হেলান দিল শায়লা, চেহারায় অসহিষ্ণুতার ছাপ।

রানা বলল, 'আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। আগামীকাল সকালে এসে তুলে নিয়ো আমাকে।'

আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল শায়লা।

সিটে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল রানা। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, না? একটা অর্গানাইযেশনের ভেতরে সাবঅর্গানাইযেশন গড়ে তুলেছে ওরা। ওদের উর্দির কারণে ওদেরকে সন্দেহই করবে না কেউ, কিংবা করলেও সবার পরে করবে। ইউনিফর্মই ওদের সবচেয়ে বড় আড়াল। এ-রকম একটা অর্গানাইযেশনের কথা শুনেছিলাম কয়েক বছর আগে। আর্জেন্টিনায় গড়ে উঠেছিল দলটা, বিচারবহির্ভূত উপায়ে একে একে খতম করে দিচ্ছিল চিহ্নিত অপরাধীদের।'

কিছু বলল না শায়লা, আনমনা হয়ে পড়েছে।

আর কোনও কথা হলো না। চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে রানার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর নীচে এসে থামল শায়লা।

'ঠিক আছে, নামি তা হলে। সাবধানে থেকো।'

'মাসুদ ভাই?'

পিছু ডাক শুনে নামতে গিয়েও নামল না রানা, ঘুরে তাকাল শায়লার দিকে। বুলেটটা বাড়িয়ে ধরে আছে। নিজের অজান্তেই নিল রানা ওটা। 'কী ব্যাপার, শায়লা?

'আসলে...একটা কথা বলব কি না ভাবছিলাম।'

ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'কী কথা?'

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে শায়লা। 'আসলে...'

শায়লার চেহারাটা ভালোমত দেখল রানা। 'ঠিক আছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল শায়লা।

'কোনও সমস্যা?'

মাথা নাড়ল শায়লা, ঢোক গিলল। কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে ড্যাশবোর্ড খুলল, মুখবন্ধ একটা এনভেলপ বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। শুকিয়ে আসা ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বলল, 'রানা এজেন্সি থেকে আমার রেযিগনেশন লেটার।'

'রেযিগনেশন লেটার!' তাজ্জব হয়ে গেছে রানা। 'কী বলছ?'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই,' লম্বা করে দম নিল শায়লা। 'ইস্তফা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'শায়লা, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন রিযাইন করছ তুমি? কী হয়েছে হঠাৎ?'

'আমার চিঠিতে সব লেখা আছে। কিন্তু দয়া করে আমার সামনে পড়বেন না ওটা। এখন ঘরে গিয়ে নিশ্চয়ই বিশ্রাম নেবেন? সুযোগ করে একসময় পড়লেই হবে।'

থতমত খাওয়া দৃষ্টিতে এনভেলপটার দিকে তাকাল রানা।

'আরেকটা কথা।'

চোখ তুলে শায়লার দিকে তাকাল রানা।

'আপনি কখনও যাননি আমার বাসায়, আমিও যেতে বলিনি আসলে। আজ যদি...ডিনারে ইনভাইট করি আপনাকে, আসবেন?'

আবারও ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'হঠাৎ ডিনার কেন, শায়লা?'

'না, ভাবলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলেই তো যাচ্ছি, কখনোই ভালোমন্দ কিছু খাওয়ানো হয়নি আপনাকে, আজ না হয়...' রানাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবারও ঢোক গিলল শায়লা। 'যদি কিছু মনে না করেন।'

'কী যে মনে করব সেটাই বুঝতে পারছি না। ভেবেছিলাম জরুরি একটা কাজ সারব, তোমার কথা শুনে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি আমার কোনও কথায় বা কাজে...'

'না, না, একটুও না। আসলে...চিঠিতে লেখা আছে সব, একটু কষ্ট করে পড়ে নিলে ভালো হতো।'

'ইস্তফা যে দিচ্ছ, এলএপিডি'র টেম্পোরারি চাকরিটার কী হবে?'

'ভেবেছিলাম এলএপিডি'র চাকরিটা শেষ হলে ইস্তফার

চিঠিটা দেব। কিন্তু একটু আগে আমাদের পরিণতি কী হতে পারে সেটা যখন বললেন, সিদ্ধান্ত বদল করলাম। কখনও কখনও কিছু কথা আগেভাগেই জানিয়ে রাখা উচিত,' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল শায়লা। 'পরে যদি সুযোগ পাওয়া না যায়?'

'কিন্তু...লেটারটা তোমার ড্যাশবোর্ডে ছিল। তারমানে টার্নারের ওখানে যাওয়ার আগেই...'

'না, মাসুদ ভাই। টার্নারের ওখানে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন আপনি, হাসপাতালে নেয়া হলো আপনাকে। আপনার কেবিনের বাইরে করিডোরে বসে ছিলাম আমি। আকাশপাতাল চিন্তা পেয়ে বসে তখন আমাকে। কেন যেন মনে হচ্ছিল, এই কেসের মীমাংসা করতে পারব না কখনোই। মনে হচ্ছিল, ভয়াবহ কিছু একটা ঘটবে হয় আমার, না হয় আপনার অথবা আমাদের দু'জনেরই। একা বসে ভাবতে ভাবতে আর একটু পর পর কেবিনের দরজা খুলে উঁকি দিয়ে আপনাকে দেখতে দেখতে চিন্তাটা একসময় আমার বিশ্বাসে পরিণত হলো। ...ইস্তফাপত্রটা লিখে রেখেছিলাম আগেই, কিন্তু সঙ্গে আনিনি; ডাক্তার সাহেব আপনার পরিচর্যা করতে ঢোকার আগে হাসপাতাল থেকে গেলাম বাসায়, নিয়ে এলাম। আমি মনে হয়...খুব সাদামাটা একটা মেয়ে, আমাকে দিয়ে আসলে...'

'দেখো, শায়লা,' এনভেলপটা আরেকবার দেখে নিয়ে রানা বলল, 'ইমোশনাল হয়ে কিছু করাটা কিন্তু...'

'আমাকে দেখে কি ইমোশনাল মনে হচ্ছে, মাসুদ ভাই?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, তোমার রেযিগনেশন লেটার নিলাম। কিন্তু সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে কি না, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার?'

জিততে জিততে কোনও খেলায় হেরে গেলে, জয়ীকে অভিনন্দন জানানোর সময় বিজিতের চেহারায় যে-হাসি ফুটে

ওঠে, সে-হাসি হাসল শায়লা। 'আজ ডিনারে আসবেন আমার বাসায়?'

গাড়ির দরজা খুলল রানা। 'আসব। আশা করছি ততক্ষণে পড়ে ফেলব তোমার ইস্তফাপত্র। ডিনারের টেবিলে কথা হবে।'

চব্বিশ

ভেস্টিবিউলে পা দিতে যাবে রানা, এমন সময় গ্যারেজে শোনা গেল একটা কনভার্টিবলের গর্জন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও। কোথাও যাচ্ছিল নিকি, রানাকে দেখে স্টার্ট বন্ধ করে ছোট্ট হলুদ গাড়িটা থেকে নেমে আসছে এখন। রানাকে তাকাতে দেখে ভুবনভোলানো হাসি হাসার চেষ্টা করল।

লম্বা লম্বা কালচে চুল খুলে রেখেছে মেয়েটা, ওর কোমর ছাড়িয়ে নিতম্ব পর্যন্ত চলে গেছে চুলগুলো। হাঁটার তালে তালে কিছু চুল বার বার চলে আসছে মুখের ওপর, বার বার সেগুলো সরাতে হচ্ছে ওকে।

'হ্যালো,' রানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল নিকি।

জবাবে কিছু বলল না রানা, মুচকি হাসল শুধু।

রানাকে আপাদমস্তক দেখল নিকি। 'কী হয়েছে তোমার? আমি অফার করলাম, পাত্তা দিলে না, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যার সঙ্গে শুতে গিয়েছিলে তার স্বামী মাইক টাইসনের মত কেউ--তোমাকে হাতেনাতে ধরে ইচ্ছামত উত্তম-মধ্যম দিয়েছে।' পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'আমি কিন্তু বিবাহিত না।'

'ভালো,' পা বাড়াল রানা। 'তবে যত তাড়াতাড়ি পারো বিয়ে করে ফেললে আরও ভালো হবে।'

'তোমার কিছু লাগবে? আই মিন, ঘরে খাবার আছে তো? না থাকলে বলো, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, চট করে কিছু নিয়ে আসি--সুপারমার্কেটে যাচ্ছি। দেখে তো মনে হচ্ছে কিছু কিনে এনে খাওয়ার মত অবস্থা নেই তোমার। বিয়ার? বিয়ার লাগবে?'

নিকির দিকে ভালোমত তাকাল রানা। দরদটা কি খাঁটি? নাকি কামনা চরিতার্থ করার জন্য রানার মন গলানোর চেষ্টা? ঠিক বোঝা গেল না।

মাথা নাড়ল রানা। 'কিছু লাগবে না, নিকি। ধন্যবাদ। একজায়গায় ডিনারের দাওয়াত আছে আমার। ওখান থেকে ফিরে আসার সময় টুকটাক কিছু কিনে নেব।'

'আচ্ছা, একটা কথার জবাব দাও তো। তুমি কি যোগী পুরুষ? সব জাগতিক চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠে গেছ? কারও কোনও সাহায্যেরই দরকার নেই তোমার?'

'না, আমি যোগী পুরুষ নই। কোনও জাগতিক চাহিদারই ঊর্ধ্বে উঠতে পারিনি এখন পর্যন্ত। তবে বেশিরভাগ সময় অন্যের সাহায্য ছাড়াই চলতে চেষ্টা করি।'

'স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা খুব ভালো। কিন্তু আমি যদি তোমার একটা কোনও উপকার করার সুযোগ চাই, তা-ও কি দেবে না? আমি কি এতই খারাপ? তোমাকে সরাসরি বলছি বলে কি তোমার দৃষ্টিতে এতই ছোট হয়ে গেছি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। পকেট চেক করে দেখল মেইলবক্সের চাবিটা সঙ্গে নেই। 'শপিং করে ফেরার সময় আমার মেইলবক্সটা একটু চেক কোরো,' কী ভেবে কথাটা বলল জানে না নিজেও, 'যদি কোনও চিঠি পাও, একটু কষ্ট করে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলে খুশি হব।'

‘ঠিক আছে,’ উজ্জ্বল হলো নিকির চেহারা, ‘যাই তা হলে।’

চলে গেল মেয়েটা।

জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে নিকিকে। আসলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু খেয়াল করছে না কিছুই। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করছে। মনে হচ্ছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু সেটা কী, বুঝতে পারছে না। ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল ও।

‘একজন পুলিশকে ফাঁসানো কত কঠিন, তা জানেন?’

আনমনা থাকায় চমকে উঠল রানা, পাঁই করে ঘুরল।

ভেস্টিবিউলের সঙ্গে, দেয়ালে গা ঘেঁষে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সানি ও রিডক্স।

প্রশ্নটা সানির। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে রানার দিকে, তারপর আবার জানতে চাইল, ‘আমাদেরকে ফাঁসানো কত কঠিন, জানেন?’

‘যা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হয়, চেষ্টা করতে থাকলে একসময় তা সহজ হয়ে যায়, জানো?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

‘জ্ঞান দিচ্ছেন?’

‘আমি শিক্ষক নই, জ্ঞানবিতরণ আমার পেশা না।’

সানিরা কেউ কিছু বলল না।

‘খুনগুলো তা হলে তোমরাই করেছ?’

‘যদি বলি হ্যাঁ?’ একটা ভ্রূ উঁচু করল সানি।

‘তা হলে জিজ্ঞেস করব, আর ক’জনকে মারবে?’

‘যতজনকে সম্ভব। যারা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার বদলে, ফাঁসির দড়ি গলায় পরার বদলে আদালতের সিঁড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে ভি চিহ্ন দেখিয়ে নেমে আসবে, আমরাই তাদের পরিণতি।’

‘নিজেদেরকে কী ভাব তোমরা? নায়ক? নাকি সমাজসংস্কারক?’

‘নায়ক হই বা না হই, সমাজসংস্কারক তো বটেই।’

‘তবে যারা যেচে পড়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়,’ মুখ খুলল রিডক্স, ‘তাদের অনেকেই কিন্তু মারা পড়ে বেঘোরে। ইচ্ছা হলে খোঁজখবর করে দেখতে পারেন।’

‘মজা পেলাম কথাটা শুনে,’ কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, একটুও মজা লাগছে না রানার। একটু আগের খুঁতখুঁতে ভাবটা খোঁচাতে শুরু করেছে ওকে আবার।

নিজের শার্টের কলার ধরে টান দিল সানি। ‘পুলিশফোর্সে আমরাই প্রথম প্রজন্ম, যারা জানে কীভাবে লড়তে হয়।’ থাবা দিল নিজের বুকে, চাপড়ে দিল বন্ধুর কাঁধ। ‘আমাদের দলের নাম শার্প-শুটার, আমরা সবাই সে-দলের গর্বিত সদস্য। আইনের ফাঁকফোকরের কারণে যেসব চিহ্নিত অপরাধীকে সাজা দিতে পারে না আদালত, আমরা একইসঙ্গে তাদের বিচারক, জুরি ও জল্লাদ। আমাদের জালে যেমন ধরা পড়েছে কিছু রুই-কাতলা, ঠিক তেমনই আমাদের কবল থেকে রেহাই পায়নি মার্টিন বেকার অথবা আলবার্ট ক্যাভেনডিশের মত হাঙররাও। ছোটখাট একটা নাটক করে আপনার মত একজন অতিবুদ্ধিমানকে দিয়ে শর্টি টার্নারকেও তুলে নিয়েছি আমরা, অবশ্য সে-নাটকে ক্ষতিও হয়েছে আমাদের। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছে, এবং সেটাই বড় কথা। হোমিসাইডের গোয়েন্দাদের কথা ভেবে দেখুন, বলতে গেলে কারোরই কোনও মাথাব্যথা নেই এসব খুনের ব্যাপারে। যাদের চাকরি তাদেরই যখন কোনও বিকার নেই, আমজনতার থাকবে কেন? অর্থাৎ আমরা যে-সমাজসংস্কার শুরু করেছি, তাতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সমর্থন আছে অনেকেরই। এই শহরে ভি চিহ্ন দেখাতে দেখাতে আদালতের

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা ক্রিমিনালদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে,' হাসল, 'আরও অনেকদিন, হয়তো আগামী কয়েক বছর ব্যস্ত থাকতে হবে আমাদেরকে।'

'আপনি যখন ব্যস্ত থাকেন, তখন নিশ্চয়ই বিরক্ত হতে পছন্দ করেন না, মিস্টার মাসুদ রানা?' জানতে চাইল রিডক্স।

ওর প্রশ্নের জবাব দিল না রানা, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে সানির চোখে।

সানি বলল, 'এখন দুটোই মাত্র রাস্তা খোলা আছে আপনার—এ-শহর ছেড়ে চলে যান, নতুবা যোগ দিন আমাদের দলে। আপনার মত একজন শার্প শুটার পেলে গর্ব আরও বাড়বে আমাদের, কার্সনকে হারিয়ে যে-ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে পারব পুরোপুরি।'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল রিডক্স, 'এই দুটোই মাত্র উপায় খোলা আছে এখন আপনার। এবং এর কোনও বিকল্প নেই।'

'একটা কথা জানো না তোমরা,' রিডক্সকে একনজর দেখে নিয়ে সানির চোখে আবার চোখ রাখল রানা, 'বিকল্প না রেখে সাধারণত কাজ করি না আমি।' আফসোস করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'হয় এ-রকম। অন্যকে বুঝতে অনেক সময় ভুল করি আমরা, বিশেষ করে তোমাদের মত কমবয়েসী যুবকরা।'

'কথাটা শুনে খারাপ লাগল, মিস্টার রানা,' রানাকে নকল করে মাথা নাড়ল সানিও। 'আসলেই খারাপ লাগল। কিন্তু...কী আর করা?' বন্ধুর দিকে তাকাল। 'চলো, যাই তা হলে।'

অনতিদূরে পার্ক করা আছে ওদের মোটরসাইকেল, ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে যার যার বাহনে চড়ল ওরা। স্টার্ট দিল, রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল দু'জনই, তারপর বাইকে গর্জন তুলে চলে গেল।

আগের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। তাকিয়ে আছে

সানিদের গমনপথের দিকে। ক্লান্তি তো আছেই, কেমন একটা জড়তা যেন অজগরের মত পেঁচিয়ে ধরেছে ওর চিন্তাশক্তিকে। দুর্বল বোধ করছে।

ভেস্টিবিউলে ঢুকল ও, মেইলবক্সটা পার হওয়ার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আপনাআপনি। অভ্যাসবশে পকেট হাতড়াচ্ছে, মেইলবক্স খোলার চাবি বের করবে। পেল না।

আরে, নিকিকে না বলেছে চিঠি নিয়ে ওপরে যাওয়ার কথাটা? ছোকরাদুটোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সব ভুলে গেছে বেমালুম। মেয়েটার কাছে তো রানার মেইলবক্সের চাবি নেই, থাকার কথাও না। তা হলে ওর মেইলবক্স কীভাবে খুলবে নিকি? ভালই হয়েছে...ভাবতে ভাবতে মেইলবক্সের দিকে তাকাল রানা। ওপর থেকে নিয়ে আসবে চাবিটা, নাকি...

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। আজ দিনটাই বোধহয় খারাপ ওর জন্যে। সবকিছুতেই ভেজাল লেগে যাচ্ছে।

একটু আগে রিডক্সের বলা: 'তবে যারা যেচে পড়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়, তাদের অনেকেই কিন্তু মারা পড়ে বেঘোরে। ইচ্ছা হলে খোঁজখবর করে দেখতে পারেন।'--কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় কৌতূহলী দৃষ্টিতে আবার তাকাল ও মেইলবক্সের দিকে। মনটা এমন কু ডাকছে কেন?

ব্যবহার করতে করতে ছোট হয়ে আসা একটা ভোঁতা পেন্সিল পড়ে আছে ভেস্টিবিউলের মেঝেতে--কে যেন ফেলে রেখেছে, উবু হয়ে তুলে নিল সেটা। সামান্য একটু ফাঁক আছে মেইলবক্সের এককোনায়, সেখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিল পেন্সিলের পেছনের দিকটা। একটুখানি গিয়েই আটকে গেল ওটা। জিনিসটা আস্তে আস্তে বের করে নিল রানা, দাঁতে ঠোঁট কামড়াল কয়েকবার, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল আবারও। যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে দিল পেন্সিলটা, যেমন আছে মেইলবক্স, থাক তেমনি।

ভেতরের কাঁচদরজা খুলে পা রাখল লবিতে। লিফটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আরেকবার খারাপ হয়ে গেল ওর মন--কে যেন "আউট অভ অর্ডার" লেখা একটা কাগজ সাঁটিয়ে দিয়েছে লিফটের দরজায়।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই।

শরীর সায় দিচ্ছে না, তারপরও যত দ্রুত সম্ভব নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় গিয়ে হাজির হলো রানা। কার্সনের ভাগ্যে কী হয়েছিল মনে পড়ে যাওয়ায় চট করে সরে গেল একপাশে, কান রাখল দরজায়, শুনল বেশ কিছুক্ষণ। সানির সঙ্গে তৃতীয় মাস্কেটিয়ার আজ ছিল না। ওর অপেক্ষায় বসে নেই তো ঘরের ভেতর?

না, ভেতরে কোনও শব্দ নেই। অত্যন্ত অনুজ্জ্বল আলো আসছে দরজার নীচ দিয়ে, একটানা। তারমানে ভেতরে যদি কেউ থেকেও থাকে, হাঁটাচলা করছে না।

তা হলে কী করছে? রকিংচেয়ারটাতে বসে আছে দরজার দিকে মুখ করে? একদিক দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ডোরলক খুলে গোবরাট পেরোবে রানা, আর অমনি সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তলের চেম্বার খালি করবে রানার ওপর?

প্যান্টের পকেট থেকে দরজার চাবি বের করল রানা, খুলল ডোরলক। হ্যাণ্ডেল ধরে মোচড় দিল, দু'ইঞ্চি ফাঁক করল দরজা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। চাবিটা জায়গামত রেখে দিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে আলগোছে বের করল ওয়ালথার। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল আস্তে আস্তে, তারপর শরীরের ভর শুধু ডান পা'র ওপর রেখে মুক্ত করে নিল বাঁ পা-টা। একটা মুহূর্ত সময় নিল, তারপরই জুতোর গোড়ালি দিয়ে প্রচণ্ড লাথি মারল দরজায়, সঙ্গে সঙ্গে ডান কাঁধ আর ডান হাঁটুতে ভর দিয়ে গড়ান খেয়ে ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে,

রকিংচেয়ারটা যেদিকে আছে সেদিক থেকে একবারের জন্যও সরেনি চোখ। ওয়ালথারের নল তাক করা আছে সেদিকেই।

কিন্তু না, কেউ বসে নেই রকিংচেয়ারে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, খাঁ খাঁ করছে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা।

ওয়ালথার বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগল রানা। সাবধানে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় প্রতিটা কোনা। খুঁজছে কোথায় লুকিয়ে আছে সম্ভাব্য শত্রু।

না, কোথাও কেউ নেই।

ওয়ালথারটা হোলস্টারে ঢোকাল রানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রকিংচেয়ারের দিকে, এমন সময় দু'-একবার জ্বলে-নিভে শেষপর্যন্ত নিভেই গেল হলওয়ের বাল্ব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল রানার, দরজাটা লাগিয়েছে বটে, কিন্তু লক করেনি।

একছুটে দরজার কাছে হাজির হলো ও, সতর্কতার ধার ধারল না, ওয়ালথারটা আবার বের করে ফেলেছে। অস্বাভাবিক একটা শব্দ ভেসে আসছে করিডোর থেকে। শুনে মনে হচ্ছে, পা ঘষে ঘষে হাঁটছে কেউ।

অখণ্ড নীরবতা জানিয়ে দিচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে লোকটা।

একথাবায় দরজা খুলে ফেলল রানা, উড়াল দিয়ে বের হলো করিডোরে, উল্টোদিকের দেয়ালে শরীর বাড়ি খাওয়ার আগেই ওয়ালথার তাক করে ফেলেছে সিঁড়ির দিকে।

করিডোরে গাঢ় অন্ধকার, ভালোমত দেখার উপায় নেই। ঝট করে বসে পড়ল রানা, আঁধার সয়ে নেয়ার সময় দিচ্ছে চোখদুটোকে। আরও ভারী হয়েছে পায়ের আওয়াজ। একটু পরই

সিঁড়ির কাছে উদিত হলো কৃশকায় একটা চলমান মূর্তি।

রানার পাশের ফ্ল্যাটের সত্তর বছর বয়সের বিধবা মহিলা।

লিফট অকেজো, তাই সিঁড়ি দিয়ে লণ্ড্রিকার্ট টানতে টানতে উপরে উঠেছে, বেচারীর হাঁপানোর শব্দও শুনতে পাচ্ছে রানা পরিষ্কার। লিফটটা বিনা নোটিসে অকেজো হয়ে যাওয়ায় বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছে মহিলা। উপরের দিকে তাকিয়ে জানতে চাচ্ছে এই বয়সে ওকে একলা রেখে কেন চলে গেল ওর ছেলেমেয়েরা, ফেলেই যদি যাবে তা হলে এতগুলো সন্তান পেটে ধরার দরকারটা কী ছিল ওর।

ওয়ালথারটাকে হঠাৎ করেই অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে রানার, দূর হয়ে গেছে ওর উদ্বেগ, অদ্ভুত এক মায়া টের পাচ্ছে বুড়ির প্রতি। অস্ত্রটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বুড়ি। সাহায্য চাইবে কি না ভাবছে--ইয়াং জেনারেশন নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্য করে না, কারণ কাজটা বোকামি অথবা সময়ের অপচয় বলে মনে করে।

একহাতে লণ্ড্রিকার্টটা ধরল রানা, আরেকহাতে ধরল একটানা পরিশ্রমে কাঁপতে থাকা বুড়িকে, মানুষ আর জিনিস দুটোকেই নিয়ে এল করিডোরে। বুড়ির অ্যাপার্টমেন্টের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল তাকে, দরজাটা খুলতে সাহায্য করল। এমনকী ভেতরের একটা বাল্বও জ্বেলে দিল। যখন বেরিয়ে আসছে তখন খেয়াল করল, প্রসন্ন চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ি, ছলছল করছে দু'চোখ, নিচু গলায় বলছে, 'দোয়া করি, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল রানা, দরজা লাগিয়ে দিয়ে বসে পড়ল রকিংচেয়ারে। উৎকণ্ঠা কেটে গেছে বটে, কিন্তু ক্লান্তিটা ফিরে এসেছে নতুন করে। একটু আগের লাফঝাঁপের কারণে

টনটন করছে বাঁ পা। জ্বলুনি শুরু হয়েছে বুকের বাঁ দিকের চামড়ায়, অসহ্য লাগছে ওখানকার ব্যাণ্ডেজটা। টার্নারের বুইকের ওয়াইপারদুটো ভালোমত ডলা দিয়ে গেছে দুই হাতের তালুতে, এখন টনটন করছে দু'হাতের নখ থেকে শুরু করে কব্জি পর্যন্ত। এতক্ষণ টের পায়নি, এবার জানান দিচ্ছে মাথাব্যথা।

রানা যে সন্দেহ করছে সানিদেরকে, সেটা ওরা জানল কীভাবে?

কাউকে বলেনি রানা কথাটা।

কাউকে না।

ব্যালিস্টিক ল্যাবের অ্যান্থনি স্কারযাকে বলেছে? না। ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রিচার্ড হেইডন? না। তবে একটা নকল বুলেট সরবরাহ করা হয়েছে লোকটাকে; সেটা দেখে হেইডন তো দূরের কথা, একজন ত্রিকালদর্শী দরবেশের পক্ষেও বোঝা সম্ভব না কাকে সন্দেহ করছে রানা। ক্যাপ্টেন ডোনাল্ড পিয়ার্স? উঁহুঁ, মর্গে দেখা হওয়ার পর থেকে উন্নাসিক লোকটা একরকম এড়িয়ে চলছে রানাকে, শুধু আজ একবার হাসপাতালে এসে তর্জনগর্জন করে গেছে। ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড? হ্যাঁ, অনারারি লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ফোনে লোকটার সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে বটে, কিন্তু নিজের সন্দেহের ব্যাপারে খোলাখুলি কিছু বলেনি কখনও, তবে পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে। এলএপিডি'র প্রেসিডেণ্ট উইলিনস্কি? ধুর, ওই লোকের কথা ভাবাটাও বাতুলতা।

কিন্তু শায়লা মারিয়া?

উফ্ফ্, অসহ্য ঠেকছে মাথাব্যথাটা। শরীরের অন্যসব ব্যথা সহ্য করা যায়, কিন্তু মাথাব্যথা উঠলে দাঁতে দাঁত চেপেও কাজ হয় না। রকিংচেয়ার ছাড়ল রানা, গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। কেবিনেট খুলে তাকাল ভেতরের ওষুধের-শিশিগুলোর দিকে। একটা শিশি

খুলে মাথা-ধরার বড়ি নিল দুটো, কিচেনে গিয়ে একটা গ্লাস পানিভর্তি করে ফিরে এসে বসে পড়ল আগের জায়গায়। এক ঢোকে গিলে ফেলল বড়িদুটো, কিন্তু গ্লাসটা খালি করল না। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে।

শায়লা মারিয়া--রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার চিফ, পিঠে গুলি করবে না দাবি করে সহকারী হিসেবে যার নাম ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডের কাছে প্রস্তাব করেছে রানা নিজেই। শায়লা মারিয়া--একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামের এক যুদ্ধশিশুর সন্তান, যে-শিশুকে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে দত্তক নিয়েছিলেন এক আমেরিকান দম্পতি। শায়লা মারিয়া--রানা এজেন্সিতে পাঠানো চাকরির দরখাস্তে যে বাংলায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছিল, "আমাকে শিখিয়েপড়িয়ে নিতে হবে, পারবেন?"

নাহ্, শায়লা না। ওর এতদিনের চেনায় ভুল হতেই পারে না। শায়লাই যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে, কখন করল? আজ হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় যতক্ষণ ছিল ও রানার সঙ্গে, একটাবারের জন্যও মারিয়া তার মোবাইল ব্যবহার করেনি--নিজচোখে দেখেছে রানা। তা হলে কি রানাকে নামিয়ে দিয়েই ফোন করেছে সানিকে? কিন্তু...ভেস্টিবিউলের বাইরে দাঁড়িয়ে সানিদের সঙ্গে কথা বলার দৃশ্য স্মরণ করল রানা। শায়লার ফোন পেয়ে ওরা আসেনি এটা নিশ্চিত। আগে থেকেই ওরা হাজির ছিল ওখানে শেষ হুঁশিয়ারি দেবে বলে। ওদের কথা পরিষ্কার, হয় পালাও, নয়তো যোগ দাও।

নিকির সঙ্গে নিশ্চয়ই লম্বা সময় ধরে খেজুরে গল্প করেনি রানা? মুখ ফস্কে কিছু বলে ফেলেছে?

নিকি?

হঠাৎ করে নামটা মনে পড়ে যাওয়ায় চমকে উঠল রানা।

মেয়েটাকে না নিজের মেইলবক্স চেক করতে বলেছে ও? কোনও চিঠি থাকলে উপরে নিয়ে আসতে বলেছে?

পানির গ্লাসটা সশব্দে মেঝেতে নামিয়ে রেখে লাফ দিয়ে রকিংচেয়ার ছাড়ল রানা, আরেকলাফে পৌঁছে গেল দরজার কাছে। গ্যারেজে ঢুকেছে নিকির কনভার্টিবল, চিন্তামগ্ন থাকার পরও আওয়াজটা কান এড়ায়নি রানার কিছুক্ষণ আগে।

সিঁড়ির কাছে যাওয়া উচিত ছিল ওর, কিন্তু ভুল করে চলে গেল লিফটের দরজায়, নীচে নামার বাটনে চাপ দিল। দু'-তিনবার চাপ দেয়ার পরও যখন দেখল কোনও কাজ হচ্ছে না, মনে পড়ল লিফটটা নষ্ট। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা, তৃতীয় আরেকলাফে এসে পড়ল সিঁড়ির কাছে, একেকবারে তিন-চার ধাপ টপকে নামছে নীচে।

'খোদা!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল একবার, আরও আগেই কেন মনে হলো না কথাটা! রাগ হচ্ছে নিজের ওপরই।

নীচতলায় হাজির হলো ও; যদি উসাইন বোল্টকে বলা হতো স্প্রিন্টে অংশ না নিয়ে সিঁড়ি টপকে নামতে, আজ নিশ্চয়ই রানার গতির কাছে হার মানতেন তিনি। ভেস্টিবিউলে ইতোমধ্যে ঢুকে পড়েছে নিকি, একহাতে কোনওরকমে ধরে আছে গ্রসারি আইটেমের দুটো ব্যাগ ও রানার জন্য কেনা ছ'টা বিয়ারের একটা প্যাক, অন্যহাতে অতি উৎসাহে একটা চাবি ঢোকাতে যাচ্ছে "মাসুদ রানা" লেখা মেইলবক্সের কী-হোলে।

'থামো!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল রানা, দাঁড়িয়ে পড়েছিল একটা মুহূর্তের জন্য, ছুট লাগাল আবার। কী-হোলে চাবি ঢোকানোর আগেই নিকিকে সরিয়ে দিল একধাক্কায়।

উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়েছে গ্রসারির প্যাকেটদুটো; খোলামুখ দিয়ে বাইরে পড়েছে ময়দা, চিনি, চা-পাতার প্যাকেটসহ আরও কিছু জিনিস। ডিমের প্যাকেটের একটা ডিমও আস্ত নেই সম্ভবত।

পাতলা প্লাস্টিকের প্যাক ফেটে বেরিয়ে পড়েছে একটা বিয়ারের-বোতল, গড়াগড়ি খাচ্ছে।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে নিকি, যতটা না ব্যথা পেয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছে। দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা একটুখানি উঁচু করে তাকাল রানার দিকে, দৃষ্টিতে অনেক বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

'আমি না হয় ভুল করে আমার মেইলবক্স খুলতে বলেছিলাম তোমাকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা, নিকির ওপরও রাগ হচ্ছে ওর। 'কিন্তু তুমি কোন্ আক্কেলে করতে যাচ্ছিলে কাজটা? তুমি আমার মেইলবক্সের চাবি পাবে কোত্থেকে?'

'পেয়েছি তো,' আহত গলায় বলল নিকি।

'পেয়েছ! মানে?'

'বাড়িওয়ালির কাছে গিয়ে বললাম তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটু খেদমতের দরকার, মেইলবক্স খুলে চিঠি নিয়ে আমাকে উপরে যেতে বলেছ। আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দিল বুড়ি, কিছু বলল না।'

কিছু বলল না রানাও, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে নিকিকে, টের পাচ্ছে ফাঁকা হয়ে গেছে মাথাটা, একটু নড়লেই ঘুরে উঠছে।

'কিন্তু হয়েছেটা কী?' আরেকটু উঠে বসল নিকি। 'একটু আগে যে-অ্যাকশন দেখালে, বিছানাতেও তোমার পারফর্মেন্স সে-রকম ভায়োলেন্ট নাকি?' দাঁত বের করে হাসল। 'তা হলে বিশ্বাস করো...' রানাকে পকেট থেকে সুইস আর্মি নাইফটা বের করতে দেখে হাসিটা মিলিয়ে গেল ওর, আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল মুখ, আস্তে আস্তে বড় বড় হয়ে যাচ্ছে চোখদুটো।

সুইস নাইফের স্ক্রু-ড্রাইভারের ফলাটা বের করল রানা, আরেকটু এগিয়ে গেল মেইলবক্সের দিকে। ভাড়াটেদের সবার মেইলবক্স আর বাযার ঢেকে রাখা প্লেটের স্ক্রুগুলো খুলছে একে

একে। সময় নিয়ে, সাবধানে করছে কাজটা; খেয়াল রেখেছে যাতে ঝাঁকি না লাগে, অথবা কোনওকিছু পিছলে পড়ে না যায় হাত থেকে।

বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়েছে নিকির দৃষ্টিতে, দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে খুকিদের কায়দায় বসে আছে এখন, পরনের স্কার্ট উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নির্লোম ফরসা নরম পা। ভাবছে, ঠিক কী ভাবা যায় রানাকে--পাগল, নাকি বিদঘুটে?

একতলার একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল এমন সময়, গাট্টাগোট্টা একটা লোক বেরিয়ে এল লবিতে। ভেস্টিবিউলের মেঝেতে নিকিকে "বিশেষ ভঙ্গিতে" বসে থাকতে দেখে ঢোক গিলল। জানে ওর পাশের অ্যাপার্টমেন্টে অনেকদিন থেকে একা থাকছে মেয়েটা, ওর সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার খুব শখ লোকটার কিন্তু সেটা পূরণ করার সাহস নেই। কাজেই, স্কুলবালিকাদের দেখামাত্র রোমিওরা যেভাবে হিরো সাজার চেষ্টা করে, পরনের টাইট গেঞ্জিটা সে-ভঙ্গিতে ঠিকঠাক করে গলা খাঁকারি দিতে দিতে গিয়ে দাঁড়াল কাঁচদরজার সামনে। চেহারায় রাজ্যের সন্দেহ নিয়ে একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর দরজাটা খুলে পা রাখল ভেস্টিবিউলে।

কোন্ মহারাজ আসছে, দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা, কিন্তু হাত সরাল না মেইলবক্স থেকে।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' নিকির পা ঠিক কতখানি দেখা যাচ্ছে নিশ্চিত হয়ে বাজখাঁই কণ্ঠে জানতে চাইল গাট্টাগোট্টা, উত্তরটা দাবি করছে রানার কাছে।

'ফুটবল খেলা হচ্ছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'যাও, একটা পতাকা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে যাও। একজন লাইন্সম্যানের খুব দরকার আমাদের।'

স্কুলবালিকার সামনে রোমিও ক্লিন বোল্ড, কাজেই চেহারা

লাল হয়ে গেল গাট্টাগোট্টার। আগের চেয়েও ভারী গলায় বলল, ‘এখানে থাকো তুমি?’

‘জী, জনাব, অধম এখানেই থাকে,’ কাজে মনোযোগ দিল রানা।

খোঁচামারা জবাবে সন্তুষ্ট হলো না গাট্টাগোট্টা। ‘তা হলে জানতে পারি কি, কোন্ জাদুটোনা করছ মেইলবক্সগুলোর ওপর? চাবি হারিয়ে ফেলেছ নিজের, অথচ প্রেমপত্র দিয়ে গেছে তোমার গার্লফ্রেণ্ড? উতলা হয়ে গেছ সেজন্যে?’

লাথিটা এসে গিয়েছিল রানার পায়ে, নিজেকে সংযত করল ও। ‘দেখো, ভায়া, বুঝলাম অনেক তেল আছে তোমার স্টকে। যাও, ঘরে গিয়ে সেগুলো নিজের চরকায় দাও গিয়ে।’

‘নিজের চরকাতেই তেল দিচ্ছি আমি,’ এক পা আগে বাড়ল গাট্টাগোট্টা। ‘সবগুলো মেইলবক্স আর বাযার ঢাকা আছে একটা মাত্র প্লেট দিয়ে, শয়তানের নাম নিয়ে ওটার স্ক্রুগুলো যে খুলছ, আমার মেইলবক্সটাও তো ন্যাংটো হয়ে যাচ্ছে।’

‘তুমি তো আর ন্যাংটো হচ্ছ না, তা-ই না? কাজেই চলে যাও। আর যদি দাঁড়িয়ে থাকতে চাও, মুখটা বন্ধ রাখো।’ কথা শেষ না করে আবার কাজ শুরু করল রানা। বাকি স্ক্রুগুলো খুলে নিল, তারপর সবগুলো স্ক্রু দিল নিকির হাতে--গাট্টাগোট্টা বার বার কোন্‌দিকে তাকাচ্ছে বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, এসে দাঁড়িয়েছে রানার পাশে। দৃষ্টির প্রশ্নবোধক চিহ্নটা উধাও না হলেও বুঝতে পারছে যা করছে রানা খামোকা করছে না।

খুবই সাবধানে, যতটুকু দরকার তারচেয়েও বেশি সময় নিয়ে ফেইসপ্লেটটা সরাল রানা দেয়াল থেকে। স্ক্রুগুলো নিকির হাতে, কাজেই প্লেটটা গছিয়ে দিল গাট্টাগোট্টার হাতে। জিনিসটা এমনভাবে নিল লোকটা, দেখে মনে হলো গোবর ধরেছে বুঝি।

সুইস নাইফটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল রানা, উন্মুক্ত

হয়ে যাওয়া বড় কোটরটাতে উঁকি দিল। ধাতব আলগা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে এককোনায়, সাবধানে সরাল জিনিসটা, উল্টেপাল্টে দেখে নিশ্চিত হলো বাজে জিনিস, ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবারও উঁকি দিল, এবার নিজের মেইলবক্সে। প্লাস্টিকজাতীয় কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভবত আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে এককোনায়। ওটা থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশকিছু তার, সংযুক্ত হয়েছে কী-হোলের সঙ্গে।

সুইস নাইফটা আবার হাতে নিল রানা, ভাঁজ খুলে বের করল কাঁচিটা। সাবধানে, একটা তার যেন আরেকটাকে স্পর্শ করতে না পারে এমনভাবে, একে একে কেটে ফেলল প্রতিটা তারই। কী-হোলের সঙ্গে এখন আর কোনও যোগাযোগ নেই প্লাস্টিকজাতীয় জিনিসটার।

'ওটা কী?' ফণা নেমে গেছে গাট্টাগোট্টার, এখন আস্তে আস্তে চিকন ঘাম দেখা দিচ্ছে ওর চওড়া কপালে।

হাত চালিয়ে কাজ করলে সমস্যা থাকার কথা নয় এখন, তারপরও তাড়াহুড়ো করল না রানা--সাবধানে আঠা ছুটিয়ে ডিভাইসটা বের করে আনল মেইলবক্সের ভেতর থেকে। উল্টেপাল্টে দেখল সেটা, তারপর গাট্টাগোট্টার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।'

'মানে বম?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে গাট্টাগোট্টার। রানার কাছ থেকে হ্যাঁ-না কিছু শোনার অপেক্ষা করল না, হাতে ধরা প্লেটটা ফেলে দিয়ে ঘুরেই ছুট লাগাল, কাঁচের দরজা খুলে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের গোবরাট পেরোতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগল না ওর। দড়াম করে লাগাল নিজের সদর-দরজা, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটা বিস্ফোরিত হলেও এর চেয়ে খুব বেশি জোরে শব্দ হতো না হয়তো।

নিকির দিকে তাকাল রানা। উধাও হয়ে গেছে মেয়েটার সব

কৌতূহল, মৃত্যুভয় ফুটন্ত-পানির মত টগবগ করছে সুন্দর দুই চোখে। অল্প অল্প কাঁপছে বেচারী।

একহাতে এক্সপ্লোসিভটা ধরে রেখে আরেকহাতে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে মেয়েটার কাঁধে আলতো চাপ দিল রানা। 'সোজা গিয়ে ঢোকো নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। আজ রাতে যেন আর বাইরে বেরোতে না হয়, সে-চেষ্টা কোরো। তালা মেরে রেখো, আমি ছাড়া অন্য কেউ গেলে হাজার পরিচিত হলেও খুলবার দরকার নেই। বুঝতে পেরেছ?'

আপনাআপনি নিচু হয়ে যাওয়া মাথাটা আস্তে আস্তে ঝাঁকাল নিকি।

'আমার কারণে নষ্ট হয়েছে তোমার বাজার, সরি। কিন্তু যেগুলো নষ্ট হয়েছে সেগুলো নতুন করে কেনা ছাড়া ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাকিগুলো গুছিয়ে তোমার ঘরে দিয়ে আসি চলো। বিয়ারের প্যাকটা বোধহয় আমার জন্য এনেছিলে, না?'

অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল নিকি। উত্তর দেয়ার বদলে, যেন গোপন কিছু জানতে চাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'এত ভয়ঙ্কর উপায়ে কে তোমাকে খুন করতে চায়?'

জবাব দিল না রানা।

পঁচিশ

আচ্ছা, কী খেতে পছন্দ করে মাসুদ রানা? বাঙালি খাবার, চাইনিয বা থাই আইটেম, নাকি ইউরোপিয়ান ডিশ?

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সুপারমার্কেটের দিকে যাচ্ছে আর কথাগুলো ভাবছে শায়লা। রানাকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসার আগে জানতে চাওয়া উচিত ছিল, আজ ডিনারে কোন্ মেনুটা প্রেফার করবে ও। বোকামি হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করতে গেলে এ-রকম হয় শায়লার।

কত বদলে গেছে শহরটা! এবং সময় যত যাচ্ছে, তত বদলাচ্ছে। আগে সুপারমার্কেটে যাওয়ার সময় এই জায়গাটা রাস্তার দু'পাশে খালি ছিল। গত ছ'মাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে গেছে চার-পাঁচটা গগনচুম্বী ভবনের কাঠামো, যত জলদি সম্ভব হ্যাণ্ডওভারের উদ্দেশ্যে পুরোদমে কাজ করছে ডেভেলপাররা এখন; ছোট-বড় তক্তা, পানি নিষ্কাশনের জন্য জায়গায় জায়গায় খুঁড়ে রাখা নালা, সুয়ারেজের পাইপ আর অসম্পূর্ণ গ্যাসলাইনের জন্য হাঁটাই দায়।

হঠাৎ পেছন থেকে ধুম করে আওয়াজ হলো, চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল শায়লা, ঘটনা কী দেখার জন্য ঘাড় ফেরাল। কয়েক টন সুরকি নিয়ে এসে ঢালছে একটা ডাম্পট্রাক।

'ঈশ্বর!' মাথা নাড়ল শায়লা, আবার হাঁটা ধরল সুপারমার্কেটের উদ্দেশে। কী রাঁধবে রানার জন্য, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এখনও।

টেলিভিশন সেটের ওপর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটা নামিয়ে রেখে রকিংচেয়ারে বসল রানা।

মরণফাঁদ। এ-জীবনে কতবার ঘটল এমন ঘটনা? খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না প্রশ্নটার জবাব, রানাও না। আর কতবার ঘটবে? সেটাও বোধহয় খোদা ছাড়া জানে না কেউ।

নিকি জানতে চেয়েছিল, এত ভয়ঙ্কর উপায়ে রানাকে মারতে চায় কে। জানে না রানা। আবার হয়তো জানেও। সানি, রিডক্স,

হেন্ডন, অথবা ওরা তিনজনই।

অথবা...অথবা কে?

প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু দেখছে না জিনিসটা, বরং নিকট অতীত হাতড়াচ্ছে।

কী এমন ভুল হয়েছে যে, ওর মনের খবর জেনে গেছে সানি ও তার বন্ধুরা?

ইনডোর টার্গেট প্র্যাকটিস এরিয়া? না। আউটডোর শুটিং রেঞ্জ? না। পুলিশ বিল্ডিং? হতে পারে। ব্যালিস্টিক ল্যাব? না। পার্সোনাল রেকর্ড সেকশন?

চোখ পিটপিট করল রানা। ওখানে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত সানি আর ওর বন্ধুদের ফাইল দেখেছিল ও। ওগুলো যথাস্থানে তুলে রাখতে খেয়াল ছিল না। তারমানে পরে দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে সানিরা?

যদি তা-ই হয়, তা হলেও কথা বাকি থেকে যায়। ফাইল দেখেছে রানা কয়েকদিন আগে, প্রতিক্রিয়া দেখাতে এত সময় লাগল কেন সানিদের? নাকি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে--টার্নারের ওখানে আগের ফাঁদটা, সানির কথামত নাটকটা রচনা করে?

শায়লা নির্দোষ, শত ভাগ নিশ্চিত রানা। তবে এ-ও ঠিক, গাড়িতে রানার সঙ্গে মেয়েটার যা যা কথা হয়েছে সব শুনেছে সানিরা, যে-কোনও উপায়েই হোক।

নড়েচড়ে বসল রানা, নিকট অতীত আবার ভেসে উঠেছে স্মৃতির পর্দায়।

কার্সন মরেছে অনেকক্ষণ আগে. একগাদা অ্যাকশনের পর জ্ঞান হারাচ্ছে রানা, উদ্বিগ্ন চেহারায় ওর দিকে ছুটে আসছে শায়লা। বেশিরভাগ পুলিশের নজর তখন সদ্যমৃত শর্টি টার্নারের ওপর। বেশকিছু সময় গাড়িটা অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, এবং সানি ছিল অক্ষত। সে জানে, গাড়িটা আবার ব্যবহার করতে হবে

রানাকে, অথবা শায়লাকে, অথবা ওদের দু'জনকেই।

আবারও চোখ পিটপিট করল রানা, নিজের অজান্তেই সোজা হয়ে গেছে পিঠ।

ট্রান্সমিটার!

ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে শায়লার গাড়িতে।

কী করবে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল সানি--টার্নারের ওখানে যে-নাটকের আয়োজন করেছিল সে, কোনও কারণে যদি ব্যর্থ হয় সেটা, তা হলে ওর পরের মরণফাঁদের প্রথম ধাপ অবশ্যই এই ট্রান্সমিটার।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল রানা।

নাহ্, বাঙালি খাবারে ঝক্কি অনেক। রাঁধতেও সময় লাগে বেশি, আবার লবণটা কিংবা ঝালটা কম-বেশি হলে সব কষ্ট বরবাদ। ওদিকে দু'-চারবার শখ করে চাইনিয রাঁধলেও হাত পাকেনি, আজ উদ্যোগ নিলে খুলতে হবে রেসিপির বই। কাজেই ইংলিশ ডিশই সবচেয়ে নিরাপদ।

সুতরাং একটা শপিংকার্ট টেনে নিয়ে প্রেটযেল. সেলেরি, কাজু বাদাম, পনির আর ক্যালিফোর্নিয়া বার্গাণ্ডি'র একটা আধ গ্যালনের বোতল দিয়ে সেটা ভরল শায়লা। সবশেষে "শায়লা স্পেশাল", অর্থাৎ কাস্টার্ডের জন্য নিল আপেল, আঙুর, বেদানা আর কলা।

কিন্তু চেকআউট কাউন্টারে গিয়ে বিব্রত হতে হলো ওকে--ইচ্ছামত জিনিস নিয়েছে বটে, মূল্য পরিশোধের মত যথেষ্ট টাকা নেই পার্সে।

'একটা চেক লিখতে হবে আমাকে,' লজ্জিত দৃষ্টিতে ক্যাশিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'আপনার কি ক্রেডিট কার্ড আছে, ম্যাডাম?'

'না।'

'তা হলে চেক-ক্যাশিং কার্ড?'

'না, কিন্তু...'

'তা হলে, ম্যাডাম, একটু কষ্ট করে চলে যান আমাদের ম্যানেজারের কাছে, আপনার চেকটা অ্যাপ্রুভ করিয়ে আনুন।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে?'

'ওই যে,' সুপারমার্কেটের এককোনায় উঁচু করে বানানো হয়েছে কাঁচঘেরা একটা বুথ; পেছন ফিরে আঙুলের ইশারায় সেটা দেখিয়ে দিল ক্যাশিয়ার, 'ডেস্কের পেছনে যে ভদ্রলোক বসে আছেন তিনিই আমাদের ম্যানেজার।'

বুথটাতে গেল শায়লা, অনুমোদন করিয়ে আনল ওর চেকটা। যেসব জিনিস কিনেছে, সেগুলো দুটো বড় বড় ব্যাগে ভরে বেরিয়ে এল সুপারমার্কেট থেকে। একটু হাঁটবে বলে ইচ্ছা করেই গাড়ি আনেনি, তাই হেঁটেই ফিরতি পথ ধরল।

কিছুদূর আসার পর টের পেল, কাঁধে ঝোলানো পার্সের ভেতরে ভাইব্রেট করছে ওর মোবাইল ফোন। আপদ আর কাকে বলে! সাঁ সাঁ করে গাড়ি আসা-যাওয়া করছে রাস্তায়, ফুটপাথে জনস্রোত। এসবের মধ্যে শায়লা ব্যাগদুটোই বা নামিয়ে রাখবে কোথায়, আর কলটাই বা রিসিভ করবে কীভাবে? তারচেয়ে বাবা থাক, মোবাইল বাজতে থাকুক, একবারে বাসায় গিয়ে দেখা যাবে কে ফোন করেছিল।

এই সময়ের মধ্যে কেয়ামত ঘটে যাবে না নিশ্চয়ই?

ফোন ধরছে না শায়লা।

কোনও কাজে ব্যস্ত সম্ভবত। চুলায় রান্না চাপিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, কল্পনার চোখে দেখল রানা, সেই ফাঁকে টুকিটাকি কাজ সেরে নিচ্ছে। আজ রাতে ডিনার খাওয়াবে ও রানাকে। ইস্তফাপত্র দিয়েছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দেবে।

ইস্তফাপত্র?

মোবাইলটা রেখে দিয়ে মুখবন্ধ খামটা বের করল রানা পকেট থেকে। শায়লার কাজ দেখে মুচকি হাসল--খামের মুখ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মেয়েটা, নিশ্চিত হতে চেয়েছে ভেতরের চিঠিটা যেন কিছুতেই না হারায় রানা।

এনভেলপের মুখ ছিঁড়ল রানা, ভেতরের কাগজটা বের করল। খামটা মোবাইলের নীচে চাপা দিয়ে ভাঁজ খুলল কাগজের।

পরিচিত গোটা গোটা অক্ষরগুলো যেন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল চোখের সামনেঃ

কোনও সম্বোধন ছাড়াই শুরু করেছি এই চিঠি, খেয়াল করেছেন হয়তো। কারণ যাঁকে ভালোবেসে ফেলেছি, তাঁকে ভালোবাসার কথা জানানোর সময়ও ভাই বলে ডাকতে কেমন কেমন যেন লাগে। আবার যাঁকে এতদিন ভাই বলে ডেকেছি, তাঁকে হঠাৎ করে আর কোনও সম্ভাষণ জানাতেও দ্বিধা হয়।

কী থেকে কী হয়ে গেল জানি না আমি নিজেও। রানা এজেন্সির চাকরিটা স্বপ্নের মত ছিল আমার জন্য। স্বপ্নের মত ছিলেন আপনিও--চলনে, বলনে, কথায়, কাজে। যদিও কতবারই তো সুপারভিশনে এসেছেন এ-শহরে, একটিবার ভুলেও আমার প্রতি সামান্যতম দুর্বলতাও প্রকাশ করেননি। তার পরেও আমি কী করে যে জীবনের মধুরতম স্বপ্নের ফাঁদে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললাম নিজের সঙ্গে, টেরই পাইনি। জানি আমি, গোটা ব্যাপারটা একতরফা। দোষ বলুন আর ভুল বলুন সবটুকু আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

আমি তখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি মাত্র। রেযাল্ট আহামরি কিছুই না, আবার ফেলনাও নয়। কী করব ভাবছি, পত্রিকায় দেখলাম রানা এজেন্সির ব্যতিক্রমী সেই বিজ্ঞাপনটা। অনেকটা খেয়ালের বশেই উপস্থাপন করলাম নিজের সিভি। কী

ইস্তফাপত্র?

মোবাইলটা রেখে দিয়ে মুখবন্ধ খামটা বের করল রানা পকেট থেকে। শায়লার কাজ দেখে মুচকি হাসল--খামের মুখ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মেয়েটা, নিশ্চিত হতে চেয়েছে ভেতরের চিঠিটা যেন কিছুতেই না হারায় রানা।

এনভেলপের মুখ ছিঁড়ল রানা, ভেতরের কাগজটা বের করল। খামটা মোবাইলের নীচে চাপা দিয়ে ভাঁজ খুলল কাগজের।

পরিচিত গোটা গোটা অক্ষরগুলো যেন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল চোখের সামনে:

কোনও সম্বোধন ছাড়াই শুরু করেছি এই চিঠি, খেয়াল করেছেন হয়তো। কারণ যাঁকে ভালোবেসে ফেলেছি, তাঁকে ভালোবাসার কথা জানানোর সময়ও ভাই বলে ডাকতে কেমন কেমন যেন লাগে। আবার যাঁকে এতদিন ভাই বলে ডেকেছি, তাঁকে হঠাৎ করে আর কোনও সম্ভাষণ জানাতেও দ্বিধা হয়।

কী থেকে কী হয়ে গেল জানি না আমি নিজেও। রানা এজেন্সির চাকরিটা স্বপ্নের মত ছিল আমার জন্য। স্বপ্নের মত ছিলেন আপনিও--চলনে, বলনে, কথায়, কাজে। যদিও কতবারই তো সুপারভিশনে এসেছেন এ-শহরে, একটিবার ভুলেও আমার প্রতি সামান্যতম দুর্বলতাও প্রকাশ করেননি। তার পরেও আমি কী করে যে জীবনের মধুরতম স্বপ্নের ফাঁদে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললাম নিজের সঙ্গে, টেরই পাইনি। জানি আমি, গোটা ব্যাপারটা একতরফা। দোষ বলুন আর ভুল বলুন সবটুকু আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

আমি তখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি মাত্র। রেযাল্ট আহামরি কিছুই না, আবার ফেলনাও নয়। কী করব ভাবছি, পত্রিকায় দেখলাম রানা এজেন্সির ব্যতিক্রমী সেই বিজ্ঞাপনটা। অনেকটা খেয়ালের বশেই উপস্থাপন করলাম নিজের সিভি। কী

দেখেছিলেন আপনি ওতে জানি না, হয়তো সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলেই পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন, ডাক পেয়ে গিয়ে বসতে পেরেছিলাম আপনার মুখোমুখি।

দিনটা ভুলিনি আমি, ভুলব না কোনওদিনই। ক্লিন শেভ্‌ড চোখা একটা চেহারা, স্যুটেড-বুটেড নিখুঁত একটা মানুষ। ও-রকম ধারাল মানুষ আগেও অনেক দেখেছি, তারপরও আপনি ছিলেন ব্যতিক্রম, অনেকের চেয়ে আলাদা। প্রথম দেখাতেই মনে হলো, যদি চাকরিটা না-ও হয় আমার, এবং যদি অনেক বছর পর আবার দেখা হয়, সহস্র মানুষের ভিড়ে আপনাকে চিনে নিতে কষ্ট হবে না।

নিজের সঙ্গে আমার বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা হয়তো সেটাই। তারপর থেকে কত হাজারবার...কত লক্ষবার যে পুড়েছি আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বের আগুনে, বলতে পারব না। আমার মা ছিলেন একাত্তরের যুদ্ধশিশু, তাঁকে দত্তক নেয়া আমার আমেরিকান নানা-নানি ছিলেন ঘোর মৌলবাদী ক্যাথোলিক। আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে কামনার চেয়ে ধর্ম বড়, ইহকালের চেয়ে পরকাল অনেক মূল্যবান। তাই আমিও, বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, ভোগবাদী আমেরিকান সমাজে এক ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে হিসেবে বড় হয়েছি। তারপরও আমি একজন মানুষ--অন্য দশজনের মতই যার চামড়া কেটে গেলে রক্ত পড়ে, অন্য দশজনের মতই যার দেহকাঠামো একটা কঙ্কাল। তাই হলিউডি নায়করা ঝড় তুলেছে আমার মনে কিন্তু কামনা জাগায়নি, কখনও কখনও যেচে পড়ে কথা বলেছি হাইস্কুলের দীর্ঘদেহী বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে, কিন্তু সম্পর্কটা ওই পর্যন্তই সীমিত থেকেছে, কলেজের পেশিবহুল রাগবি খেলোয়াড়রা হানা দিয়েছে স্বপ্নে, কিন্তু ওদের কাউকে জীবনসঙ্গী করার কথা ভাবিনি কখনও।

অথচ আপনার বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে সবকিছুর। এবং তা

ঘটেছে বলেই আপনার অজান্তে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অসহ্য আগুনে পুড়ে চলেছি আমি প্রতিনিয়ত, দিবানিশি অষ্টপ্রহর, একটু আধুনিক ভাষায় বললে টোয়েন্টি ফোর সেভেন।

শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেভাবেই হোক নেভাব এই আগুন; হয়তো পারব না পুরোপুরি, এই ভালোবাসা হয়তো তুষের আগুনের মত জ্বলতে থাকবে ধিকিধিকি। কিন্তু কে না জানে, দাবানলের চেয়ে জ্বলন্ত ছাই ভালো?

আপনাকে দিতে পারতাম হয়তো অনেককিছুই--যুবতী একটা মেয়ে একটা ছেলেকে যা যা দিতে পারে তার সব, কিন্তু বিনিময়ে নিঃস্ব হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই আমার। কারণ, আমি বুঝে নিয়েছি, আপনি মুক্তপুরুষ--নারী, সংসার, সমাজ কিংবা ধর্ম কোনওটাই কখনও বাঁধতে পারেনি আপনাকে, কোনওদিন পারবেও না। আপনি যোগী নন, কিন্তু কোনও যোগীর চেয়ে কোনও অংশে কমও নন; কারণ আপনার হয়তো ভোগলালসা আছে, কিন্তু মোহ নেই। আমি নিশ্চিত আপনি ব্রহ্মচারী নন, কিন্তু অবসরে যতবার ভেবেছি আপনাকে নিয়ে, একজন ব্রহ্মচারীর চেয়ে কোনও অংশে ছোট মনে হয়নি আপনাকে, এবং ব্যাপারটা তাজ্জব করেছে আমাকে। আপনি সুনামির মত রহস্যময়--কী ঘটে গেল বুঝে উঠবার আগেই ভাসিয়ে ডুবিয়ে তছনছ করে ফেলেন সবকিছু।

সবচেয়ে বড় কথা, আপনি মালিক আর আমি কর্মচারী; যেসব বিরোধপূর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে এখনও যুদ্ধ চলছে দেশে দেশে, আমার আর আপনার মাঝখানে সেসব রেখার মত একটা দাগ টেনে দিয়েছে নিয়তি, আমাদের সম্পর্কের শুরুতেই। সে-দাগ পার হতে গেলেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে জীবনটা।

আমি লণ্ডভণ্ড হতে চাই না। আমি চাই, ছোট্ট সাজানো একটা সংসার থাকবে আমার। প্রেমময় একজন স্বামী থাকবে, যার লক্ষ টাকা বেতনের চাকরির দরকার নেই, নায়কদের মত ওভারস্মার্ট

চেহারারও দরকার নেই; সুখে-দুঃখে যে পাশে থাকবে শুধু। থাকবে একটা কি বেশি হলে দুটো বাচ্চা, যাদের সব সাধ-আহ্লাদের কেন্দ্রবিন্দু হব আমি। আর থাকবে সাজানোগোছানো ছিমছাম একটা বাড়ি।

আপনিই বলুন, ওসব পাওয়ার জন্য রানা এজেন্সির লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার চিফের চাকরিটা ছাড়া কি জরুরি নয় আমার জন্য?

মা মরেছে অনেক আগেই, শেকড়ের টান বলতে যা ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে তার অনেকখানি ছিন্ন হয়েছে একইসঙ্গে, তারপর থেকে আমার আধপাগল বাপটা যাযাবরের মত জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার ছিমছাম বাড়িটা এখনও আছে। আগের মত সাজানোগোছানো হয়তো নয়, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে এই ক'বছরে জমানো বেতনের টাকা দিয়ে কি কিছু করা যাবে না? একটা স্কুলশিক্ষিকার চাকরিও কি জুটিয়ে নিতে পারব না নিজের জন্য?

হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি আমি, চলে যাচ্ছি আমার সব ফেলে। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, জানি চেষ্টা করলেই খুঁজে বের করতে পারবেন আমাকে, কিন্তু অনুরোধ করছি, সে চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনার মহাব্যস্ততার কারণে যতদিনে খুঁজে বের করবেন আমাকে ততদিনে হয়তো সাজানো সংসারের স্বপ্নটা পূরণ হয়ে যাবে আমার, কিন্তু ওই যে বলেছি তুষের আগুন জ্বলতেই থাকবে--ভয় হয় দীর্ঘবিচ্ছেদের পর আপনাকে দেখে আমার আবেগ না দাবানলে পরিণত হয়, পুড়িয়ে না ছাই করে দেয় আমার সবকিছু।

তবে চলে যাওয়ার আগে একটা রাতে বন্ধু হিসেবে আপনার সঙ্গ চাই আমি। নিজহাতে রেঁধে খাওয়াতে চাই, মোমবাতির আলোয় ছোট্ট একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে আমাদের দায়িত্ব-

কর্তব্য সবকিছু ভুলে গিয়ে গল্পগুজবে পার করতে চাই কিছুটা সময়। তারপর...। আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে যাবে বেঁকে। মেনে নেব সবই।

অ্যানি প্রিসলি আমার সবচেয়ে প্রিয় গায়িকা, তাঁর "সেপারেশন" গানটা আমার সবচেয়ে প্রিয় গান। এতবার শুনেছি ওটা যে, মুখস্থ হয়ে গেছে। কয়েকটা লাইন বাংলায় আমার মত করে অনুবাদের চেষ্টা করেছি, জানি সেটা আসলে কিছুই হয়নি, তারপরও বলছি--

দূরে যাওয়া মানে, প্রিয়,
ছেড়ে চলে যাওয়া নয়,
মনের মানুষ দূরে গেলে
আরও বেশি প্রিয় হয় ॥

ইস্তফাপত্র অথবা অন্য যে-নামই দিন না কেন আমার এই চিঠির, যদি আপনার বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে, অথবা আমি যদি কখনও কোনও কারণে আপনার অপছন্দের কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা করবেন।

শায়লা মারিয়া।

আস্তে আস্তে ভাঁজ করল রানা কাগজটা। তারপর আগের চেয়েও ধীরে ঢোকাল খামে। এনভেলপটা পকেটে রেখে দিয়ে খোলা জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। সহজসরল একটা মেয়ের অকপট ভালোবাসার কথা উঠে এসেছে চিঠিতে। মেয়েটা নিজেই জানে, এ ভালোবাসা চরিতার্থ হবার নয়।

মিলন হবে না, কিন্তু মনটা উদাস হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে বিকেলটা। তার লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিঃশব্দে কিন্তু নিশ্চিত পায়ে এগিয়ে আসছে সন্ধ্যা। নীড়ে ফিরতে শুরু করেছে পাখিরা দলে দলে। রাস্তার লাইটগুলো

জ্বলে উঠছে একটা-দুটো করে। কেন যেন থম মেরে গেছে আবহাওয়া।

শায়লার বাসায় যাবে রানা। গিয়ে আসলে কী বলবে কী করবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু যেতে ওকে হবেই।

মোবাইলটা আবারও হাতে নিল ও।

যে-অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর একটা ফ্ল্যাটে থাকে শায়লা, সেটার গ্রাউণ্ডফ্লোরে পৌঁছে গেছে ও। ভেস্টিবিউলের বাইরে, সিঁড়িতে একটা ব্যাগ নামিয়ে রেখে দরজা খুলে ব্যাগটা তুলে নিল, ঢুকল লবিতে। দেখা হয়ে গেল এক কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতির সঙ্গে, ওর পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে।

ওকে দেখে মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা, বললেন, 'কেমন আছ, বিশ্বসুন্দরী?'

হাসল শায়লাও। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'কোথায় আর? টোনাটুনির সংসারে এখন পর্যন্ত কোনও বাচ্চা টুনটুনি এল না, তাই একটু ঘুরেফিরে আসি।'

'ভালো। যান তা হলে।' একটা কোনা ঘুরল শায়লা, কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে নিজের মেইলবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাকেটদুটো নামিয়ে রাখল মেঝেতে। জিন্সের পকেট হাতড়ে বের করল চাবি, আনমনা হয়ে পড়েছে, ওর রান্না খেয়ে রানা কী বলবে কে জানে!

ও কি এতক্ষণে পড়ে ফেলেছে ওর ইস্তফাপত্র? যদি পড়ে থাকে, তা হলে না জানি কী ভাবছে! বেহায়ার মত সব কথা স্বীকার না করলেই কি ভালো হতো?

আচ্ছা, একটু আগে যে বাজছিল ওর মোবাইলটা, সেটা কি ও চিঠি পড়ামাত্র ফোন করেছিল বলে? পার্স খুলে বের করবে নাকি সেটটা? থাক, একবারে উপরে গিয়েই দেখা যাবে। নিশ্চয়ই কেয়ামত হয়ে যাবে না এই সময়ের মধ্যে?

চাবি বের করে মেইলবক্সের কী-হোলে ঢোকাল ও, মোচড় দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ভেস্টিবিউল, কানে তালালাগানো বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল পুরো বিল্ডিং। কংক্রিট, স্টীল আর কাঁচের সহস্র টুকরোর সঙ্গে শায়লার দেহের কোন্ খণ্ড কোথায় গিয়ে যে পড়ল বলতে পারবে না কেউ।

ছাব্বিশ

'সরি, দিস কণ্ট্যাক্ট ইয আনঅ্যাভেইলেবল নাউ। ...সরি, দিস কণ্ট্যাক্ট ইয আনঅ্যাভেইলেবল নাউ। ...সরি...'

লাইন কাটা না হলে আগামী ত্রিশ সেকেণ্ড ধরে একই কথা শোনানো হবে রানাকে ওর মোবাইল অপারেটরের পক্ষ থেকে।

শায়লা কি তা হলে সুইচ অফ করে দিয়েছে ওর মোবাইল?

নিজের সেটটা আস্তে আস্তে কানের কাছ থেকে সরাল রানা, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে।

কাজটা কেন করল মেয়েটা?

আগেরবার যখন ফোন করল রানা, রিসিভ করেনি শায়লা। কিন্তু মিস্‌ড্ কলে কার নাম আছে দেখেছে নিশ্চয়ই। তারপরও...

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা, কী করা যায় ভাবছে। হেইডনের সঙ্গে কথা বলবে নাকি?

কিন্তু কণ্ট্যাক্ট লিস্ট ঘেঁটে দেখা গেল, হেইডনের নাম নেই

সেখানে।

রানার মনে আছে, যে-রাতে ওর ঘরে এসেছিল নিকি, সে-রাতে ওকে ফোন করেছিল হেইডন। নম্বরটা ইচ্ছে করেই সেইভ করেনি ও।

যে-রাতে এসেছিল নিকি, সে-দিনের রিসিভড্ কল লিস্টে ঢুকল রানা। যে-সময়ে ছিল মেয়েটা এখানে, অনুমান করে চলে গেল তার কাছাকাছি। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে নম্বরটা। ওটা সিলেক্ট করে টাচস্ক্রীনের "কল" লেখাটা চাপল রানা।

'হ্যালো, কে বলছেন?' হেইডনও সম্ভবত সেইভ করে রাখেনি রানার নম্বর, তাই চিনতে পারছে না।

'মাসুদ রানা বলছি।'

'রানা! রানা বলছ? কোথায় তুমি?'

রানার ফোন পেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে হেইডন? কেন, ওকে কি কল করতে পারে না রানা?

'শোনো, হেইডন, একটা গরম খবর আছে তোমার জন্য।'

'এখন পর্যন্ত ঠাণ্ডা কোনও খবর আমাকে দাওনি তুমি। দেবেই বা কীভাবে? তন্দুরের ভেতর থেকে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা রুটি বের হয় না? বলো কী বলবে।'

'কিছুক্ষণ আগে আমার মেইলবক্সে একটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ পাওয়া গেছে।'

'কী পাওয়া গেছে?'

'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ।'

ও-প্রান্তে নীরবতা।

সম্ভবত খবরটা হজম করতে সময় লাগছে হেইডনের। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কে পেয়েছে?'

'আমি নিজেই।'

'জিনিসটা আসল তো? আই মিন, তোমার কিছু হলো না

যে?'

'কিছু হয়নি, তার কারণ এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অভ্যাস আছে আমার।'

'হুঁ, তা হলে দেখা যাচ্ছে তোমার ব্যাপারে আমার কিছু কিছু ধারণা একদম ঠিক নয়।'

'কোন্ ধারণা?'

'যেমন আমি মনে করতাম, তুমি বোধহয় শুধু মেয়েমানুষ নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করো। এখন দেখা যাচ্ছে...'

'ফালতু কথা রাখো। শোনো, যেজন্যে ফোন করেছি তোমাকে তা হলো, মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি মারিয়ার সঙ্গে, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না ওকে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যেহেতু আমার মেইলবক্সে বম রাখা হয়েছে, শায়লার মেইলবক্সেও রাখা হতে পারে।'

'কী?'

'তোমার কানের অসুখ সারানোর ক্ষমতা আমার নেই, হেইডন, সময়ও নেই। এখনই যেতে হবে আমাকে শায়লার ওখানে। শোনো, মেয়েটা আপাতত আমার গাড়ি ব্যবহার করছে। তুমি কি একটু কষ্ট করে কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারবে একটা গাড়িসহ? আমাকে শায়লার বাসায় নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে লোকটা। নইলে এই রাশ আওয়ারে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে হয় আমাকে।'

'কাউকে পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই আসছি তোমাকে নিতে। দশটা মিনিট অপেক্ষা করো।'

'ঠিক দশ মিনিট, মনে থাকে যেন। এক সেকেণ্ডও দেরি হলে...' কথা শেষ করতে পারল না রানা, লাইন কেটে দিয়েছে হেইডন।

মোবাইলটা নামিয়ে রেখে বেডরুমে গিয়ে ঢুকল রানা।

ড্রেসারের সবচেয়ে উপরের ড্রয়ারটা খুলল, বের করল সুইচ ব্লেডের একটা স্টিলেটো--প্রচণ্ড ধারাল সরু ফলাটা, ছুরির চেয়ে লম্বা কিন্তু তরবারির চেয়ে খাটো। সুইচে কয়েকবার চাপ দিয়ে দেখল ফলাটা ঠিকমত বেরিয়ে আসছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে ভাঁজ করল ফলা, শার্টের কলার ফাঁক করে মেরুদণ্ড বরাবর আস্তে করে ছেড়ে দিল অস্ত্রটা। কোমরের কাছে গিয়ে আটকে থাকল ওটা। একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, কিন্তু সেটা তেমন কোনও ব্যাপার না।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে চিরসঙ্গী ওয়ালথারটা বের করল এরপর। মেকানিযম ঠিক আছে, জানে ও, তারপরও অভ্যাস অনুযায়ী চেক করল একবার। অস্ত্রটাকে হোলস্টারে বন্দি করে তিনটে এক্সট্রা ম্যাগাযিন ঢোকাল পকেটে। ফিরে গেল লিভিংরুমে, তুলে নিল মোবাইল, শায়লাকে ফোন করল আরও একবার। ক্রমে উত্তরোত্তর অস্থির বোধ করছে রানা।

'সরি, দিস কন্ট্যাক্ট ইয আনঅ্যাভেইলেবল নাউ। ...সরি, দিস কন্ট্যাক্ট ইয আনঅ্যাভেইলেবল নাউ। ...সরি...'

আবারও একই জবাব।

দশ মিনিট না, সাত মিনিটের মাথায় কলিংবেল বাজল রানার অ্যাপার্টমেন্টের।

চলে এসেছে হেইডন।

চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়, পাগলের মত গাড়ি চালিয়েছে সে।

দরজা খুলে দেয়ামাত্র ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকল হেইডন। 'কোথায়, বোমাটা কোথায়?'

আঙুলের ইশারায় টেলিভিশন সেটটা দেখিয়ে দিল রানা।

এগিয়ে গিয়ে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটা তুলে নিল হেইডন, মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

'তোমার যত খুশি দেখো, দরকার হলে তরকারি বানিয়ে

খেয়ো, কিন্তু চলো রওনা দিই আমরা এখন। শায়লার ওখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।'

ঘাড় ঘুরাল হেইডন, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। তারপর, যেন বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল এক্সপ্লোসিভটা, ঘুরল। 'এখানে আসার আগে মিস্টার পিয়ার্সের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের দু'জনকে দেখা করতে বলেছেন তিনি।'

'করব। কিন্তু আগে শায়লার বাসায় যাব।'

'ঠিক আছে, চলো।'

আঙুলের ইশারায় দরজাটা দেখাল রানা। 'তুমি আগে।'

ভ্রূ কোঁচকাল হেইডন। 'কেন?'

'কারণ দরজাটা লক করতে হবে আমাকেই।'

কিছু না বলে করিডোরে বেরিয়ে এল হেইডন, হাঁটা ধরল সিঁড়ির দিকে। দরজা লক করে ওর পিছু নিল রানা।

গ্যারেজে গাড়ি ঢোকায়নি হেইডন--অতিথিদের গাড়ি সেখানে পার্ক করার নিয়ম নেই, রাস্তার ধারে রেখে এসেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে গেল হেইডন, প্রথমে ড্রাইভিং সিটের সঙ্গের দরজা খুলল, তারপর পাশেরটা। রানা হাজির হওয়ার আগেই গিয়ে বসে পড়ল ড্রাইভারের পাশের সিটে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে কিছুটা আশ্চর্য হলো রানা। 'কী ব্যাপার?'

'একটু কষ্ট করে চালাতে পারবে না?'

'আমার বাঁ পা...'

'জানি। তারপরও দেখো না একটু কষ্ট করতে পারো কি না। শায়লার বাসায় তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, তর্কাতর্কি করে মূল্যবান সময় নষ্ট কোরো না।'

ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা। 'তোমার কী হয়েছে নতুন করে? প্যারালাইসিস?'

জ্যাকেটের পকেটে চাপড় দিল হেইডন। ‘দেখতেই তো দিলে না বমটা। তুমি গাড়ি চালাও, আমি ওটা দেখি।’

কথা বাড়াল না রানা, ইগনিশন কী ধরে মোচড় দিল, ফার্স্ট গিয়ারে এনে গাড়ি ছাড়ল।

অফিস-আদালত ছুটি হয়েছে। রাস্তায় লোকজন বেড়েছে, বেড়েছে গাড়ির সংখ্যা। যাত্রী উঠানো-নামানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন বাসগুলো। একটা ট্যাক্সিক্যাবও থামছে না কোথাও, প্যাসেঞ্জার নিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে। চলতিপথে প্রত্যেক ক্রসিং-এ যতবার লালবাতি জ্বলছে, বিরক্তি তত বাড়ছে রানার, পাল্লা দিয়ে কমছে ধৈর্য। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল ও, আরও একবার ফোন করল শায়লাকে।

‘সরি, দিস কন্ট্যাক্ট ইয আনঅ্যাভেইলেবল নাউ। ...সরি, দিস কন্ট্যাক্ট ইয আনঅ্যাভেইলেবল নাউ। ...সরি,...’

এক্সপ্লোসিভটা উল্টেপাল্টে দেখছিল হেইডন, মুখ তুলে বলল, ‘বমটার তারগুলো নিশ্চয়ই সংযুক্ত ছিল তোমার মেইলবক্সের কী-হোলের সঙ্গে? চাবি ঘোরানোমাত্র...। খেয়াল করেছ, সাধারণ মানের একটা টাইমারও সেট করা আছে এটার সঙ্গে?’

উত্তর দিল না রানা, লালবাতি জ্বলেছে আবারও, ব্রেক করল।

ওর জবাবের অপেক্ষা না করে হেইডন তাকিয়ে আছে রিয়ারভিউমিররের দিকে।

আয়নাটার দিকে তাকাল রানাও।

দু’শ’ গজ পেছনে, কয়েকটা গাড়ির আড়ালে দেখা যাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশের একটা মোটরসাইকেল।

সবুজবাতি জ্বলল।

‘হাইওয়ের দিকে যাও, রানা,’ জোরাল কিন্তু শান্ত গলায়, সম্পূর্ণ অন্য ঢঙে বলল হেইডন।

‘তুমি যে শায়লার বাসায় যাওয়ার নতুন রাস্তা উদ্বোধন করেছ,

জানা ছিল না,' স্টিয়ারিং ঘোরায়নি রানা, যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই যাচ্ছে।

এক্সপ্লোসিভটা রেখে দিয়ে একথাবায় শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ অটোমেটিক বের করল হেইডন, নলটা রানার ঘাড়ে চেপে ধরল, কক করল অস্ত্রটা। 'যা বলেছি, করো!'

দেখে মনে হচ্ছে না, তেমন একটা আশ্চর্য হয়েছে রানা। 'আহ্, বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল তোমার ফোর ফাইভ। কী যে খুশি লাগছে, ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। তা, অস্ত্রটা কি এই প্রথম...'

'চুপ করো!'

'একবার কী যেন বলেছিলে আমাকে--সেরা পিস্তলটা সবসময় হোলস্টারেই থাকে, বের হয় যখন নিখুঁত লক্ষ্যভেদের দরকার শুধু তখন।'

'চুপ করতে বলেছি কিন্তু! বার বার আমার দিকে না তাকিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাও।'

'শায়লা ফোন ধরছে না কেন, হেইডন?'

'মরা মানুষ ফোন ধরে না।'

ধাক্কা লাগল রানার বুকে, কিন্তু সহ্য করল ও। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কখন? কীভাবে?'

হা হা করে হাসল হেইডন। 'এই তো কিছুক্ষণ আগে। আর কীভাবে? ভাবেটা তো আমার দুই পা'র মাঝখানে নিয়ে বসে আছি।'

'দোয়া করি ওটা যেন ওখানেই ফাটে।'

'শকুনের দোয়ায় গরু মরে না,' রানার ঘাড়ে ফোর ফাইভের চাপ বাড়াল হেইডন। 'বাসর ঘরের বউয়ের মত চুপ করে বসে থাকবে এখন, তোমার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করব

আমি। এক চুল নড়বে, সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে ঘাড়ের হাড়। বোঝা গেছে?'

কিছু বলল না রানা।

ওর শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিল হেইডন। বলল, 'এবার এক্সট্রা ম্যাগাযিনগুলো। একটাও যেন সঙ্গে না থাকে তোমার।'

ড্রাইভ করতে করতেই দুটো ম্যাগাযিন হেইডনের হাতে দিল রানা।

'তিনটা, মিস্টার মাসুদ রানা,' স্মরণ করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল হেইডন। 'আমরা জানি তুমি যখন কোনও অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হও, কমপক্ষে তিনটে এক্সট্রা ম্যাগাযিন রাখো নিজের সঙ্গে।'

তৃতীয়টাও হেইডনের হাতে দিল রানা। 'আমরা, হেইডন? শব্দটা কেমন পরিচিত লাগছে না? ক্যাভিংটনের কফিন প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরছিলাম, সঙ্গে ছিল সানি, রাস্তায় অ্যাকশন শুরু করল সে। তখন কী বলেছিল, জানো? বলেছিল, "ওদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আমরা।" '

কিছু বলল না হেইডন, রানার ঘাড়ে ফোর ফাইভটা চেপে রেখে অন্য হাত দিয়ে জানালার কাঁচ নামাল, একে একে তিনটে ম্যাগাযিনই ফেলে দিল বাইরে।

'তারমানে তুমিও একজন শার্প শুটার। নাকি বলব তুমি ওই সাবঅর্গানাইযেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি? জেমস বণ্ডের "এম"-এর মত আড়ালে থেকে পরিচালনা করছ তোমার এজেন্টদের?'

বিষদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে হেইডন, নিরুত্তর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে হাইওয়ে, কারণ দিক বদলাতে হয়েছে রানাকে। আকাশপাতাল ভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে। শায়লার বাসায় যাতে না যেতে পারে ও সেজন্য অফিস থেকে

ঝড়ের গতিতে ওর বাসায় ছুটে গিয়েছিল হেইডন। এক্সপ্লোসিভে মরণ হয়নি রানার, এখন যাতে হয় সেজন্য পিস্তলের মুখে নিয়ে যাচ্ছে...কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কে জানে কোথায়।

শায়লার বাসায় গেলে কোনও লাভ হতো না আসলে। সব শেষ হয়ে গেছে। মরে গেছে মেয়েটা। সহজসরল একটা মানুষ। সুন্দরী, শান্ত, হিসেবী। বয়সে রানার সঙ্গে যথেষ্ট ব্যবধান। তারপরও...

ভালোবাসা কী অদ্ভুত! রানা কখনও সহকর্মীর চেয়ে বেশিকিছু মনে করেনি মেয়েটাকে। প্রতি বছর দেখাও হতো অল্প কয়েকটা দিনের জন্য। হয়তো তাই জানতে পারেনি মেয়েটার মনের খবর। পারলেই বা কী হতো? চিঠিতে মুক্তপুরুষ বলেছে শায়লা রানাকে, খুব একটা ভুল বলেনি। সুলতা, মিত্রা, অনীতা, রেবেকা, রাফেলা, এমনকী সোহানাও তো বাঁধতে পারেনি ওকে...

মনে পড়ে যাচ্ছে লুবনার কথা, যে-কিশোরী চিরবিদায় নিয়েছিল রানাকে মিষ্টি একটা গান উপহার দিয়েই, তারপর এমনকী ঠিকমত ঘুমাতেও পারছিল না রানা...

চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এল ও। জ্বলছে বুকের ভের্তরটা, জ্বালা করছে দু'চোখ। দ্বিধাদ্বন্দ্বের আগুন গ্রাস করে নিয়েছিল শায়লাকে, আর রানা এখন জ্বলছে প্রতিশোধের আগুনে। রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকাল ও। আগের দূরত্ব বজায় রেখেছে মোটরসাইকেল, কিন্তু অনুসরণ যে করছে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

এখন কথোপকথন শুরু করতে হবে হেইডনের সঙ্গে। বাঁচতে চাইলে, শায়লার হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে চাইলে, হেইডনের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই হবে।

'আমাকে খুন করার পর ঘটনাটা ধামাচাপা দেবে কীভাবে, হেইডন? নাকি লুকোনোর দরকার নেই আদৌ?'

মুচকি হাসল হেইডন। 'তদন্ত যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে থাকবে। আমরাও আমাদের কাজ যেভাবে করছি সেভাবেই করতে থাকব। আর ধামাচাপা? কোনওকিছুই গোপন করার দরকার নেই। সময়ই মানুষের স্মৃতি থেকে সবকিছু আড়াল করে দেয়।'

'তারমানে আমার অনুমান ঠিক--সানিদের পেছনে তুমিই আছ। দলটা তুমিই গড়েছ। একটা অর্গানাইযেশনের ভেতরে আরঅর্গানাইযেশন। কিন্তু এসব করে লাভটা কী?' ওভারটেক করে একটা গাড়ি রানার সামনে চলে এসেছে, তাই গতি একটু কমাল ও।

'লাভ? তুমি ভিনদেশী মানুষ, তাই মার্কিনিদের ইতিহাস তেমন একটা জানো না। দেড় শ' বছর আগে সান ফ্র্যান্সিস্কোয় এ-রকম একটা দল গড়ে উঠেছিল। বিচারব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খুঁজে খুঁজে মারছিল ওরা চিহ্নিত ক্রিমিনালদের। আমরা অনেকটা ওদের মত। স্বীকার করো বা না করো, বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এদেশে, আর পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর ওই শব্দটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে আমার। কিন্তু সমাজরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে কাউকে না কাউকে, ঠিক না? যে বা যারাই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে আমজনতার জন্য, তাদেরকে সরিয়ে দেব আমরা। কাঁটা কিন্তু কাঁটা দিয়েই তুলতে হয়, জানো নিশ্চয়ই?'

'জানি। কিন্তু তোমার সীমাবদ্ধতাটা কোথায়, সেটা জানো? তোমার সীমাবদ্ধতাটা হচ্ছে, অপরাধীকে খুন করতে পারবে তুমি, অপরাধকে না। যে-সমাজকে রক্ষার দায়িত্ব গায়ের জোরে তুলে নিয়েছ নিজের কাঁধে, সে-সমাজ যদি জানতে পারে পুলিশ অফিসাররাই পালন করছে জল্লাদের ভূমিকা, তা হলে খুনখারাপি কত বেড়ে যাবে ভেবে দেখেছ? লোকে তখন তুচ্ছ ঘটনায়

একজন আরেকজনকে মেরে ফেলবে। দেখা যাবে, ব্যস্ত রাস্তা পার হচ্ছে কেউ তালকানার মত, তখন গাড়িতে থাকা কারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করে গুলি চালিয়ে দেবে লোকটা। স্পিড লিমিট ভাঙবে কেউ, জরিমানার টিকেটের ধার না ধেরে গুলি করে লোকটাকে মেরে ফেলবে ট্রাফিক অফিসার। প্রতিবেশীর কুকুরটা এসে যেই হাগু করে দেবে তোমার লনে, সঙ্গে সঙ্গে শটগানটা বের করে ঝাঁঝরা করে ফেলবে তুমি প্রতিবেশীকে।'

'অতিকল্পনা করে ফেলছ, মাসুদ রানা। আমরা কিন্তু সেসব মানুষকেই মারছি, যাদের ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে আইন-আদালত। আইন যদি তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করত, আদালত যদি স্বচ্ছভাবে নিরপেক্ষ রায় দিত, মৃত্যুদণ্ডই হতো ওসব লোকের।'

'তা-ই? তা হলে ক্যাভিস হ্যারিংটনের মৃত্যুটাকে ব্যাখ্যা করবে কীভাবে?'

রিয়ারভিউমিররে মোটরসাইকেলটা দেখল হেইডন। 'দুর্ঘটনা। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হাজির হয়েছিল লোকটা। নিয়তির লিখন বদলানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই নেই কারোরই?'

'তা-ই যদি হবে, তা হলে আমাকে জোর করে কেন নিতে চাচ্ছিলে তোমাদের দলে?'

'তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম আসলে। কিন্তু তুমি সে-সুযোগ নাওনি।'

'নিই কী করে, বলো? যাদেরকে সন্দেহ করি, হুট করে নিশ্চয়ই যোগ দেয়া যায় না তাদের সঙ্গে?'

'সন্দেহ? ভালো কথা মনে করিয়েছ। আমাদের ব্যাপারে তোমার মনে সন্দেহ ঢুকল কী করে বলো তো, শুনি। ভবিষ্যতে দরকার হলে আরেকটু সাবধান হওয়া যাবে,' দাঁত বের করে

নিঃশব্দে হাসল হেইডন।

'বলছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'কী?'

'রানা এজেন্সির কাজে বাধা দিচ্ছিলে কেন তুমি?'

'ও,' আবারও নিঃশব্দ হাসি হাসল হেইডন। 'আমার কাছে খবর ছিল ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে রানা এজেন্সির কাছে। জানতাম, তোমার এক এজেন্ট ছদ্মবেশে নজর রাখছে বেকারের ওপর। তোমরা যে তলে তলে লোকটার বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ জোগাড়ের ধান্দায় আছ, বুঝবে একটা বাচ্চা ছেলেও। বেকার ছিল আমাদের প্রথম প্রাইম টার্গেট, ওর আগের খুনগুলো ছিল যাকে বলে রেস্টুরেন্টের অ্যাপেটাইযারের মত। লোকটার বিরুদ্ধে যদি আসলেই প্রমাণ জোগাড় করে ফেল তোমরা, যদি আমাদের এতদিনের প্ল্যান মাঠে মারা যায়--ভেবে আমার লোকদের বলি, যখনই যেখানে পারে যেন হেনস্থা করে তোমাদেরকে। মন ভরেছে আমার জবাবে? এবার আমার মন ভরাও।'

'চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সেভেনের ক্লড,' গাড়ির গতি আরেকটু কমাল রানা।

'কী বললে?'

রানা টের পেল, ওর ঘাড়ে নিজের অজান্তেই পিস্তলের নলের চাপ কমিয়েছে হেইডন। বলল, 'বেকারের খুনের খবরটা দেখাচ্ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সেভেনে। ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্ট করছিল ক্লড নামের এক লোক। খবর পাঠিকা সুযানা জানতে চাইছিল, যে-ট্রাফিক অফিসার এলএপিডিতে রিপোর্ট করেছে ঘটনাটা, তার নাম জানতে পেরেছে কি না ক্লড। লোকটা বলল, পেরেছে, কিন্তু অফিসার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। ...তোমার চার শার্প শুটারের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হলো আমার সেদিনই

কেমন খটকা লাগল, গিয়ে ঢুকলাম তোমাদের ইনফর্মেশন সার্ভিস সেন্টারে, বেকারের খুন রিপোর্ট করেছে কে খবর নিলাম। ফোন করলাম ক্লডকে, নিজের পরিচয় দিয়ে ক্রসম্যাচ করে নিলাম ইনফর্মেশনটা। এভাবেই আমার সন্দেহের খাতায় চটজলদি উঠে এল সানি ডানহিলের নাম। তারপর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম--কবে নিরেট প্রমাণ জোগাড় করতে পারব ওর বিরুদ্ধে।'

উপহাসের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে হেইডন। 'নিরেট প্রমাণটা কী? তোমার সেই বুলেট? ওটা এখন আমার কাছে। যদিও জানি যে-জিনিস দিয়েছ আমাকে সেটা এক শ' ভাগ নকল।'

রানা কিছু বলল না।

'ওটা যে নকল, জানতে পারলাম কীভাবে--জিজ্ঞেস করলে না?'

'দরকার নেই, কারণ জবাবটা আমি জানি।'

'কী?'

'ট্রান্সমিটার।'

'বুঝে গেছ! তুমি তো দেখছি সাংঘাতিক মাল!'

হাইওয়েতে উঠল রানা। 'আরও কী কী বুঝতে পেরেছি--জিজ্ঞেস করবে না?'

'কী?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে হেইডনের, নিজেদের অসর্তকতায় বিরক্ত হচ্ছে।

'মনে আছে, প্রজেকশন রুমে কী বলেছিলে?'

'কী বলেছিলাম?' ভ্রূ আরও কুঁচকেছে হেইডনের, নিকট অতীত হাতড়াচ্ছে মনে মনে।

'বলেছিলে, "শুয়োরের বাচ্চা টার্নারকে আমার চাই-ই চাই। আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে একটা লোক দিব্যি খুনের পর খুন করে যাবে, আর আমাকে চুপচাপ সহ্য করতে হবে সব--তা হবে

না।” ’

‘হ্যাঁ, বলেছিলাম হয়তো। কিন্তু কী হয়েছে তাতে?’

‘খুনের পর খুন করে যাচ্ছিল টার্নার, চুপচাপ সহ্য করছিল অনেকেই, কিন্তু তোমার এত গা জ্বলুনি কেন, হেইডন?’

চুপ করে আছে হেইডন, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

‘সানি আর ওর তিন বন্ধুর পেছনে যে আরও কেউ থাকতে পারে,’ বলে চলল রানা, ‘সে-সম্ভাবনা ফাঁস করে দিয়েছ তুমি নিজেই, নিজেরই অজান্তে। আরও কথা আছে। যে-রাতে পড়লাম সানিদের ফাইলগুলো, পরদিন সকালে দেখা করতে গেলাম তোমার সঙ্গে। ফোনে কথা বলছিলে, আমাকে দেখে নামিয়ে রাখলে সেটা, তাড়াতাড়ি নিজের মোবাইল নিয়ে এস.এম.এস. পাঠালে কাকে যেন। কার কাছে পাঠিয়েছিলে সেটা? সানির কাছে?’

জবাব দিল না হেইডন, কিছুটা হলেও আনমনা হয়ে পড়েছে। ‘তোমার মত সবকিছু খেয়াল করতে পারলে, অনেককিছুই বুঝতে পারা...’

কথা শেষ করতে পারল না হেইডন, কারণ এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে পর পর তিনটে কাজ করেছে রানা।

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হঠাৎ মাথা নিচু করে ফেলেছে, তীক্ষ্ণ মোচড় দিয়েছে স্টিয়ারিং-এ, ডান পা দিয়ে পুরো চেপে ধরেছে ব্রেকপ্যাডেল।

গুলি করল হেইডন।

রানার ঘাড়ের লোম ঘেঁষে, ওর পাশের জানালার কাঁচ ছিদ্র করে দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। আকস্মিক ব্রেক করার কারণে ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে জোরে ঠুকে গেল হেইডনের মাথা, সামলে নেয়ার আগেই রানার বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি খেল সে নাকেমুখে, ফোর ফাইভ ধরা হাতের আঙুলগুলো আলগা হয়ে গেল

আপনাআপনি। রাস্তার সঙ্গে গাড়ির চাকার তীব্র ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ উঠল, শ্রাব্য-অশ্রাব্য গালি বেরিয়ে এল পেছনের ড্রাইভারদের মুখ দিয়ে, কেউ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে, আবার কেউ ব্রেক চেপে এড়াতে চাইছে সম্ভাব্য সংঘর্ষ। হর্ন চাপতে বাকি রাখেনি কেউই, তাই হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে হাইওয়ের প্রবেশমুখটা।

রানাদের গাড়িটাকে বাঁচাতে গিয়ে মাঝখানের লেনের তিনটে গাড়ি সজোরে ধাক্কা খেয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে, মাথা তুলে গিয়ার বদলে এক্সিলারেটর চেপে ধরার সময় ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষ এবং কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। এবার সিটের সঙ্গে বাড়ি খেল হেইডনের মাথা, ওর ফোর ফাইভটা কেড়ে নিয়ে ওটার বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে লোকটার নাকের ব্রিজ ভেঙে দিল রানা। নিজের দুই উরুর মাঝখানে রাখল হ্যাণ্ডগানটা, তারপর মুঠ করে ধরল হেইডনের চুল, রাস্তার ওপর চোখ রেখে লোকটার মাথা সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনল ড্যাশবোর্ড আর রেডিয়োসেটের ওপর--পর পর কয়েকবার। লোকটার মাথা না ফাটা পর্যন্ত থামল না।

'ঠিকই বলেছ, শায়লা,' অপার্থিব কোনও আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বিড়বিড় করে বলল ও, 'আমি মুক্তপুরুষ। এমনকী আজ আমি আইনেরও ধার ধারি না।'

সাতাশ

পেছনের ড্রাইভারদের মনে মরণভীতি সঞ্চার করে একবার ডানে,

আরেকবার বাঁয়ে কাটছে রানা। গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে উপড়ে গেল দুটো লাইটপোল, ডিভাইডারের ধাতব অংশের সঙ্গে ঘষা লেগে ফুলকি ছুটল একটানা কিছুক্ষণ। রানা চাইছে, দু'শ' গজ দূরের ওই মোটরসাইকেল আরোহীর মনের নিশ্চিন্ত ভাবটা যাতে বিদায় হয়, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যাতে কোনও একটা ভুল করে সে। রানাকে নিয়ে কী করবে তা আগে থেকে ভেবে রেখেছে শার্প শুটাররা, তাই এখন এমন কিছু করতে হবে ওকে যাতে ভজকট পাকিয়ে যায় ওদের পরিকল্পনা।

জানের মায়া আছে মোটরসাইকেল আরোহীরও; হাইওয়েতে রানার কারণে বার বার স্কিড করছে একের পর এক গাড়ি, তুমুল গতিতে ছুটে চলা কোনও গাড়ি ছিটকে এসে যাতে দফা রফা না করে দেয় সেজন্য অনেক পিছিয়ে পড়েছে লোকটা, কম করে হলেও আরও দু'শ' গজ--অনুমান করল রানা। লোকটা কে হতে পারে ভাবল, কিন্তু যখন কাছে ছিল তখনই বোঝা যায়নি ঠিকমত, আর এখন...

এক্সিট র‍্যাম্প ছাড়িয়ে এল রানা, তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সেকেণ্ডারি রোডে, তুমুল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। প্রথম দু'-এক মাইল কমবেশি বারো শ' ফুটের ব্যবধানটা বজায় রাখল মোটরসাইকেল আরোহী, তারপর আস্তে আস্তে কমতে লাগল গাড়ির সংখ্যা--"কাকে", "কেন" ধাওয়া করছে একজন "ট্রাফিক পুলিশ অফিসার" বুঝতে পেরে গতি কমিয়ে দিচ্ছে অন্য ড্রাইভাররা। সুযোগ বুঝে গতি অনেক বাড়িয়ে দিল মোটরসাইকেলের লোকটা, কাছিয়ে আসছে এখন।

ওকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে না রানার এখন--জনাথন রিডক্স।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা, একটু আগের খুনের নেশাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আবার।

গাড়ির ভেতরে কার কী অবস্থায় থাকার কথা ছিল জানে

রিডক্স, রেডিয়োতে কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে সে হেইডনের সঙ্গে, না পেরে মোটামুটি বুঝে গেছে কী ঘটেছে। আরও কাছে এল সে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে।

রিডক্সকে পিস্তল বের করতে দেখে মাথা নিচু করে ফেলেছিল রানা, গুলির শব্দটা হওয়ামাত্র ঝুঁকে পড়ল স্টিয়ারিং-এর ওপর। গুলিটা পেছনের কাঁচ ভেদ করে চুরমার করে দিল রিয়ারভিউমিরর, কাঁচের টুকরোয় যাতে ক্ষতি না হয় চোখের সেজন্যে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে রানা। কাজটা করার আগে শেষমুহূর্তে দেখেছে এগিয়ে আসছে একটা বাঁক, তাই আন্দাজে ঘুরাল স্টিয়ারিং। গাড়ি আচমকা দিক বদল করায় মসৃণ রাস্তায় পিছলে গেল চাকা, স্কিড করার আওয়াজ উঠল আবার, ডিভাইডারের ধাতব অংশে বাড়ি খেয়ে ফুলকি ছুটল আরেক দফা। চোখ খুলল রানা, মাথাটা তুলল একটুখানি, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় আনল গাড়িটাকে। সবুজ সাইনবোর্ডে সাদা কালিতে "বে এরিয়া" লেখাটা উদয় হয়েই সাঁ করে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

কিছুটা দূরে একটা টানাসেতু দেখা যাচ্ছে। ওটার ওপর উঠছে মস্ত একটা তেলট্যাঙ্কার লরি।

একহাতে মোটরসাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে রেখে আরেকহাতে গুলি করার জন্য আবার নিশানা করছে রিডক্স। কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে বার বার শিকে ছেঁড়ে না। সে শার্প শুটার হতে পারে, কিন্তু মোটরসাইকেল চালনায় সমান দক্ষ নয়--হাইওয়ের পাশের শক্ত পাথুরে জমিনে উঠে গেল ওর মোটরসাইকেলের চাকা, ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলল সে। একটা লাইটপোলের সঙ্গে ঘষা খেল ওর বাঁ কাঁধ, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে, কিন্তু যেভাবেই হোক সামলে নিল। পিছিয়ে পড়েছে, তাই গুলি করার ইচ্ছাটা আপাতত দমন

করে ধাওয়া করতে লাগল আবার।

টানাসেতুর ওপর উঠে পড়েছে ট্যাঙ্কার লরিটা, হালকা-ভারী যে-কোনও রকম আর কোনও ভেহিকেল যাতে ওটার সহচর হতে না পারে, সেজন্যে এখন যে-কোনও মুহূর্তে উঁচু হতে শুরু করবে সেতুর এদিকের অংশটা। সেতুতে উঠতে পারবে না রানা, কাজেই ব্রেকপ্যাডেল চেপে ধরল ও; টায়ার বলে কিছু যদি বাকি থেকে থাকে, সব পুড়ে শেষ হয়ে যাক, কিছু করার নেই। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। লাইট জ্বলছে-নিভছে সেতুর দু'পাশেই, এদিকের অংশটা একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে--

ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার গতিতে ছিল রানা, কী ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে নিল ও, সঙ্গে সঙ্গে পা সরাল ব্রেকপ্যাডেলের ওপর থেকে, গিয়ার বদলে জোরে চেপে ধরল এক্সিলারেটর। খ্যাপা ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠল ইঞ্জিনে; সিনেমার স্টান্টম্যানরা যেভাবে বোর্ডের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে উড়াল দেয় শূন্যে, সেতুর এদিকের অংশে অনেকটা সে-রকম ঘটনাই ঘটল। অদ্ভুত এক ফ্লাইংমেশিনের মত উড়ে গিয়ে সেতুর ওপর ল্যাণ্ড করল রানা। গাড়ির ওজন ও তীব্রবেগের কারণে ভেঙে পড়ল সেতুর এদিকের রকার প্যানেল।

রানার সন্দেহ হচ্ছে, গাড়ির একটা স্ক্রুও জায়গামত নেই, ঝাঁকিতে সব খসে পড়ে গেছে। কারণ সেতুর স্টীল পাটাতনের সঙ্গে যখন বাড়ি খেয়েছে গাড়িটা তখন বোমা বিস্ফোরণের চেয়ে কোনও অংশে কম আওয়াজ হয়নি। তারপরও পা সরাল না রানা এক্সিলারেটরের ওপর থেকে। সাংঘাতিক একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চালুই থাকল গাড়িটা, তবে তার আগেই রানার চাঁদিটা জোরে ঠুকে গেছে গাড়ির ছাদের সঙ্গে।

হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল স্টিয়ারিং, কয়েক হাজার তারা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না রানা, তারপরও আন্দাজের

ওপর ভর করে গাড়ি চালাল। গুঁতো খেয়ে ধরাশায়ী হলো আরেকটা লাইটপোল, ছিঁড়ে পড়ল বিদ্যুতের তার। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে টের পেয়ে কড়া ব্রেক কষল রানা। ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্য মাথাটা জোরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিল। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি।

এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে হেইডন, যে-সিটে বসে ছিল সে সেটার পায়ের কাছে গাড়ির মেঝেতে একটুখানি জায়গায় আপাতত ঠাঁই হয়েছে শয়তানটার। উড়ে গিয়ে উইণ্ডশিল্ডের সঙ্গে কীভাবে যেন আটকে গেছে এক্সপ্লোসিভটা, কপাল ভালো যে ফাটেনি।

টন টন করছে রানার বাঁ পা, জানিয়ে দিচ্ছে ব্যথা বাড়ছে উত্তরোত্তর। ডাক্তারের ওষুধে আরাম পাচ্ছিল শরীরের ব্যাণ্ডেজবাঁধা জায়গাগুলো, সে-আরাম হারাম হয়ে গেছে। দপদপ করছে মাথার ভেতরটা। কাটাছেঁড়া ছিল যেসব জায়গায়, নতুন উৎসাহে জ্বালাপোড়া করতে শুরু করেছে সে-জায়গাগুলো। সামনে তাকাল রানা।

কী দৃশ্য! দুর্দান্ত গতিতে টানাসেতুর উপরে উঠে এসেছে রিডক্সের মোটরসাইকেল, উড়াল দিয়েছে ওটাও, চমৎকার একটা রামধনু তৈরি করে সামনের চাকায় ভর দিয়ে ল্যাণ্ড করল এদিকে, টেনিসবলের মত লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে এখন।

প্রথমে ফার্স্ট, তারপর সেকেণ্ড গিয়ার দিল রানা, একটুও মায়া দেখাল না ইঞ্জিনের ওপর। গাড়ির নাকটা তাক করেছে রিডক্সের মোটরসাইকেলের দিকে, টিপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর ফ্লোরের সঙ্গে। বাহনটা তখনও সামলে উঠতে পারেনি রিডক্স। ওকে কোনও সুযোগই দিল না রানা।

ঘণ্টায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার গতিতে ছুটে গেল রানা। চলন্ত মোটরসাইকেল সামলানোর অবকাশ পেল না রিডক্স, সরেও যেতে পারল না বাহন ফেলে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার

তো প্রশ্নই ওঠে না। গাড়ির সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে আরেকবার উড়াল দিল মোটরসাইকেলটা, উড়ন্ত অবস্থাতেই আগুন ধরে গেল ওটাতে, আগুনের একটা বিশাল পিণ্ড হয়ে ল্যাণ্ড করল হেইডনের গাড়ির ছাদে, তারপর আছড়ে পড়ল পেভমেন্টে। ততক্ষণে উড়ে গিয়ে সেতুসংলগ্ন পাহাড়ি ঢালে আছড়ে পড়েছে রিডক্স, শক্ত পাথুরে জমিনে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেয়ে ছিঁড়ে গেছে ওর স্পাইনাল কর্ড এবং ভেঙে গেছে কোমর ও হাঁটুর হাড়, যে-জায়গায় পড়েছে সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে কয়েক শ' ফুট নীচে চ্যাপারেল গাছের জঙ্গলের দিকে নেমে যাচ্ছে ওর প্রাণহীন দেহটা।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে রানা, কারণ টানাসেতুটা নামছে--ও-প্রান্তে দেখা যাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশের আরও দুটো মোটরসাইকেল। হাজির হয়ে গেছে সানি ও হেল্ডন। ব্যাকগিয়ারে পিছাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় "নেভাল রিযার্ভ ডিফেন্স এরিয়া" লেখা একটা সাইনবোর্ড উপড়ে-ফেলল রানা গাড়ির বুটের ধাক্কায়। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই ওর, যে-জায়গা এককালে নেভাল বেইস হিসেবে ব্যবহৃত হতো, উঠে পড়ল সেখানে ঢোকার রাস্তায়।

ততক্ষণে টানাসেতুর মাঝামাঝি চলে এসেছে সানি আর হেল্ডন, কাছে চলে আসছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা।

যখন নৌঘাঁটি ছিল এই এলাকায়, পিচঢালা রাস্তা ছিল মসৃণ আর চকচকে; ঘাঁটি সরিয়ে নেয়ায় কর্তৃপক্ষের সুনজরও সরে গেছে। জায়গায় জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে কার্পেটিং, কোথাও আবার তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত; মামুলি সুরকি ফেলে দায়সারা মেরামতির কাজ হয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও গতি বাড়াতে পারছে না রানা, ঝাঁকুনি লাগলেই বেড়ে যাচ্ছে মাথার দপদপানি, মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে মগজের ভেতর। সানি বা হেল্ডনের এসব সমস্যা নেই, মোটরসাইকেলের হ্যাণ্ডেল এদিক-ওদিক করে অনায়াসে খানাখন্দ এড়াতে পারছে ওরা, দ্রুতই রানার কাছে চলে আসছে দু'জনে।

পালানোর উপায় দেখছে না রানা। এদিক-ওদিক তাকাল ও। এখন এমন একটা জায়গায় আছে যেটা বাতিল যুদ্ধজাহাজের পার্গেটরি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মৃত্যুর পর যেন অপেক্ষায় আছে ওগুলো শেষবিচারের। নোঙর করে একসারিতে রাখা হয়েছে অনেকগুলো জাহাজ, ক্ষয়া চাঁদের ঘোলাটে আলোয় আকাশের পটভূমিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে ওগুলোর ছায়ামূর্তি। তারপরও, একটা মুহূর্তের জন্য আশ্চর্য হলো রানা, প্রতিটা জাহাজের কামানগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের বড় বড় বুদ্বুদ দিয়ে।

বিনা নোটিসে কাঠের একটা গ্যাংওয়ের কাছে জোরে ব্রেক করল রানা, তবে ভাঙাচোরা রাস্তায় স্কিড করার আওয়াজটা তেমন স্পষ্ট হলো না এবার। গাড়ি থেমেছে কি থামেনি, দরজা খুলে লাফ দিয়ে বাইরে বের হলো ও, ছুটতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। সানি বা হেন্ডন কারোরই মুখোমুখি হতে চাইছে না ও, অন্তত এখনই নয়, কারণ স্টিলেটোটা বাদে কোনও অস্ত্র নেই ওর সঙ্গে। স্টান্টম্যানের মত জাম্প দেবার সময় কোথায় উধাও হয়ে গেছে হেইডনের ফোর ফাইভ, খুঁজে দেখারও সময় পায়নি।

একটা জাহাজের ডেক থেকে নেমে এসেছে প্রায়-খাড়া একটা কাঠের পাটাতন, হামাগুড়ি দিয়ে ওটা বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। দম ফুরিয়ে এসেছে, রিয়ারভিউমিররের ভাঙা কাঁচে শরীরের আরও কয়েক জায়গায় কেটে গেছে। ডান কানের নীচ দিয়ে চামড়া বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের ফোঁটা। একবার হোঁচট খেল ও, কিন্তু থামল না, তবে গ্যাংওয়ের শেষমাথায় পৌঁছে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। আরাম চাইছে শরীরটা, ইঁদুর-বিড়াল খেলাটা আর খেলতে চাইছে না মন, কিন্তু জোর করে নিজেকে টেনে তুলল ও। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, পার্গেটরির গেট দিয়ে ঢুকছে সানি আর হেন্ডন।

টলমল পায়ে ডেকের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। ওকে

খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি সানি বা হেল্ডনের, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিয়েছে দু'জনই, যতটা না রানাকে খুন করার উদ্দেশ্যে তারচেয়ে বেশি ভয় পাওয়ানোর জন্যে ট্রিগারে টান দিল ওরা। কোনও এক কামানের অ্যালুমিনিয়াম বুদ্বুদ ভেঙেচুরে উধাও হয়ে গেল বুলেটদুটো।

এখন যতটা আহত রানা, এরচেয়েও গুরুতর অবস্থায় নিজেকে বশ মানাতে পারত হয়তো, কিন্তু মাথার যন্ত্রণাটাই কাহিল করে ফেলেছে ওকে। দপদপানি এত বেড়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে লাফাচ্ছে গোটা মগজ, মনে হচ্ছে মাথার ভেতর বসে ইট ভেঙে খোয়া বানাচ্ছে কেউ। থামল ও কয়েকটা মুহূর্তের জন্য, ঝুঁকে পড়ল, হাঁ করে দম নিচ্ছে, চেষ্টা করছে শক্তি সঞ্চয় করার। একইসঙ্গে চঞ্চল দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক--সানি বা হেল্ডন যদি উঠে আসে জাহাজে তা হলে কোথায় লুকাবে ভাবছে।

রানার মত পাটাতন বেয়ে ওঠার ঝামেলায় গেল না সানি বা হেল্ডনের কেউই। পাটাতনের ওপর মোটরসাইকেল তুলে দিল ওরা, কোনও দর্শক না থাকার পরও চমৎকার কসরত দেখিয়ে দু'জনে বলতে গেলে উড়ে এসে পড়ল ডেকের ওপর।

হ্যাচওয়ে বরাবর ছুট লাগাল রানা, এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে ডেকের আরেকদিকে।

জোরে ব্রেক চাপল হেল্ডন, মোটরসাইকেলটা পুরোপুরি থামার আগেই নেমে পড়ল, হোলস্টার থেকে একটা রিপিটার থমসন বের করে এগিয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে কাছের হ্যাচটার দিকে। ওদিকে নিজের মোটরসাইকেল থেকে এখনও নামেনি সানি, ডেকের ঝাঁঝরওয়ালা স্টীলের পাটাতনে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে ধীর গতিতে। কিছুদূর গিয়ে হেল্ডনের মতই ব্রেক করল আচমকা, নেমে পড়ল, ডেকে পড়ে যেতে দিল নিজের বাহনটাকে। বের করল ওর প্রিয় পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন

ম্যাগনাম, দৌড় দিল একটা হ্যাচের উদ্দেশে।

আরও ঘোলাটে হয়েছে চাঁদের আলো, দুটো মোটরসাইকেলের জ্বলন্ত হেডলাইট ডেকের অন্ধকার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যেন। হ্যাচটার কাছে পৌঁছে পিঠ দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল সানি, সামান্য ঝুঁকে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। কিছুটা ঢোকার পর মনে হলো ওর, লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় উবু হয়ে বসে আছে কেউ একজন। ঝট করে ম্যাগনামের নল উঁচু করল সে, টান দিল ট্রিগারে। একটা মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই উধাও হলো লালচে গোলাপি স্ফুলিঙ্গ। বাজ পড়ার মত আওয়াজে প্রতিধ্বনি তুলল বুলেটের গর্জন, ঝনঝন শব্দে খসে পড়ল ধাতব কিছু, তারপর সব চুপচাপ।

বাল্কহেডের সঙ্গে সেঁটে গেছে রানা, হাঁ করে জিভ নীচের পাটির দাঁতের সঙ্গে চেপে ধরে মুখ দিয়ে দম নিচ্ছে যাতে একটুও আওয়াজ না হয়। তারপরও ওকে দেখে ফেলল হেল্ডন, গুলি করল সঙ্গে সঙ্গে। তাড়াহুড়োয় মিস করেছে, এবং সুযোগটা নিল রানা। চট্ করে ঢুকে পড়ল সরু করিডোরে, চলে গেল একটা খোলা দরজার আড়ালে।

এখন মুহুর্মুহু গুলি করছে দুই শার্প শুটার। একজন জেনে গেছে কোথায় আছে রানা, অন্যজন ট্রিগার টানছে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। স্টীল দেয়ালের চলটা আর শেকল কিংবা কোনও অকেজো ধাতব জিনিসে স্ফুলিঙ্গ তুলে, এবং যে-দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে রানা সেটাকে জায়গায় জায়গায় ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক বুলেট। একটা বুলেট এক ইঞ্চির জন্য মিস করল রানার নাক। গড়ান দিয়ে দরজার আড়াল ছাড়ল ও, অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে এখন, একটা লোহার সিঁড়ির উপস্থিতি টের পেয়ে ঝুলে পড়ল সেটাতে। ওর ভার সহ্য করতে কষ্ট হলো মরচে ধরা পুরনো সিঁড়িটার, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল বুলেটগর্জনের প্রতিধ্বনি ছাপিয়ে।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে হেল্ডন, দেখতে পাচ্ছে না রানাকে। কিন্তু সানি চট করে ঢুকে পড়েছে করিডোরে, একদৌড়ে হাজির হয়েছে দরজাটার কাছে, লোহার সিঁড়িটাকে এখনও কাঁপতে দেখে অনুমান করে নিল কোথায় গেছে রানা। দ্রুত হাতে রিলোড করল সে, হাজির হলো সিঁড়ির মাথায়। কিন্তু ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে ডাইভ দিয়েছে রানা, গাছ থেকে কাঁঠাল যেভাবে মাটিতে পড়ে সেভাবে পড়ল ও ল্যাণ্ডিং-এ, ব্যথা উপেক্ষা করে গড়াতে শুরু করল আবার--আশ্রয় নিতে চাইছে একটা ক্যাটওয়াকের নীচে। ততক্ষণে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করতে শুরু করেছে সানি, কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওর ছ'টা গুলির চারটেই লাগল লোহার সিঁড়ির আলাদা আলাদা ধাপে, বিং শব্দে ছিটকে গিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেল ওগুলো, বাকি দুটো ফুটো করল ল্যাণ্ডিংটাকে।

গুলি করার জন্য চুলকাচ্ছে হেল্ডনের হাত, দৌড়ে এসে সে-ও ঢুকল করিডোরে। যেখানে একজনেরই জায়গা হয় না ঠিকমত, সেখানে সানির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ঠাসাঠাসি হয়ে গেল ওর। এখানে এসে ভুল করেছে বুঝতে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড নষ্ট করে ফেলল সে, সানি ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রিলোডিং-এ, সুযোগ বুঝে চট করে সরে গেল রানা ক্যাটওয়াকের নীচ থেকে।

সিঁড়ির মাথায় একটুখানি জায়গায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে সানি আর হেল্ডন, উঁকিঝুঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক দেখছে দু'জনই, কখনও বসে পড়ে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে রেলিং-এর ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কিন্তু দু'জনের কেউই দেখতে পাচ্ছে না রানাকে। তাজ্জব ব্যাপার! লোকটা কি গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে কোথাও? নাকি ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে ল্যাণ্ডিং-এর কোনও কোনায়?

টানা গোলাগুলির পর হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে সব, এই নীরবতা বড় বেশি লাগছে কানে। কী করবে বুঝতে পারছে না সানি রা হেল্ডন। সিঁড়ি বেয়ে ল্যাণ্ডিং-এ নামার সাহস হচ্ছে না

দু'জনের কারোরই--যদি গুলি করে রানা? আবার করিডোর ছেড়ে বের হতেও ইচ্ছা করছে না--ওরা নিশ্চিত, ল্যাণ্ডিং-এরই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে লোকটা।

'সানি?' ফিসফিস করে ডাকল হেল্ডন।

'উঁ?'

'লোকটা একবারও গুলি করেনি, খেয়াল করেছ?'

'হুঁ।'

'আমার মনে হয় ফায়ার আর্মস নেই ওর কাছে।'

'অন্যকিছু থাকতে পারে।'

'কী?'

'ধাতব কোনও কিছু। আলগা জিনিসের তো অভাব দেখছি না জাহাজের ভেতরে।'

'কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই দূর থেকে ছুঁড়ে আমাদের ঘায়েল করতে পারবে না ও?'

'হতে পারে,' লোহার সিঁড়ির প্রথম ধাপে সাবধানে পা রাখল সানি।

'মুঠোর ভেতরে পেয়ে গেছি আমরা লোকটাকে...'

ক্যাটওয়াকের নীচ থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল আর ধূলিধূসরিত কিছু মালের আড়ালে চলে এল রানা, একেবারে নিঃশব্দে। চট করে যাচাই করে নিল পরিস্থিতি।

ওর মাথার পনেরো-বিশ ফুট ওপরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সানি, এবং সম্ভবত হেল্ডনও, দেখা যাচ্ছে না দু'জনের কাউকেই। রানার পক্ষ থেকে যে-কোনও একটা ভুল, অথবা সামান্য একটু শব্দের আশায় আছে দু'জনই।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, ঘুটঘুটে অন্ধকারে আছে সে-ও। এখন গুলি করলে মেঝের দিকে নিশানা করে ট্রিগার টানবে সানি বা হেল্ডন, কারণ ওরা ধরে নেবে চুপিসারে পালাতে গিয়ে মাথা

তোলার সাহস পাবে না রানা, সাপের মত বুকে হেঁটে কাজ সারতে চাইবে। কিন্তু ওদের ধারণাটা ভুল।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা--শক্ত সোলের জুতো পরেনি ও। খুলে ফেলল শার্টের ইন, বিনা আওয়াজে বের করে আনল স্টিলেটোটা। দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দ পায়ে পৌঁছে গেল ল্যাণ্ডিং-এর শেষমাথায়, এখান থেকে অত্যন্ত সরু একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ডেকে। ভুলেও সিঁড়ির কোনও ধাপে পা রাখল না রানা, দাঁতে কামড়ে ধরল স্টিলেটো, লোহার যে-মোটা পাইপ বেয়ে বেয়ে উঠে গেছে সিঁড়ির ধাপগুলো, দু'হাত রাখল সেটাতে। ক্ষীণতম আওয়াজও না করে ঝুলে পড়ল পাইপে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওপরে উঠছে।

চাঁদের আলো মরেছে পুরোপুরি, মোটা মেঘ যেন পর্দা টেনে দিয়েছে আকাশে, আলকাতরার মত কালো অন্ধকারে ঢেকে আছে পুরো ডেক। ওপরে উঠে এসে সুইচ চেপে স্টিলেটোর ফলা বের করল রানা, জুতো জোড়া খুলে নিয়ে গুঁজল বেল্টের নীচে নাভির কাছে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে এগোচ্ছে এখন। জানে ওকে বেশি সময় দেবে না শত্রুপক্ষ।

করিডোরে হাজির হলো ও, চলে এল দরজার আড়ালে। শুনল ফিসফিস করে কথা বলছে সানি আর হেল্ডন, '...আলগা জিনিসের তো অভাব দেখছি না জাহাজের ভেতরে।'

'কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই দূর থেকে ছুঁড়ে আমাদের ঘায়েল করতে পারবে না ও?'

'হতে পারে।'

'মুঠোর ভেতরে পেয়ে গেছি আমরা লোকটাকে...'

কথাটা শেষ করতে পেরেছে কি পারেনি হেল্ডন, দরজার আড়াল ছেড়ে বের হলো রানা, হেল্ডনের কাঠামোটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না অন্ধকারেও।

দু'হাত দিয়ে ধরল রানা স্টিলেটোটা, হেল্ডন আর ওর

মাঝখানের দূরত্বটুকু অতিক্রম করল চোখের পলকে, তারপর হেল্ডনের ঘাড়ের নীচে মাংসল জায়গায় দু'হাতের জোরে ঢুকিয়ে দিল সরু কিন্তু সাংঘাতিক ধারাল ফলাটা, অস্ত্রটা ধরে রেখে ঝপ্ করে বসে পড়ল হেল্ডনের পেছনে। ওর ভারে হেল্ডনের ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত মাংস চিরে ফাঁক করে দিল স্টিলেটোটা।

আপনাআপনি আলগা হয়ে গেছে হেল্ডনের মুঠি, ঠং আওয়াজে খসে পড়েছে রিপিটার থমসন, একইসঙ্গে প্রচণ্ড মরণ আর্তনাদে সানির কলজে তো বটেই পুরো জাহাজ কাঁপিয়ে দিয়েছে সে। ফিনকি দিয়ে বের হয়ে রানার নাক-মুখ ভিজিয়ে দিয়েছে ওর রক্ত। স্টিলেটোটা বের করে নিয়েই প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল রানা হেল্ডনকে। ততক্ষণে ভয়ার্ত গলায় 'কৃ-কী হয়েছে!' বলে অর্ধেক ঘুরতে পেরেছিল সানি, কোমর ছাড়িয়ে একটু ওপরে তুলতে পেরেছিল ম্যাগনাম, হুড়মুড় করে ওর গায়ে গিয়ে পড়ল হেল্ডন।

পুরনো মরচেধরা সিঁড়ি একটু আগে রানার ভার নিতে গিয়েই ক্যাঁচকোঁচ করছিল, এখন হেল্ডন আর সানি একসঙ্গে গড়িয়ে নামতে শুরু করায় সহ্য করতে পারল না ওজনটা, করিডোরের সঙ্গের জয়েন্ট ছুটে গিয়ে ধসে পড়ল ল্যাণ্ডিং-এ। ব্যথায় চিৎকার করারও ক্ষমতা নেই হেল্ডনের, ইতোমধ্যেই যথেষ্ট রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে গেছে সে, এবার গলা ফাটাল সানি--একদিকের রেলিং-এ জোরে ঠুকে গেছে ওর মাথা। গড়িয়ে পড়ার সময় হেল্ডনের নীচে বেকায়দায় চাপা পড়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে ডান হাতের কব্জিতে, অবশ্য দু'হাত দিয়েই গুলি করতে পারে সে। সবচেয়ে বড় কথা, ম্যাগনামটা হারিয়েছে--যে-জিনিস সঙ্গে না নিয়ে এমনকী ঘুমায়ও না।

'সানি?' করিডোরের এককোনায় নিজেকে আড়াল করে হাঁক ছাড়ল রানা।

জবাব দিল না সানি, ম্যাগনামটা হারিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে

গেছে, বিনা অস্ত্রে রানার মুখোমুখি হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারছে না।

'কী যেন বলছিল তোমার বন্ধু?' বলে চলল রানা। 'মুঠোর ভেতরে পেয়ে গেছ আমাকে, না? কী মনে হয় তোমার? কথাটা ঠিক?'

সানি চুপ, নিজের ওপর থেকে আস্তে আস্তে ঠেলে সরাচ্ছে মরার মত পড়ে থাকা হেন্ডনকে। বার বার রক্ত লেগে গিয়ে পিচ্ছিল থেকে আরও পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে ওর হাতদুটো।

'অভিজ্ঞতার অভাব, সানি। অভিজ্ঞতার ভীষণ অভাব তোমাদের। রিভলভার দিয়ে ভালো টার্গেটশুটিং করতে পারো তোমরা--নাকি বলব, পারতে একসময়--কিন্তু ওই পর্যন্তই দৌড় তোমাদের। অস্ত্র ছাড়া তোমরা একদম অচল, যেমন এখন। এত সামান্য ক্ষমতা নিয়ে সমাজসংস্কার করা যায় না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সানি, কিন্তু থেমে গেল--অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সাইরেনের পরিচিত শব্দ। ভূতের ভয়ে কাঁপতে থাকা একজন লোক গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনলে যেভাবে সাহস ফিরে পায়, ঠিক সেইভাবে আশার সঞ্চার হলো সানির বুকে--কোনওভাবে যদি পৌঁছাতে পারে পুলিশের গাড়িগুলোর কাছে, বাঁচতে পারবে রানার কবল থেকে। ম্যাগনামের আশা বাদ দিয়ে রানার মতই প্রথমে বাতিল মালগুলোর কাছে, তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ডেকে হাজির হলো সে।

ততক্ষণে ডেকে হাজির হয়েছে রানাও--বুঝে গেছে ম্যাগনাম হারিয়েছে সানি, সে কী করতে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পেরেছে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে এল এমন সময়, বিশ হাত তফাতে দাঁড়ানো সানিকে দেখতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না রানার।

সানিও দেখতে পাচ্ছে ওকে। নিজের অবস্থাটা বিবেচনা করল সে। ওর কাছে কোনও অস্ত্র নেই, অথচ রানার ডান হাতটা প্রায়

দেড় হাত লম্বা হয়ে আছে। ওটা কী, জানে না সানি; কিন্তু ওটা দিয়েই যে লোকটা হেন্ডনের দফা রফা করেছে, বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

আনআর্মর্ড কমব্যাটে পারদর্শী সানিও, সেটাই প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিল সে। কমব্যাটের আগে যেভাবে পজিশন নিতে হয় সেভাবে দাঁড়াল, উদাত্ত গলায় বলল, 'ফেলে দিন আপনার হাতের অস্ত্র, বলছেন ম্যাগনাম ছাড়া আমি অকেজো--সাহস থাকলে সেটা প্রমাণ করে দেখান।'

এই অবস্থাতেও সানির ওপর কিছুটা মায়া হলো রানার। জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে স্টিলেটোটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল ও। পাত্তা দিচ্ছে না মাথাব্যথাটাকে, শরীরটা ঢিলা করে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সানির দিকে।

কিছুটা ঝুঁকল সানি, ভাবখানা এমন, কাছে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে রানার ওপর।

নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছাল রানা, তারপর সানিকে চমকে দিয়ে ছুট লাগাল, চট করে বসে পড়ে সামাল দিল গতি, ডান পা-টা আগে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই হামলার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সানি, যতক্ষণে বুঝতে পারল কী ঘটাচ্ছে রানা ততক্ষণে রানার প্রচণ্ড একটা লাথি এসে লেগেছে ওর ডান পা'র গুল্‌ফের গোল হাড়ে। ব্যথায় চিৎকার করার অবকাশও পেল না সে, কারণ লাথিটা মেরেই জুতোর ডগা দিয়ে ফুটবলের বাইসাইকেল কিকের মত আরেকটা লাথি চালিয়েছে রানা, সেটা লেগেছে সানির চিবুকে। কাত হয়ে একপাশে পড়ে গেল সে, অখণ্ড নীরবতায় ধপাস শব্দটা বড় বেশি বাজল কানে।

উঠে দাঁড়াল রানা। একইসঙ্গে সময় দিচ্ছে নিজেকে, সানিকে।

উঠে দাঁড়াল সানিও, রানাকে আর কোনও সুযোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছুটে এল স্প্যানিশ বুলের মত। এবার চরকির মত

পাক খেয়ে সাইড কিক মারল রানা, টাইমিংটা হলো নিখুঁত। ডান কান আর চোয়ালে এক মণ ওজনের একটা আঘাত পেল সানি, থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, হাজারটা তারা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

ডান পা নামাল রানা, বাঁ পা'র ওপর ভর দিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পজিশন চেঞ্জ করল, ল্যাণ্ড করামাত্র বাম পা কাজে লাগিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পর পর দুটো লাথি মারল সানিকে--দুটোই ওর ডান উরু আর হাঁটুর মাঝামাঝি জায়গায়, ভেতরের দিকে।

স্বাভাবিক রিফ্লেক্স অ্যাকশনে আহত জায়গাটা চেপে ধরল সানি, মুখটা হাঁ করে নিচু হয়ে গেছে অনেকখানি, গলা বেয়ে উঠে আসা চিৎকারটা চেপে রেখেছে জোর করে। ডান পা নামিয়ে বাঁ পায়ে ওর নাকেমুখে ফুটবলের ভলি মারার কায়দায় পঞ্চম লাথিটা মারল রানা। এবার সানি পড়ল চিৎ হয়ে, আগেরবারের চেয়ে জোরে আওয়াজ করে।

উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল ওর, ততক্ষণে ওর খুব কাছে চলে গেছে রানা। ঘুসিটা আসবে, জানত ও, শরীরের সব ভার মুহূর্তের মধ্যে বাঁ পা'র ওপর দিয়ে আঘাতটা এড়াল শেষমুহূর্তে, ডান পা-টা আলগা করে নিয়ে ষষ্ঠ এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জোরাল লাথিটা মারল সানির পেটে। হুঁক করে ফুসফুসের সব বাতাস বের করে দিল সানি, সঙ্গে সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা, কী হচ্ছে বুঝে উঠবার আগেই রানার হিপথ্রো খেয়ে ডেকের স্টীলের ঝাঁঝরির ওপর আছড়ে পড়ল সানি।

তৃতীয় দফায় যখন উঠে দাঁড়াল সে তখন মদ্যপের মত টলছে সে, ব্যাপারটা ফাঁদ হতে পারে জেনেও ওর কাছে গেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে দুইহাতে একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল সানি; প্রতিটা ঘুসিতে বাড়ছে ওর আক্রোশ, কমছে শরীর আর ফুসফুসের জোর। অবলীলায় দু'হাত চালিয়ে ঘুসিগুলো ঠেকাচ্ছে রানা, ক্লান্ত থেকে আরও ক্লান্ত হতে দিচ্ছে সানিকে। যখন টের পেল জোর

ফুরিয়েছে সানির, তখন ওকে একটা মুহূর্তেরও অবকাশ না দিয়ে চালাতে শুরু করল নিজের দুই হাত। হুক, জ্যাব, পাঞ্চ--একটার পর একটা আঘাত করছে ও, থেঁতলে যাচ্ছে সানির নাক, ঠোঁট, চোয়াল, থুতনি। ওর নাকের ফুটো আর জায়গায় জায়গায় কেটে যাওয়া ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে সমানে, তবুও থামাথামির কোনও লক্ষণ নেই রানার মধ্যে। অন্ধ আক্রোশ এতক্ষণে গিলে নিয়েছে ওকে।

'শায়লার মেইলবক্সে এক্সপ্লোসিভ ফিট করেছিল কে, সানি?' মারতে মারতে জিজ্ঞেস করল ও।

জবাব দিল না সানি, জবাব দেয়ার মত অবস্থা নেই ওর।

শেষ ঘুসিটা মারার আগে দুই মুহূর্তের একটা বিরতি দিল রানা, দম নিল লম্বা করে, শরীরের সব শক্তি জড়ো করল মুঠ করে রাখা ডান হাতে, তারপর ঘুসিটা মারল সানির ঠিক লিভারের ওপর।

পড়ে গেছে সানি, নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর মধ্যে, কিন্তু রানা জানে মরেনি শয়তানটা। বাচ্চারা যেভাবে হামাগুড়ি দেয়, দু'-তিন মিনিট পর সেভাবে এগোতে শুরু করল সে নিজের মোটরসাইকেলের দিকে; এগোচ্ছে আর বুকে-পেটে রানার একটা করে লাথি খাচ্ছে, বার বার ওকে জিজ্ঞেস করছে রানা, 'শায়লার মেইলবক্সে বোমা রেখেছিল কে?' কিন্তু সানির অসাড় হয়ে আসা জিভ সে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না, জিভটা ঠিক থাকলেও প্রশ্নটার জবাব সে দিত কি না সন্দেহ।

সানি কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে রানা, দৌড়ে হাজির হয়ে গেল ও কাঠের গ্যাংওয়ের কাছে, ওকে হতভম্ব করে দিয়ে তক্তাদুটো ফেলে দিল নীচের পানিতে। তারপর আবার দৌড়ে হাজির হলো হেন্ডনের মোটরসাইকেলের কাছে, খাড়া করল ওটাকে, একফাঁকে কুড়িয়ে নিয়েছে নিজের স্টিলেটোটা। চড়ে বসল, স্টার্টারে লাথি মারছে--একবার, দু'বার, তিনবার। গর্জন

তুলে চালু হলো ইঞ্জিন। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে স্টান্টম্যানের কায়দায় হ্যাণ্ডেল ধরে মোটরসাইকেলটাকে ঘোরাল রানা, তাক করল সানির দিকে। ফুল থ্রটলে, টায়ার পুড়িয়ে রওয়ানা হলো।

রানাকে ছুটে আসতে দেখে কলজে শুকিয়ে গেল সানির, হাঁচড়েপাঁচড়ে পৌঁছাল নিজের মোটরসাইকেলের কাছে, চড়ে বসল। প্রাণে বাঁচার তাগিদে চালু করল বাহনটা, ওর ঘাড়ের ওপর প্রায় এসে পড়েছে রানা এমন সময় স্কিড করে বেরিয়ে গেল, জাহাজের একপ্রান্ত ধরে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে যাচ্ছে।

অল্পের জন্য সানিকে মিস করেছে রানা, ব্রেক চাপল ও। আবারও একই ভঙ্গিতে ঘোরাল বাহনটা, ছোটাল ওটাকে, গতি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে গেল আশি কিলোমিটারে। একহাতে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে গেছে অত্যন্ত বিপজ্জনক ভঙ্গিতে, আরেকহাতে দেখা যাচ্ছে স্টিলেটোটা।

রানা কী করতে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে হোক অথবা না পেরে, মরণভয় দেখা দিল সানির চোখে, আরেকটু সরতে গিয়ে জাহাজের একপ্রান্তের সঙ্গে প্রচণ্ড ঘষা খেল ওর মোটরসাইকেল। হাজার স্ফুলিঙ্গ ছুটে যাচ্ছে পেছনের চাকার দিকে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে গেল বাহনটাতে।

চট করে বসে পড়ল রানা, দু'হাতে ধরল মোটরসাইকেলের হ্যাণ্ডেল, গতি আগের মতই রেখে সামনের চাকা দিয়ে ধাক্কা মারল সানির মোটরসাইকেলে। আঁতকে উঠে চিৎকার করল সানি, আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর, কী করবে বুঝতে পারছে না। ব্রেক চেপে খানিকটা পিছিয়ে পড়ল রানা, কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল সানিকে, তারপর আবার গতি বাড়িয়ে ধাক্কা দিল, এবার ওর সামনের চাকাটা ঠেসে ধরে রেখেছে সানির জ্বলন্ত বাহনটার গায়ে।

বিস্ফোরিত হলো সানির মোটরসাইকেলের পেছনের চাকা, ব্যালেন্স হারিয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল সে, ঘাড় ঘুরিয়ে

তাকাল রানার দিকে।

'শায়লার মেইলবক্সে বোমা রেখেছিল কে?' আবারও জানতে চাইল রানা, সুইচ চেপে বের করেছে স্টিলেটোর ফলা।

'আমি,' সানি বুঝতে পারছে অলৌকিক কোনও উপায় ছাড়া রানার কবল থেকে পরিত্রাণ নেই ওর। 'আমি তৈরি করেছি, সেট করেছে...'

রানা বুঝে নিল, কাজটা কার। আজ সন্ধ্যায় সানি ও রিডক্স যখন রানার মৃত্যু নিশ্চিত করছিল, হেন্ডন তখন গিয়েছিল মারিয়ার ওখানে।

আরেকবার ব্রেক চাপল রানা, পিছিয়ে পড়ল একটুখানি, তারপর আগের মত গতি বাড়িয়ে পাশাপাশি হলো সানির। ওকে মুহূর্তমাত্র সময় দিল না, স্টিলেটোটা পাশ থেকে গেঁথে দিল ওর কানের ভেতরে, তীক্ষ্ণ ধারাল ফলা খুলির হাড় ভেদ করে ঢুকে গেল মগজে।

সানির হাত থেকে ছুটে গেল হ্যাণ্ডেল, আছড়ে পড়ল সে ঝাঁঝরওয়ালা স্টীলের ডেকের ওপর, প্রচণ্ড জোরে ঠুকে যাওয়ায় ফেটে গেল মাথা।

জাহাজের শেষপ্রান্তে এসে গেছে রানা, একবার ব্রেক চেপেই ডাইভ দিল একপাশে, উড়ে গিয়ে পড়ল ডেকের ওপর। মোটরসাইকেলটা তখন সজোরে বাড়ি খেয়েছে ডেকের একটা কোনার সঙ্গে, শূন্যে উঠে গেছে পেছনের চাকা, পুরো বাহনটা রেলিং-এর ওপর চক্কর খেল, দু'-এক সেকেণ্ড পরই ঝপাস আওয়াজ শোনা গেল নীচের পানিতে। রানার গায়ে পানি ছিটে এসে লাগল।

ইতোমধ্যে গড়াতে শুরু করেছে ও, সরে যাচ্ছে দূরে--চোখের কোনা দিয়ে দেখেছে আগুন ধরে গেছে সানির মোটরসাইকেলের অয়েলট্যাঙ্কে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরিত হলো সেটা, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল সানি।

আরও দু'বার গড়ান দিয়ে উঠে বসল রানা, হাঁপাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ বসেই থাকল ওভাবে। ওর শরীরের কী হাল হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছে না। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর সাহসও পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তেল ছড়িয়ে পড়ছে সানির মোটরসাইকেলের ট্যাঙ্ক থেকে, আগুন বাড়ছে তাই। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না ডেকের ওপর।

আঁচড়েপাছড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঠিক তখনই খোলা সাগরের শক্তিশালী বাতাস ধাক্কা মারল ওকে, আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিল ও। জাহাজ থেকে নামার একটাই কায়দা আছে এখন এবং সেটাই অবলম্বন করল ও--একদিকের রেলিং-এ চড়ে আস্তে করে ছেড়ে দিল শরীরটা, ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। নোনা পানিতে যেন জ্বলে উঠল সারা গায়ের ক্ষতগুলো। দাঁতে দাঁত চেপে কয়েকটা ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে তীরে এসে উঠল।

বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে রানা, ঢিলে করে দিয়েছে শরীরের প্রতিটা মাংসপেশি, শুধু কান বাদে ছুটি দিয়েছে সব ইন্দ্রিয়কে। শুনতে পাচ্ছে, জোরাল বাতাসটা বইছে একটু পর পর--অসময়ের ঝড় আসবে সম্ভবত। কিছুক্ষণ আগেও ঝিঁঝির ডাক শুনেছিল, থেমে গেছে হঠাৎ করেই। পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছে সানির মোটরসাইকেলের তেল, জ্বলে জ্বলে ছাই হচ্ছে বাহনটা।

সাইরেনের আওয়াজ না শুনেছিল রানা? তা হলে এখন শুনতে পাচ্ছে না কেন? পুলিশ কি এসে গেছে?

চোখ খুলল রানা। কোথাও কোনও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আবারও মেঘের পর্দায় ঢাকা পড়েছে চাঁদ, কোনওকিছু ঠিকমত ঠাহর করা যায় না অন্ধকারে।

বালির ওপর পড়ে থাকতে পারলে যারপরনাই খুশি হতো শরীরটা, কিন্তু মনের ওপর আবারও একবার জোর খাটাল রানা, নিজেকে টেনে তুলে হাঁটা ধরল হেইডনের গাড়িটার দিকে। সেটার কাছে পৌঁছে ড্রাইভিং সিটে বসে দরজাটা আটকেছে কি

আটকায়নি, পাশের সিটের জানালার কাছে শোনা গেল হেইডনের কণ্ঠ, 'এত তাড়া কীসের, রানা?'

ডান হাতটা লম্বা হয়ে গেছে লোকটার--নিজের ফোর ফাইভটা খুঁজে পেয়েছে।

কিছু বলল না রানা।

'বুঝলাম না,' আবারও বলল হেইডন, 'যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে সেখানে যাওয়ার সময় আমার হ্যাণ্ডগানটা নিয়ে গেলে না কেন?'

'নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাতের কাছে পাইনি। খুঁজবার মত সময়ও ছিল না।'

'জাহাজে গিয়ে উঠলে তোমরা তিনজন, ফিরে এলে তুমি একা, বাকি দু'জন...'

'নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে পূরণ করে নাও শূন্যস্থানটা।'

'সেটা করতে গেলে একটা শূন্যস্থান গজাবে আমার হৃৎপিণ্ডে, কাজেই বুদ্ধি খরচ করতে চাচ্ছি না।'

'পুলিশ কই?' এদিক-ওদিক তাকাল রানা।

'কেন, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?'

'তুমি?' কাঁচনামানো জানালা দিয়ে থু করে থুতু ফেলল রানা। 'পুলিশ মানে যেখানে জনগণের বন্ধু, সেখানে তুমি শুধু একজন খুনিই নও, একদল খুনির নেতাও। যা-হোক, একটু আগে সাইরেনের আওয়াজ শুনলাম না?'

মাথা ঝাঁকাল হেইডন। 'কিন্তু ওরা শেষপর্যন্ত আসেনি এখানে। বলো তো কেন? দেখি তুমি আসলেই সাংঘাতিক মাল কি না।'

'রেডিয়োতে মানা করে দিয়েছ। কারণ ওরা এলেই দেখবে, তোমার দুই সহকারীর হাতে খুন হচ্ছি আমি, অথবা ওরা খুন হচ্ছে আমার হাতে। অথচ তোমার সব ধামাচাপা দেয়ার কথা।'

'শার্প, ভেরি শার্প। ছুটে আসছিল কয়েকজন পেট্রলম্যান,

ওদেরকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, পরিস্থিতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে আমার। আফটার অল, গৃহস্থের সামনে তো আর চুরি করা যায় না, কী বলো?'

'শার্প শব্দটা শুনে মনে পড়ে গেল--তোমার শার্প শুটাররা কিন্তু সবাই পটল তুলেছে। সুতরাং তোমার সাবঅর্গানাইযেশন শেষ, হেইডন। এখন সমাজের সংস্কার করবে কীভাবে?'

'চিন্তা কোরো না। সানিদের মত আরও কয়েকজনকে শিখিয়েপড়িয়ে নেব। গুলি করে মানুষ মারতে চায় এ-রকম লোকের অভাব নেই এলএপিডিতে। আর মাসুদ রানাও একজনের বেশি দু'জন নেই যে, সন্দেহ করবে আমাকে। এবার নামো গাড়ি থেকে। এবং কোনও চালাকি করার চেষ্টা কোরো না।'

দরজার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে রানার মনে পড়ল, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভটা আটকে আছে উইণ্ডশিল্ডের সঙ্গে। শরীরটা একটুখানি মোচড় দিল ও, ড্যাশবোর্ডে একটা হাত রেখে একদিকে কাত হওয়ার ভান করল--হেইডনকে বোঝাতে চাচ্ছে লম্বা পা'র কারণে বের হতে জায়গা বেশি লাগছে, সুযোগ নিতে চাইছে অন্ধকারের। যে-হাত ড্যাশবোর্ডে রেখেছে সেটা দিয়ে টান মেরে ছুটিয়ে নিল এক্সপ্লোসিভটা, অন্য হাতে খুলল গাড়ির দরজা। বের হওয়ার আগে সুইচ টিপে অ্যাক্টিভেট করল টাইমিং মেকানিযম, তারপর বোমাটা আস্তে করে ছেড়ে দিল ড্রাইভারের পাশের সিটে। বাইরে এসে দড়াম করে লাগাল দরজা--ভাবখানা এমন, যারপরনাই হতাশ আর বিরক্ত হয়েছে।

হেইডন বলল, 'তোমাকে এখনই গুলি করে মারা উচিত ছিল আমার, কিন্তু তা করব না। কেন জানো? কারণ তোমার ধ্যানধারণা আর বিশ্বাস তোমাকে দিয়েই গেলাব। কী যেন বলেছিলে--অপরাধীকে খুন করতে পারি আমি, অপরাধকে না? ...জল্লাদের ভূমিকা পালন করছি, তা-ই তো? ক্যাভিস

হ্যারিংটনের মৃত্যুর ব্যাখ্যা চেয়েছিলে না আমার কাছে? তা হলে এবার সানি আর হেন্ডনের মৃত্যুর ব্যাখ্যা দাও আমাকে। ওদের সঙ্গে কি রিডক্সের নামটাও উচ্চারণ করা উচিত আমার? ...শালা মোনাফেক কোথাকার--মুখে এক আর কাজে আরেক? বড় বড় লেকচার দিচ্ছিলে না বিচারব্যবস্থার পক্ষে? ঠিক আছে, আমি রিচার্ড হেইডন, এলএপিডি'র ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট আইনের আশ্রয় নেব তোমার বিরুদ্ধে। মামলা ঠুকব তোমার নামে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাব তোমাকে। ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে সানি আর হেন্ডনকে খুন করেছ তুমি--প্রমাণ করে ছাড়ব। কী জবাব দেবে তখন? নিজের কোন্ সাফাইটা গাইবে?' থু করে থুতু ফেলল। 'আদালত যদি মৃত্যুদণ্ড দেয় তোমাকে, ভালো কথা। আর যদি না দেয়, আমি নিজে খুঁজে বের করব তোমাকে, দুনিয়ার যে-জায়গাতেই থাকো না কেন। সেদিন এত সীসে গেলাব তোমাকে...এত সীসে গেলাব যে...'

'যে-পরিমাণ সীসার কথা বলছ,' শান্ত গলায় বলল রানা, মনে মনে প্রার্থনা করছে তাড়াতাড়ি যেন গাড়িতে ওঠে হেইডন, 'কষ্ট করে অত সীসা বহন করে নিয়ে যেতে পারবে তো? ওজন বেশি হয়ে যাবে না?'

মাথা গরম হয়ে গেছে হেইডনের, আর কথা বাড়াল না সে। বনেটের সামনে দিয়ে ঘুরে প্রায় ছুটে এসে কষে এক লাথি মারল রানাকে, দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসেই মোচড় দিল ইগনিশনে।

পাঁজরে লাথি খেয়েছে রানা, পড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না তারপরও ইচ্ছা করে লম্বা হয়েছে মাটিতে, গড়িয়ে সরে যাচ্ছে যতটা সম্ভব দূরে। দৌড় দিচ্ছে না কারণ ওকে হঠাৎ দৌড়াতে দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে হেইডনের মনে।

টায়ারের বিশ্রী শব্দ তুলে রওয়ানা হয়ে গেছে হেইডনের গাড়ি। পার্গেটরির গেটে হাজির হয়েছে কি হয়নি, বিস্ফোরণটা

ঘটল এমন সময়।

রানা তখনও গড়াতে গড়াতে সরে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে।

আটাশ

কবরস্থান ভালো লাগে না রানার। কারণ এখানে মৃত্যু কথা বলে নিঃশব্দে। অথচ রানা বাঁচতে চায়, অনেক অনেক বছর, প্রাণভরে। প্রায় প্রতি মুহূর্তে টের পায়, বহু কাজ বাকি পড়ে আছে এখনও।

শেষকৃত্যানুষ্ঠান চলছে শায়লার। কবরের পাশে রাখা হয়েছে ওর কফিন, ডালা স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ। পকেটসাইজ বাইবেল খুলে ঈশ্বরের বাণী আবৃত্তি করছেন যে-যাজক, সম্ভবত তিনিও দেখতে চান না খণ্ডবিখণ্ড বীভৎস মৃতদেহটা।

বার বার আনমনা হয়ে পড়ছে রানা। মেঘশূন্য সকালের আকাশে মাথার অনেক ওপরে উড়ছে একটা চিল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, থেকে থেকে সর্ সর্ শব্দ উঠছে গোরস্থানের লম্বা লম্বা ঘাসে। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর রয়েছে বড় বড় গাছ, সেগুলোর পাতা কেঁপে কেঁপে উঠে সব-হারানোর হাহাকার জাগাচ্ছে বুকের ভেতর। চোখের কোনা জ্বালা করছে রানার।

পার্গেটরি থেকে সোজা শায়লার বাসায় গিয়েছিল ও। শরীরে একরত্তি শক্তি নেই তখন, পাষাণভার সওয়ার হয়েছে মনে, তারপরও রানা ভূতগ্রস্তের মত হেঁটেছে অনেকটা পথ। হাঁটতে হাঁটতে যতগুলো গাড়ির আওয়াজ পেয়েছে, থেমে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়েছে, নিঃশব্দে অনুরোধ করেছে যেন তুলে নেয়া হয় ওকে;

কিন্তু অন্তত লস অ্যাঞ্জেলেসের নিশাচর মানুষেরা এত বোকা নয় যে, রাতবিরেতে অচেনা-অজানা একটা লোককে, তা-ও আবার যার সারাশরীরে কাটাকুটি আর রক্তের দাগ ভরা, সাধ করে তুলে নেবে নিজের গাড়িতে।

ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েছিল টানাসেতু পার হয়ে এপ্রান্তে আসার পর। ড্রাইভার কিছুতেই আসতে রাজি না, রানাকে আপাদমস্তক দেখার পর তার সাফ কথা, জবাই করে ফেললেও যাবে না শহরতলীর ওদিকে। নিরুপায় হয়ে ঝট্ করে ড্রাইভারের টুঁটি চেপে ধরে রানা, লোকটার চোখে চোখ রেখে বলে, 'তা হলে মর্ তুই, ক্যাব চালানোর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবি।'

বাপ বাপ করতে করতে রানাকে প্যাসেঞ্জার সিটে তুলে নেয় ড্রাইভার, রওয়ানা দেয় আর কোনও উচ্চবাচ্য না করে। শায়লার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছে রানা দেখে, মোটামুটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে সঙ্গের রাস্তাটা। কারা ছিল না সেখানে? কৌতূহলী জনতা, পুলিশ, সাংবাদিক।

শায়লার শোকে কি না কে জানে, কাঁদতে দেখা গেল শুধু একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে, যে তার স্বামীকে নিয়ে বিস্ফোরণের কয়েক মুহূর্ত আগে বেরিয়ে গিয়েছিল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার বাইরে।

সারাটা রাত ঘুমায়নি রানা। সারাটা রাত জেগে বসে ছিল মর্গের করিডোরে, যেখানে শায়লার খণ্ডবিখণ্ড লাশটা রেখেছিল এল.এ. পুলিশ কাফন-দাফনের আগ পর্যন্ত। ওখানেই কথা হয়েছে প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কি আর ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডের সঙ্গে, হেইডন আর ওর শার্প শুটারদের ব্যাপারে সব বলেছে রানা তাঁদেরকে। প্রমাণ হিসেবে হস্তান্তর করেছে সানির বুলেটটা, বেকার আর হ্যারিংটনের মৃতদেহ থেকে পাওয়া বুলেটগুলোর সঙ্গে ওটা ক্রসম্যাচ করে দেখার অনুরোধ জানিয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে, ইচ্ছা করলে এলএপিডি হত্যামামলা দায়ের করতে

পারে ওর বিরুদ্ধে, কিন্তু নিরুপায় হয়েই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে হয়েছে ওকে, যদি সম্ভব হতো তা হলে তিন শার্প শুটার অথবা তাদের নেতাকে জ্যান্ত হাজির করার চেষ্টা করত আদালতে।

প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কি আর ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড দু'জনই আশ্বাস দিয়েছেন, বিবেচনা করে দেখবেন তাঁরা বিষয়টা; দরকার হলে পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে মিটিং করবেন আবারও, পুরো ঘটনা আগা-গোড়া পর্যালোচনা করা হবে রানার উপস্থিতিতে।

কথা শেষ করে চলে যাচ্ছিলেন তাঁরা, ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ডকে পিছু ডেকে রানা বলে, 'আপনি বলেছিলেন, পারিশ্রমিকের বদলে আমার যদি কিছু চাওয়ার থাকে এই কেসে তা হলে তা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।'

প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কির সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড, তারপর কিছু না বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকান রানার দিকে।

'এই কেসের জন্য জীবন দিয়ে গেছে আমার এজেন্সির চিফ শায়লা মারিয়া, জীবন দিয়ে গেছে ও এলএপিডি আর এই শহরটার মানুষদের জন্য। ওর এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে, আমি চাই, ওর নামে নামকরণ করা হোক এলএপিডি'র ডকুমেন্ট আর রেকর্ড সেকশনটার।'

রানার এই চাওয়া নিয়েও আলোচনা করা হবে কমিশনারদের মিটিং-এ, আশ্বাস দেন প্রেসিডেন্ট উইলিনস্কি আর ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডফোর্ড।

ঈশ্বরের বাণী পড়া শেষ, এখন কবরে নামানো হচ্ছে শায়লার কফিন। আরেকবার হু হু করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। একটা মানুষ অনন্তকালের জন্য চলে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে, আর কখনও ওর খোঁজ পাওয়া যাবে না কোথাও।

গোর দেয়া শেষ। যে-ক'জন এসেছিল শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তারা

সবাই চলে যাচ্ছে একে একে। কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে রানাও হাঁটা ধরল। কিছুটা দূরে আসার পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শায়লার কবরটার দিকে।

মার্কিন মুল্লুকে বাংলায় খোদাইকারী পাওয়া দুষ্কর, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়, তা ছাড়া খুঁজবার মত সময়ও ছিল না রানার। তাই বড় বড় অক্ষরে কম্পিউটারে লিখে ছবি হিসাবে দিয়েছিল খোদাইকারীকে। ছবি দেখে বাংলায় এপিটাফ খোদাই করতে একটুও অসুবিধে হয়নি ওদের--

দূরে যাওয়া মানে, প্রিয়,
ছেড়ে চলে যাওয়া নয়,
মনের মানুষ দূরে গেলে
আরও বেশি প্রিয় হয় ॥

সারা দুনিয়ার কেউ যদি না-ও বোঝে কথাটার মানে, কিছু যায়-আসে না রানার।

***